# অর্দ্ধেন্দুশেখর

# ও

# বাংলা থিয়েটার

শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য

শঙ্কর প্রকাশন
১৫।১এ যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬

# ARDHENDUSEKHAR O' BANGLA THEATRE

*A Biography*

by

**Shri Sankar Bhattacharyya**

প্রথম প্রকাশ : শুভ মহালয়া, ১৩৬৬/ অক্টোবর, ১৯৫৯



প্রকাশক : নিতাই মজুমদার, শঙ্কর প্রকাশন, ১৫।১এ যুগলকিশোর দাস লেন, কলি-৬
মুদ্রাকর : সুকুমার চৌধুরী, ঝর্ণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৬৩এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলি-৬
প্রচ্ছদ : ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

শ্রীমতী পার্বতী ভট্টাচার্য্য

পরম পূজ্যপাদ

আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ডি-লিট্, সাহিত্যরত্ন

মহোদয়ের শ্রীকরকমলে—

এই লেখকের—

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার

বাংলা থিয়েটারে অভিনয়

কলকাতার থিয়েটার ১ম পর্ব

কলকাতার থিয়েটার ২য় পর্ব

# সূচীপত্র

**It is only in words that the actor may record his steps ; he can not show his painting or sculpture , his music can not be put on record so that posterity may judge its worth. Only from the tongues and pens of contemporaries can a record come.**

**—Sir Donald Wolfit.**

# ভূমিকা

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর (১৮৫০-১৯০৮) নাম অপরিমোচনীয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা সাহিত্যে তাঁর সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক জীবনী-গ্রন্থ লিখিত না থাকাতে, একালের বাঙালীর কাছে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় অনতিব্যক্ত। সেজন্যে তাঁর একখানি সম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য জীবনী প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়ে গত বৎসরের গোড়ার দিক থেকে সন্ধান-কার্য শুরু করি। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বুঝলাম বহু বিলম্ব হয়ে গেছে। আজ তাঁর জীবনকাহিনীর বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা সত্যই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ ক'রে খ্রীস্টাব্দ ১৮৯৬ সাল থেকে খ্রীস্টাব্দ ১৯০২ সাল পর্যন্ত তাঁর নটজীবনের সমগ্র বিবরণ নানাবিধ সূত্র ধরে অনুসন্ধান ক'রেও উদ্ধার করা যায় নি। এই পর্বের অন্তর্গত ঘটনা-পরম্পরা যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে বিবৃত হয়েছে। আমার বিশ্বাস এর দ্বারা ঐতিহাসিকতা ক্ষুন্ন হয় নি, কারণ যুক্তিসিদ্ধ অনুমান প্রমাণ-বিধির একটি স্বীকৃত অঙ্গ। যা হোক্, যতটুকু আহরণ করতে পেরেছি, ততটুকুই এই গ্রন্থে পরিবেষণ করলাম। বস্তুত, এই গ্রন্থ বাংলা থিয়েটারের ধারাবাহিক ইতিহাসের পটভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়-কীর্তির রেকর্ড। প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তি ও বিবরণ এবং পত্র-পত্রিকা-গ্রন্থে প্রকীর্ণ উপকরণ অবলম্বন ক'রে এই রেকর্ড গ্রথিত।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের একটি অসম্পূর্ণ আত্মবিবরণী আছে। বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আরম্ভস্তরের ইতিহাসের উপাদানরূপে এটির মূল্য অসাধারণ। অধুনা-দুষ্প্রাপ্য এই দলিলটিকে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার ক'রে এনে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এটি ইতিপূর্বে কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত আত্মবিবরণীটিকে কেন্দ্র ক'রে অতিরিক্ত টীকা ও তথ্য সংযোজিত হয়েছে।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করি। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে বাঙালীর প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম স্রষ্টা অর্দ্ধেন্দুশেখর। ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধনী নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' তাঁরই একক-নির্দেশনায় মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্, এই ঐতিহাসিক সত্যটি স্বীকৃতি লাভ করেনি। তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রসঙ্গ নিয়ে প্রচণ্ড বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। এ সম্পর্কে ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখিত 'রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় )' শীর্ষক

প্রবন্ধ ( নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থের ১৬শ খণ্ডে প্রকাশিত), গিরিশচন্দ্রের 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' নামক পুস্তিকা ও বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'রাধামাধব করের স্মৃতিকথা' সেই প্রখর তর্কবিতর্কের প্রমাণ। গিরিশচন্দ্র ও রাধামাধব করের অভিযোগ ব্যোমকেশ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তথ্যবিকৃতি ঘটিয়েছেন। যেহেতু ব্যোমকেশ অর্দ্ধেন্দুশেখরের পুত্র সেহেতু অনেকের কাছে এ অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে। সেই পরস্পরবিরোধী উক্তিগুলিকে যুক্তির নিকষে যাচাই ক'রে উপরি-উক্ত বিতর্কিত প্রশ্নটির একটি সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে প্রদত্ত তারকা-চিহ্নিত নির্দেশসমূহ অধ্যায়ের শেষে দ্রষ্টব্য এবং মিনার্ভা, অরোরা, হাতিবাগানের স্টার ও কোহিনুর থিয়েটারে অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয়ের বিজ্ঞাপন ও তারিখসমূহ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'বেঙ্গলী' সংবাদ-পত্র থেকে সঙ্কলিত।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে শ্রদ্ধেয় শ্রীনন্দগোপাল মজুমদার মহাশয় আমাকে অযাচিতভাবে অমূল্য সাহায্য করেছেন; তাঁর এই সহৃদয় আনুকূল্য আমার চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

শ্রদ্ধেয় শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থের প্রয়োজনে 'হিন্দু প্যাট্রিঅট,' 'বসুমতী' ও 'রঙ্গালয়' পত্রিকা থেকে কতকগুলি বহুমূল্য উপাদান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন; তাঁর এই অকৃত্রিম সৌজন্য চিরকাল স্নেহমুগ্ধচিত্তে স্মরণ করব।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযামিনীমোহন মজুমদার, শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরথনাথ সরকার, শ্রী দীপক গোস্বামী, শ্রীশিশির বসু, শ্রীনরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী, শ্রীপ্রমথ চক্রবর্তী, শ্রীঅনিমেষ দত্ত, শ্রীনৃপাল চৌধুরী, শ্রীক্ষিতীশ সরকার, শ্রীশঙ্করানন্দ তপস্বী, শ্রীমান পরিতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীমান অভিজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রীমান রাজীব কুমার রায় প্রমুখ গুরুজন বন্ধুজন স্নেহভাজনেরা গ্রন্থ-প্রস্তুতির নানা পর্যায়ে নানা প্রকারে সহায়তা করেছেন; গুরুজনদের শ্রদ্ধা, বন্ধুজনদের প্রীতি ও স্নেহভাজনদের আশিস্ জ্ঞাপন করছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে আমার সাহিত্য-সতীর্থ পরেশ ভট্টাচার্য ও 'শঙ্কর প্রকাশন' প্রতিষ্ঠানের তরুণ কর্ণধার নিতাই মজুমদারের আগ্রহ ও উৎসাহ প্রীতিমুগ্ধচিত্তে স্মরণ করছি। অনুজপ্রতিম নিতাই এই নিদারুণ কাগজ-সঙ্কটের

দিনে এইরকম একটি পুষ্টকলেবর গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব যদি না নিতেন, তবে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে এত শীঘ্র পাঠকের সামীপ্যে উপস্থিত করা সম্ভবপর হ'ত না।

সংস্কৃতি-রসিক বাঙালীর কাছে 'অর্দ্ধেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটার' গ্রন্থটি যদি সমাদৃত হয় তা'হলে আমার উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

## অর্দ্ধেন্দুশেখরের জন্ম-পত্রিকা

ম ৫
শ ২৬
কে ২৩
শু ২২ বু ২২
র ২২
রা ১০
চ ১১
বৃ ২
লং

বুধবার কৃষ্ণাচতুর্থী তিথি, ১২৫৬ সাল, ১৮ই মাঘ, রাত্রি ১টা ৪৫ মিঃ

[ 'বঙ্গ-রঙ্গালয়', ২৪এ আষাঢ়, ১৩৩৩।১৩ই জুলাই, ১৯২৬ সংখ্যা থেকে সংকলিত ]

## মুখটীমঙ্গলানন্দ বংশে মুখটী মুস্তফী বংশ

লক্ষ্মণদেব মুখোপাধ্যায় মুস্তফী

|

শিবদেব

|

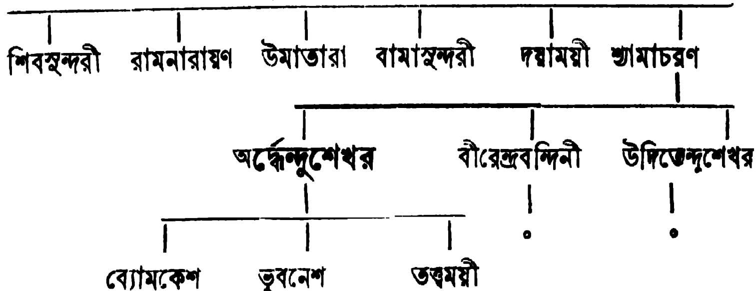
শ্যামরাম

|

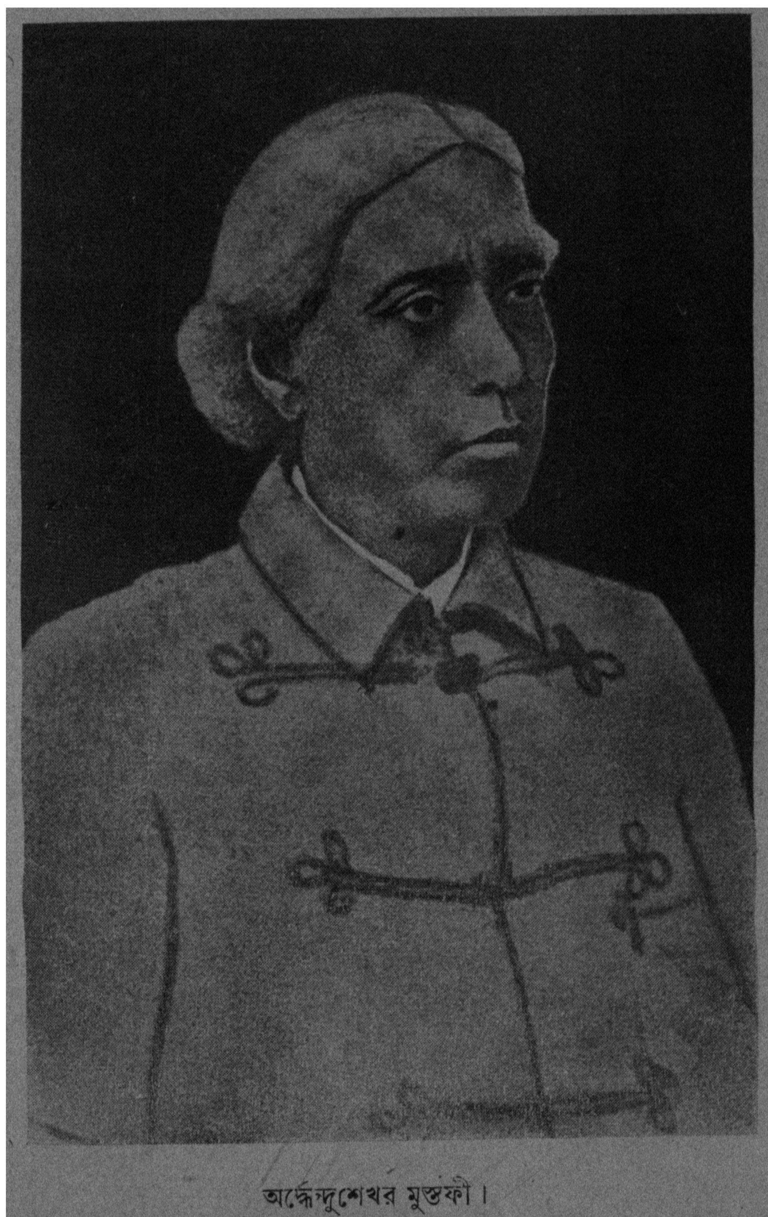
রূপরাম

|

ঈশানচন্দ্র




[ প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, তৃতীয় ভাগ থেকে সংকলিত ]



অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### পটভূমি

ভারতবর্ষে সংস্কৃত নাটকের যুগে রঙ্গমঞ্চের একটা অস্পষ্ট অস্তিত্ব ছিল বটে কিন্তু মুসলমানী আমল থেকে শুরু ক'রে ইংরেজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলাদেশে যাত্রাভিনয়ের যুগে মঞ্চের ব্যবহার ছিল না। বাঙালী তখন অভিনয়ের যাত্রা-রূপ অর্থাৎ মঞ্চ ও দৃশ্যপটবিহীন খোলা আসরে গীতাভিনয়ই বুঝতো।

থিয়েটার বলতে আমরা এখন বুঝি বদ্ধপ্রেক্ষাগৃহের প্রান্তে স্থাপিত ফ্রেমে-আঁটা রঙ্গমঞ্চের উপর যথোপযুক্ত দৃশ্যপট ও আলোক-কৌশলের সাহায্যে পাশ্চাত্য রীতি অনুসারী নাটকের অভিনয়। ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অভিনয়ের এই থিয়েটার-রূপ বাঙালীর অজানা ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজি থিয়েটারের অনুকরণে কলকাতার অভিজাত-বংশীয় ধনী বাঙালীরা প্রথম শখের থিয়েটার আরম্ভ করেন। ক্রমে কলকাতার উদীয়মান মধ্যশ্রেণী এই থিয়েটার নিয়ে মেতে ওঠেন এবং এঁদেরই প্রয়াসে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম বাংলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার গৌরব প্রাপ্য কিন্তু একজন অবাঙালীর। নাম গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ (১৭৪৯ খ্রীঃ—১৮১৭ খ্রীঃ), জাতিতে রুশ। এই বিদেশী সঙ্গীত ও নাট্যকলাবিৎ য়ুরোপের নানা স্থান ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে লণ্ডন থেকে মাদ্রাজ হয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে এবং পরবর্তী কয়েকটি বছর এখানে ঘটনাবহুল জীবন যাপনের পর এক বেদনাময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কপর্দক-শূন্য অবস্থায় এদেশ ছেড়ে চলে যান। কলকাতায় অবস্থানকালে এই রুশ-আগন্তুক বাংলা ভাষা শিক্ষা ক'রে দু'টি ইংরেজি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। একটি নাটক ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের 'লাভ্ ইজ্ দি বেস্ট ডক্টর' এবং অপরটি ইংরেজ নাট্যকার জড্রেলের 'দি ডিস্গাইজ্'। 'কাল্পনিক সংবদল' নামে অনূদিত দ্বিতীয় নাটকটির অভিনয়ের উদ্দেশ্যে এই বিদেশী শিল্পী বিলেতি ধরনের যে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করলেন তার নাম রাখলেন 'বেঙ্গলী থিয়েটার' এবং ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭এ নভেম্বর ও ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২১এ মার্চ তারিখে এই মঞ্চে বাঙালী নট-নটী দিয়ে 'কাল্পনিক সংবদল' অভিনয় করালেন। অভিনয় হয়েছিল অনিন্দ্যসুন্দর। দু'টি অভিনয়েই নাট্যশালা দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নাটকের অনুবাদ-কর্ম, অভিনেতৃ-সংগ্রহ, অভিনয়-শিক্ষা আর রঙ্গমঞ্চ

ও দৃশ্যসজ্জা প্রভৃতি নির্মাণের ব্যাপারে লেবেদেফকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাস। লেবেদেফের থিয়েটারেই বাঙালী নট-নটীরা সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য পদ্ধতির রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে বাংলা নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে এবং সাধারণ বাঙালী দর্শনীর বিনিময়ে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ পায়। কিন্তু মাত্র দু'রাত্রি অভিনয়ের পর ইংরেজি থিয়েটারের মালিকদের কূটঘাতে এই প্রথম বাংলা থিয়েটার অগ্নিবিধ্বস্ত হয়।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি নাট্যশালাগুলির মধ্যে ওল্ড প্লে হাউস ( ১৭৫৩ খ্রীঃ ), দি নিউ প্লে হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার ( ১৭৭৫ খ্রীঃ—১৮০৮ খ্রীঃ ), মিসেস্ ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার ( ১৭৮৯ খ্রীঃ ), হোয়েলার প্লেস থিয়েটার ( ১৭৯৭ খ্রীঃ ), এথেনিয়াম থিয়েটার ( ১৮১২ খ্রীঃ—১৮১৪ খ্রীঃ ), চৌরঙ্গী থিয়েটার ( ১৮১৩ খ্রীঃ—১৮৩৯ খ্রীঃ ), দমদম থিয়েটার ( ১৮১৭ খ্রীঃ—১৮২৪ খ্রীঃ ), বৈঠকখানা থিয়েটার ( ১৮২৪ খ্রীঃ ), সাঁ সুসি থিয়েটার ( ১৮৩৯ খ্রীঃ—১৮৪৯ খ্রীঃ ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব নাট্যশালায় ক্যাপ্‌টেন কল, মিসেস্ এমা ব্রিস্টো, চার্লস্ ফ্রাঙ্কলিং, স্টোক্‌লার, পার্কার, হিউম, ব্যারী, উইল্‌সন, রিচার্ডসন্, মিসেস্ ব্ল্যাক্, মিসেস্ লীচ্, মিসেস্ ডীক্‌ল্, মিসেস্ এ্যাণ্ডারসন্, ক্লিঙ্গার, রবার্টস্, জেম্‌স্ ভাইনিং প্রভৃতি বিখ্যাত অভিনেতৃবৃন্দ যে-উচ্চাঙ্গের অভিনয়ধারার আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তার ফলেই যেমন পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার ( ১৮৩১ খ্রীঃ ), শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ির থিয়েটার (১৮৩৫ খ্রীঃ), সিমুলিয়ায় আশুতোষ ( ছাতুবাবু ) দেব, চড়কডাঙ্গায় রামজয় বসাক ও জোড়াসাঁকোয় কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ির থিয়েটার (১৮৫৭ খ্রীঃ), বেলগাছিয়ায় পাকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের থিয়েটার ( ১৮৫৮ খ্রীঃ—১৮৫৯খ্রীঃ ), চিৎপুরে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের মেট্রোপলিটান থিয়েটার ( ১৮৫৯ খ্রীঃ ), শোভাবাজারে রাজা দেবীকৃষ্ণ দেবের বাড়ির থিয়েটার ( ১৮৬৫ খ্রীঃ ), পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের থিয়েটার ( ১৮৬৫ খ্রীঃ—১৮৭৩খ্রীঃ ) ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির থিয়েটার (১৮৬৫ খ্রীঃ—১৮৬৭ খ্রীঃ) প্রভৃতি বাঙালীর শখের নাট্যশালার উদ্ভব হয়েছিল তেমনই রামনারায়ণ তর্করত্ন ( ১৮২২ খ্রীঃ—১৮৮৬ খ্রীঃ ) ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের ( ১৮২৪ খ্রীঃ—১৮৭৩ খ্রীঃ ) মত নাট্যকার এবং কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ( ১৮২৬ খ্রীঃ—১৯০৮ খ্রীঃ ) ও অক্ষয়কুমার মজুমদারের মত অভিনেতারও আবির্ভাব হয়েছিল।

অভিজাতদের এইসব শখের থিয়েটারে যেসব নাটকাভিনয় অনুষ্ঠিত হ'ত সেসব অনুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থাকতো শুধু আমন্ত্রিত আত্মীয়বন্ধুবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের। জনসাধারণের সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকতো না। কলকাতার বাগবাজার পল্লীর একদল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকের অন্তরে প্রেরণা জাগে ধনীর প্রাসাদ থেকে নাট্যশালাকে নিয়ে আসতে হবে সাধারণের প্রাঙ্গণে যেখানে দর্শনীর বিনিময়ে সকলেরই সসম্মানে প্রবেশের অধিকার থাকবে। সাধারণ নাট্যশালার আভ্যুদয়িক কর্মে সেদিন যেক'টি তরুণ ঋত্বিক নান্দীপাঠ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর।

উনিশ শতকের শেষার্ধের আরম্ভস্তরে রেনেসাঁস-বাঙলার মানসিক বায়ুমণ্ডলে এক প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। একদিকে হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহের প্রবর্তন তৎসহ বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহ-কৌলীন্যপ্রথার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরের ( ১৮২০ খ্রীঃ —১৮৯১ খ্রীঃ ) তুমুল আন্দোলন, নব্যসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা-সুরাপান আর প্রাচীন সমাজের লাম্পট্য-বেশ্যাসক্তি ইত্যাদি দোষত্রুটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ অন্যদিকে নীলকর-আন্দোলন—তৎকালীন বাঙালী-মানসে এক প্রচণ্ড ঝটিকাবেগের আবর্ত সৃষ্টি করেছিল। সাহিত্য সমাজ-চেতনার দর্পণ। সেদিন বাঙালীর নবোদ্ভুত সামাজিক চেতনা সাহিত্যের মুকুটমণি নাটকে প্রতিফলিত হয়েছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমেশচন্দ্র মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র ( ১৮৩০ খ্রীঃ— ১৮৭৩ খ্রীঃ ) সেই সামাজিক আন্দোলনের সহায়তা করতে নাটক নিয়ে আবির্ভূত হলেন। নাটক আর নাট্যশালা হরিহরের মতো অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত। একের বিহনে অন্যের অস্তিত্ব নিরর্থক। বাংলা নাটকের অবিদ্যমানতার জন্যেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা নাট্যশালার ভাবী সম্ভাবনা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে পারেনি। বিগত শতকের মধ্য ভাগে নাটকের আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরবর্তীকালেই কলকাতায় একের পর এক শখের নাট্যশালা গজিয়ে উঠতে থাকে। বাঙালীর নাট্যাভিনয়ে নবযুগের সূত্রপাত হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জন্ম এই যুগের উন্মেষলগ্নে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### জন্ম : বংশপরিচয় : বিবাহ

১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে* উত্তর কলকাতার বাগবাজার পল্লীতে কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীটস্থ ১৯ নম্বর বাড়িতে (পৈতৃক ভদ্রাসন) মুস্তফী পদবীধারী মুখটী (মুখোপাধ্যায়) বংশীয় পীরালী ব্রাহ্মণকুলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের জন্ম হয়। পিতার নাম শ্যামাচরণ ও মাতার নাম মুক্তকেশী দেবী।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের মাতামহ যজ্ঞচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিপুরার যুবরাজ (তদানীন্তন De-facto Ruler) বীরচন্দ্র মাণিক্যের 'খাস-মুন্সী' (Private Secretary) ছিলেন। বীরচন্দ্রের পিতা মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের আমলে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যখন ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাধীনসত্তা বিলোপ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় ও যুবক যজ্ঞচন্দ্রের কর্মকুশলতায় তা রহিত হয়েছিল। † যজ্ঞচন্দ্র বিষয়কর্মে বিজ্ঞ তো ছিলেনই, উপরন্তু তিনি ছিলেন একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ ও কুশলী অভিনেতা। অর্দ্ধেন্দুশেখর মাতামহের শেষের গুণ দু'টি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন।

শ্যামাচরণের তিন সন্তান—জ্যেষ্ঠ অর্দ্ধেন্দুশেখর (ডাক নাম 'অদা'), মধ্যম বীরেন্দ্রবন্দিনী, কনিষ্ঠ উদিতেন্দুশেখর। বীরেন্দ্রবন্দিনীর স্বামী সেকালের বিখ্যাত কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৭ খ্রীঃ—১৮৭৮ খ্রীঃ); এঁদের কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। উদিতেন্দুশেখরও নিঃসন্তান ছিলেন।

পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে মুস্তফী-পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঠাকুর-পরিবারের দু'টি শাখা—জোড়াসাঁকো আর পাথুরিয়াঘাটা। জোড়াসাঁকো শাখার প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের দ্বারকানাথ (১৭৯৫ খ্রীঃ—১৮৪৬ খ্রীঃ) আর পাথুরিয়া-

---

*জন্মতারিখ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত :—(ক) গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতে ইং ১৮৫০, জানুয়ারি। (খ) প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফীর মতে ইং ১৮৫০, জানুয়ারি (দ্রঃ 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট')। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের মতে ১০ই মাঘ, ১২৫৬ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮৫০, জানুয়ারি (দ্রঃ 'অর্দ্ধেন্দুশেখর')। (ঘ) অধুনালুপ্ত 'বঙ্গ-রঙ্গালয়' পত্রিকায় (২৪এ আষাঢ়, ১৩৩৩।১০ই জুলাই, ১৯২৬) প্রকাশিত অর্দ্ধেন্দুশেখরের জন্মপত্রিকা অনুসারে বুধবার, কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি, ১২৫৬ সাল, ১৮ই মাঘ, রাত্রি ঘ ১।৪৫ মিঃ। জন্ম পত্রিকাটি এই গ্রন্থের পূর্ব-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। (ঙ) কিরণচন্দ্র দত্তের মতে বুধবার ১০ই মাঘ, ১২৫৮ বঙ্গাব্দ (দ্রঃ 'নাট্যমন্দির' পত্রিকা, ভাদ্র ১৩২০, পৃঃ ১৮৮)।

†দ্রঃ 'অর্দ্ধেন্দু-প্রসঙ্গ' : কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরঃ 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', পৌষ ১৩২৭।

ঘাটা শাখার প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের দর্পনারায়ণ। দর্পনারায়ণের মধ্যমপুত্র গোপীমোহন। গোপীমোহনের ছয় পুত্র—সূর্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার। পঞ্চম পুত্র হরকুমারের পত্নীর নাম শিবসুন্দরী দেবী। এই শিবসুন্দরী অর্দ্ধেন্দুশেখরের বড়ো পিসীমা। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ( ১৮৩১ খ্রীঃ—১৯০৮ খ্রীঃ ) ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ( ১৮৪০ খ্রীঃ—১৯১৪ খ্রীঃ ) অর্দ্ধেন্দুশেখরের পিস্‌তুতো দাদা। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবারের অপর শাখাস্থ উপেন্দ্রমোহনের পত্নী উমাতারা দেবী অর্দ্ধেন্দুশেখরের মেজো পিসীমা।

অল্প বয়সেই অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিবাহ হয়। পত্নীর নাম শাকম্ভরী দেবী—উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া পল্লীর অধিবাসী তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। শাকম্ভরী দেবীর মাতা ঠাকুর-পরিবারের বজ্রেন্দ্রনাথের কন্যা ও প্রিন্স্‌ দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধানাথের পৌত্র শ্রীনাথের খুড়তুতো ভগিনী।

অর্দ্ধেন্দুশেখরেরও তিন সন্তান—জ্যেষ্ঠ ব্যোমকেশ ( ১৮৬৮ খ্রীঃ—১৯১৬ খ্রীঃ ), মধ্যম ভুবনেশ ও কনিষ্ঠ তত্ত্বময়ী।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবায় ব্যোমকেশ একটি উৎসর্গীকৃত জীবন। 'বিশ্বকোষ' প্রণয়নে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন তিনি। উক্ত কোষগ্রন্থে ( ১৬শ খণ্ড, ১৩১২ বঙ্গাব্দ ) প্রকাশিত 'রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় )' শীর্ষক প্রবন্ধটি ব্যোমকেশের লেখনীপ্রসূত। এই প্রবন্ধে বঙ্গরঙ্গালয়ের আদিপর্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। প্রবন্ধটির কিয়দংশের ঐতিহাসিকতা নিয়ে পরবর্তীকালে প্রচুর বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল।

মধ্যম পুত্র ভুবনেশ আভিনয়িক গুণপনার জন্যে বঙ্গীয় নাট্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

কন্যা তত্ত্বময়ী দেবীর স্বামী ছিলেন জোড়াসাঁকোর মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র বিখ্যাত ব্যবহারজীবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অমরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন 'রবীন্দ্র-কথা' গ্রন্থের রচয়িতা খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## কেতাবতী শিক্ষা

মুস্তফী বাড়ির সামনে কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর বাড়িতে একটা মর্ণিং স্কুল বসতো। হাতেখড়ির পর সেই স্কুলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের শৈশব শিক্ষা শুরু হয়। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের ( ১৮৪৪ খ্রীঃ—১৯১২ খ্রীঃ ) অনুজও ঐ স্কুলে পড়তেন। গিরিশচন্দ্র নিয়োগী বাড়ির মর্ণিং স্কুলেই বালক অর্দ্ধেন্দুকে প্রথম দেখেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

> "যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি অর্দ্ধেন্দুকে পূর্বকথিত Morning School এ দেখিতেন, হয়তো তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার আভাস দেখিতে পাইতেন। School বসিবার অগ্রে ও স্কুল ভাঙিলে বালকেরা আগ্রহ-পূর্বক তাঁহার নিকট কিয়দংশ নিম্নোদ্ধৃত গানটি শুনিতেন :
>
> Birds are free so are we
> And we live so merrily
> Merrily Merrily Merrily
> &c. &c. &c.
>
> সে সময় হাস্যজনক গল্পও অনুকরণ হইত। অর্দ্ধেন্দুর নিকট বালকেরা আমোদপ্রার্থী ছিল।" ( 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' : 'এক্ষণ', ১৩৭৩-এর ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত )।

মর্ণিং স্কুলে কিছুকাল শিক্ষালাভ ক'রে অর্দ্ধেন্দুশেখর রসরাজ অমৃতলাল বসুর পিতা কৈলাসচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কম্বুলিয়াটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে ( বর্তমান 'শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল' ) প্রবিষ্ট হন। সেই স্কুল-জীবনের দিনগুলির কথা স্মরণ ক'রে উত্তরকালে অমৃতলাল বলেছেন :

> "ছেলেবেলায় আমাদের এই কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে যখন অধ্যয়ন করিতাম, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী আমার সতীর্থ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নাম ছাড়া আর যে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল মনে পড়ে না। বরং বোধ হইত তাঁহার মধ্যে রসকস কিছুই ছিল না। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; আমরা শুনিলাম যে তিনি ও বাবু

( পরে মহারাজ স্যার ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মামাতো 'পিসতুতো' ভাই ছিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের চালচলনও যেন আভিজাত্যসূচক বলিয়া বোধ হইত। স্কুলের শিক্ষক হাঁইড্ সাহেব ছেলেদের নামের শেষ অংশটা ডাকিতেন; যথা—অমৃতলাল বসু না বলিয়া ডাকিতেন—লাল বসু; অর্দ্ধেন্দুর নাম তিনি কখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই, মুস্তফী না বলিয়া সাহেব ডাকিতেন,—ম্যাষ্টিফ্। অর্দ্ধেন্দুকে ছেলেরা বড় জ্বালাতন করিত; আমিও অনেক সময় তাহাদের সহিত যোগ দিতাম; কিন্তু যখন তাহারা একটু বাড়াবাড়ি করিত, আমি তাহার পক্ষ লইতাম। আমাদের সহিত তুই বৎসর কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে লেখাপড়া করিয়া অর্দ্ধেন্দু পাইকপাড়ার স্কুলে চলিয়া গেলেন।" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়: বিপিন বিহারী গুপ্ত )

আবার স্কুল পরিবর্তন হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর পাইকপাড়ার স্কুল থেকে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ( হেয়ার স্কুল ) ভর্তি হন। এখানে স্বনামধন্য অভিনেতা রাধামাধব কর ( বিখ্যাত ডাক্তার আর. জি. করের অনুজ ) অর্দ্ধেন্দুশেখরের এক ক্লাস নীচে পড়তেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ জামাতা পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় রাধামাধব করের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর বাঁধাধরা লেখাপড়া শিক্ষায় তেমন আগ্রহী ছিলেন না ব'লে স্কুলের পড়াশুনা শেষ করতে পারেন নি। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যমে বাড়িতে পড়াশুনা ক'রে তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার অর্জন করেছিলেন। আঞ্চলিক ভাষাসমূহও তাঁর আয়ত্তগত হয়েছিল। ঢাকার কথা, খুলনার কথা, চট্টগ্রামের কথা, বাঁকুড়ার কথা, বর্ধমানের কথা, মেদিনীপুরের কথা—যে স্থানের কথাই তিনি যখন বলতেন, তখন তাঁকে তৎস্থানিক অধিবাসী ব'লেই মনে হ'ত।

ইংরেজি ভাষায় অর্দ্ধেন্দুশেখর যে কতখানি পারদর্শী ছিলেন নিম্নোক্ত ঘটনার মাধ্যমে তা কিঞ্চিৎ অনুমান করা যায়। একবার মিনার্ভা থিয়েটার সম্প্রদায় হাটোয়ার রাণীর বাড়িতে অভিনয়ার্থ আমন্ত্রিত হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর দলে আছেন। তখন তাঁর প্রান্তিক নটজীবন। সেখানে 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর জলধর সেজেছেন। অভিনয় করতে করতে তিনি দেখলেন দর্শকদের মধ্যে সবই সাহেব, মাত্র দু'একজন বাঙালী। সাহেবরা নাটকের মর্ম কিছুই গ্রহণ করতে পারছে না। তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর জলধরের সংলাপ একবার করে বাংলায় আর পরক্ষণেই তার তর্জমা ইংরেজিতে বলে যেতে লাগলেন। সাহেবরা হেসে অস্থির।*

*দ্রঃ 'অর্দ্ধেন্দুশেখর': অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়: 'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### পরিবেশ-প্রভাব

অর্দ্ধেন্দুশেখর আজন্ম হাস্যরস-রসিক। বাল্যকাল থেকেই তিনি নানা স্বরের অনুকরণ এবং অপরের কথাবার্তা, চালচলন ও হাবভাবের হুবহু নকলে অনন্য-সুলভ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অনুকরণপ্রবৃত্তি তাঁর ছিল সহজাত। তাঁর অনুকরণপ্রবৃত্তির মধ্যেই অভিনয়-প্রতিভার বীজ নিহিত ছিল। এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

> "শৈশবে পঠদ্দশায় তিনি অনুকরণ করিয়া সমপাঠীদিগকে আভিনয়িক কৌশলে মুগ্ধ করিতেন। বাল্যের এই অনুকরণপ্রবৃত্তি উত্তরকালে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে নটকুলচূড়ামণি অভিধান প্রদান করিয়াছিল। বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব পরিত্যাগের পরে এবং বাঙ্গালার সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পূর্বেও তিনি ক্রীড়াপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি সমপাঠী সহযোগে, ইংরেজ ভিক্ষুক, রাস্তাবন্দি ইনেস্পেক্টর, উড়ে কুলি, হাসপাতালের রোগী সাজিয়া সকলের প্রীতি উৎপাদন করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকেও তাঁহার ন্যায় অনুকরণ করিতে শিক্ষাদান করিতেন। এই শিক্ষাদান প্রবৃত্তি উত্তরকালে তাঁহাকে বঙ্গীয় নাট্যশালায় প্রতিদ্বন্দ্বিহীন গৌরবময় সুশিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।" ('স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নটজীবন')

এই কাহিনীর উল্লেখ ক'রে অমৃতলাল বসুও পরবর্তীকালে বলেছেন :

> "রামচাঁদ মৈত্রের গলিতে লাটু চৌধুরীদের বাড়ি জিম্‌ন্যাষ্টিকের আড্ডা ছিল। সেখানে আমরা বসা-দাঁড়া করিতাম। অর্দ্ধেন্দু আমার class-friend, বড় ভাব ছিল। উভয়েরই অনুকরণ করিবার শক্তি ছিল। অর্দ্ধেন্দুর সেই শক্তি বেশি ফুটিত, আমরা খেলা ও আমোদের সঙ্গে এক একজনের স্বর অনুকরণ করিতাম। এক একজনে এক একটা কিছু হইতাম, আর তদুপযুক্ত ঢং অনুকরণ করিতাম। ইহাই আমাদের অভিনয়-বুদ্ধির আদি।*" ('নাচঘর', ২৩এ শ্রাবণ, ১৩৩১)

---

*অমৃতলাল বসু অন্যত্র বলেছেন : 'নটবর চৌধুরীর বাড়িতে আমাদের সেই জিম্‌ন্যাষ্টিক দল খেলাধুলা করিত।...নটবরের বাড়িতে অর্দ্ধেন্দু ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন,—হাস্য পরিহাসের

অর্দ্ধেন্দুশেখরের শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর পিসীমার (যতীন্দ্রমোহন—শৌরীন্দ্রমোহনের জননী) কাছে, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়িতে। সেকালে পাথুরিয়াঘাটা আর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান। বহু গুণী ব্যক্তির সমাগম হ'ত সেখানে। তাঁদের প্রভাব পড়েছিল বালক অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনে। বস্তুত অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়-প্রতিভার বীজ উন্মেষিত হয়েছিল পাথুরিয়াঘাটা আর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নাট্যক্ষেত্রে। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী অর্দ্ধেন্দুর পারিবারিক পরিবেশের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

"মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহনের মাতা তাঁহার পিসী ছিলেন। অর্দ্ধেন্দুকে প্রায়ই সেখানে গিয়া থাকিতে হইত। অর্দ্ধেন্দু সকলেরই প্রিয় ছিলেন। উপেন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্ত্রী তাঁহার মধ্যমা পিসী ছিলেন। তাঁহার বাটীতে এবং মহারাজার লাইব্রেরীতে অনেক বই ছিল এবং সেখানে তাঁহার ইংরাজী সাহিত্য পড়িবার বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। নানা বিষয়ের বই তিনি এইখানেই ও তাঁহার মধ্যমা পিসীর বাটীতে পড়িয়াছিলেন। রাজবাটীতে তাঁহার শিক্ষার আর একটি সুবিধা হইয়াছিল। তখন সকল বড়লোকের বাটীতে সন্ধ্যা-সভা বসিত।

" 'যদি না পড়ে পো সভায় নিয়ে থো।' এ সেই সভা। এ সভার নাম মজলিস। এখানে গীতবাদ্যের ঝঙ্কার হইত, উপস্থিত কবিতার রসাস্বাদন করা হইত, উদ্ভট শ্লোকের অবতারণায় রসের স্রোত উছলিয়া যাইত। গায়ক, বাদক, হরবোলা, পণ্ডিত, কবি সকলেরই এখানে সমাগম হইত। সকল রকমের চর্চাই এখানে হইত। বাড়ির আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব যে যেখানে থাকিত সকলেই সন্ধ্যার সময় সে মজলিসে আসিয়া উপস্থিত হইত। বালকেরাও সেখানে উপস্থিত থাকিতে পাইত। তাহাদেরও সহবৎ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার শিক্ষাই এইখানে হইতে পারিত। এখন আর সেদিন নাই। সে

তুফান উঠিত; অর্দ্ধেন্দু ছিলেন আমাদের সভার মধ্যমণি; বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তার ও অঙ্গভঙ্গির বৈচিত্র্যে তিনি আমাদের ওস্তাদ হইয়া দাঁড়াইলেন; একদিন তিনি সাজিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন; আমরা সব রোগী সাজিলাম—ফিরিঙ্গি, উড়ে, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি; caricatureএর চূড়ান্ত করা হইত। ক্রমশঃ এই রকমই যেন অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেল। আমাদের মনে একটা অভিমান ছিল, যা-তা সাজতে আমরা রাজি হইতাম না; অর্দ্ধেন্দুশেখরের সে রকম কোনও অভিমান ছিল না।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় : বিপিনবিহারী গুপ্ত)

সভার কথা লোকে ভুলিয়াছে। সে জিনিস যে কখনও ছিল, তাহা লোকে এখনকার বড়মানুষদের চালচলন, আচার-ব্যবহার দেখিয়া স্বপ্নেও মনে করিতে পারে না। মহারাজ স্বয়ং বিদ্যানুরাগী ও জ্ঞানানুশীলনে যত্নবান ছিলেন, তাঁহার বাড়িতে প্রায়ই ইংরাজি শিক্ষিতের সমাগম হইত; নানা বিষয়িণী কথা চলিত, অর্দ্ধেন্দু সেগুলি সব গ্রাস করিতেন।" ('বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ব্রাহ্মণ কাণ্ড, তৃতীয়ভাগ, পরিশিষ্ট)

সুকুমার সংস্কৃতি চর্চায় বাঙালীর গৌরবদীপ্ত ইতিহাসে পাথুরিয়াঘাটা আর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সাধকদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্র-নাট্যকলায় এই দুই পরিবারের অবদান অবিস্মরণীয়।

পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবারের প্রসন্নকুমার সেকালের সর্ববিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন ওতপ্রোত। তৎকালে বাঙালীর জন্য জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন ওঠে তারও মূলে ছিলেন প্রসন্নকুমার এবং নারিকেলডাঙ্গার উদ্যানবাটিকায় তৎ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুথিয়েটার'-ই বাঙালীর প্রথম শখের নাট্যশালা, যদিও সেখানে ইংরেজি নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বিত্তবান্ দ্বারকানাথ ছিলেন কলাবান্ গুণী। তাঁর জোড়াসাঁকোর কলাশোভন ভবন তাঁর কলাসৌন্দর্যবোধের প্রকর্ষের নিদর্শন। কলাশৌখিন দ্বারকানাথ সম্পর্কে সে-কালের সাহেবী পত্রিকা 'বেঙ্গল হরকরা-'র (ফেব্রুয়ারি, ১৮৪০ খ্রীঃ) স্মরণযোগ্য প্রশস্তি:

> "The house and its embellishments alone are worthy of respectful mention, for perhaps under no other roof in India, is there a larger or finer collection of works of arts, which shows finer sense of dancing also."

দ্বারকানাথ ছিলেন একাধারে রাগ-সঙ্গীতের অনুভূতিপ্রবণ সমঝদার ও শিল্পী। পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও নাট্যকলারও তিনি মর্মজ্ঞ ছিলেন। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও চৌরঙ্গী আর সাঁসুসি থিয়েটারের তারকাসদৃশ অভিনেতা জে. এইচ্. স্টোকলার তাঁর 'The memoirs of a journalist' পুস্তকে লিখেছেন:

"Dwarkanath had the good taste to appreciate European music and theatricals, and so quickly became enamoured of Italian opera, when in his own country, that he engaged one of the travelling artists to give him lessons in singing. No wonder, therefore, that he yielded to the intoxication of similar delights on a large scale when he arrived in England."

দ্বারকানাথের রঙ্গালয়-প্রীতিও ছিল অপরিসীম। তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে কলকাতায় ইংরেজদের রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব ছিল। এই শিল্পানুরাগী মানুষটি সাহেবদের চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন একমাত্র ভারতীয় অংশীদার হিসেবে। প্রাচ্য সাংস্কৃতিক শিল্পরূপের প্রতিও তাঁর ছিল অসীম অনুরাগ। প্রতিটি লৌকিক উৎসব উপলক্ষে পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজনদের চিত্তবিনোদনের জন্যে তাঁর ভবন-প্রাঙ্গণে কথকতা, পাঁচালী ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন হ'ত।

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ( ১৮১৭ খ্রীঃ—১৯০৫ খ্রীঃ ) মার্গসঙ্গীত ও নাট্যকলার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জোড়াসাঁকো ভবনে 'নব-নাটক' নাট্যানুষ্ঠানের পরে তিনি বাড়ির তরুণদের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত ও উৎসাহিত ক'রে তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের ( ১৮২০ খ্রীঃ—১৮৫৪ খ্রীঃ ) পুত্র গণেন্দ্রনাথকে ( ১৮৪১ খ্রীঃ—১৮৬৯ খ্রীঃ ) লিখেছিলেন :

"তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্যদ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে দূরীভূত হইল। পূর্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।" ( 'আমার বাল্যকথা' : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর )

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পিতৃব্য মহারাজ রমানাথ ঠাকুর ( ১৮০০ খ্রীঃ—১৮৭৭ খ্রীঃ ) ও পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাললালের একমাত্র পুত্র কালীকৃষ্ণ ঠাকুরও ( ১৮৪১ খ্রীঃ—১৯০৫ খ্রীঃ ) নৃত্যগীত অভিনয়াদি চারু-কলার অনুরাগী পুরুষ ছিলেন। এই কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ির আঙিনায় একদা

কোন এক নাট্যানুষ্ঠানে তিনকড়ির ( ১৮৭০ খ্রীঃ—১৯১৭ খ্রীঃ ) প্রচ্ছন্ন নটীসত্তা নটগুরু গিরিশচন্দ্রের প্রত্যক্ষীভূত হয়। অনতিকাল পরেই সেই নটীসত্তার জাগরণ হয় গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের সোনার কাঠির স্পর্শে।*

পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরপরিবারের কুলপতি প্রসন্নকুমারের সুযোগ্য উত্তরসাধক তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়—মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন। বিগত শতকের বাঙলা দেশে নবীন সংস্কৃতির অভ্যুত্থানপর্বে যতীন্দ্রমোহন একটি অবিস্মরণীয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বহুবিধ গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারঙ্গম যতীন্দ্রমোহন একাধারে নিবন্ধকার গীতিকাব্যকার নাট্যকার ও কলাকার।

প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে যতীন্দ্রমোহনের অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়। পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়ের বেলগাছিয়া নাট্যশালা বাঙালীর নাট্যচর্চার এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। শৌরীন্দ্রমোহন হিন্দু সঙ্গীতের নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধারকর্তা। এদেশে সঙ্গীতশিল্পের প্রসারে শৌরীন্দ্রমোহনের সযত্ন প্রয়াস স্মরণীয়। এই দুই কলানিপুণ গুণীর উদ্যোগে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়িতে সঙ্গীত ও নাট্যকলার চর্চা নবোদ্যমে শুরু হয়।

পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়িতে ( ৬৫ নং পাথুরিয়াঘাটা ) যতীন্দ্রমোহনের 'বঙ্গনাট্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। তৎপূর্বে শৌরীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের আদি বাড়ির ( ৬৬ নং পাথুরিয়াঘাটায় গোপী-মোহন ঠাকুরের বাড়ি ) দোতলার নাচঘরে কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ( শৌরীন্দ্রমোহন কর্তৃক অনূদিত ) অভিনীত হয়েছিল ( ১৮৫৯ খ্রীঃ )। অভিনয়-শিক্ষক ছিলেন প্রথিতযশা শিল্পী কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' † ও মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে যথাক্রমে ‡ বিদূষক বসন্তক ও বিদূষক মাধব্যের চরিত্র তিনি অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন।

*১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে 'ম্যাকবেথ' নাটকে 'লেডি ম্যাকবেথ' ভূমিকার রূপায়ণে। দ্রঃ উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'তিনকড়ি' পুস্তক এবং 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় ( কার্তিক ১৩২৭ ) প্রকাশিত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'অর্দ্ধেন্দুকথা' প্রবন্ধ।

†রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক অনূদিত; অভিনয়ের তারিখ ৩১এ জুলাই, ১৮৫৮।

‡প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯।

প্রথমোক্ত চরিত্রের অনন্যসাধারণ অভিনয় সম্পর্কে মাইকেল-সখা গৌরদাস বসাক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন :

> "Among the actors, Babu Keshub Chunder Ganguli stood preeminent. Endowed by nature with histrionic talents of no mean order, he represented the Vidushaka (Jester) with such life-like reality, and so rich a fund of humour, as to be styled the Garrick of our Bengali stage···The Lieutenant-Governor, Sir Frederick Halliday, who was present with his family, was so delighted with the acting of Babu Keshub Chunder that he complimented him on his extra-ordinary dramatic talents. He said that looking at his serious and sedate appearance one could hardly believe him capable of acting so capitally the part of Jester." (Quoted in Brajendra Nath Banerjee's 'Bengali Stage' ; P. 22-23)

১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ৩০এ ডিসেম্বের পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়িতে যতীন্দ্র-মোহনের 'বঙ্গনাট্যালয়'-এর উদ্বোধন হয় 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক দিয়ে। ভারতচন্দ্র রায় ( ১৭১১ খ্রীঃ—১৭৫৯ খ্রীঃ ) রচিত এই বিখ্যাত বাংলা কাব্যটির নাট্যরূপ যতীন্দ্রমোহন নিজেই দিয়েছিলেন। নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :— বিদ্যা—বিখ্যাত ধ্রুপদগায়ক মদনমোহন বর্মণ, সুন্দর—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজা বীরসিংহ—রাধাপ্রসাদ বসাক, হীরা ( মালিনী )—'বঙ্গৈকতান' ও 'গীতসূত্রসার' রচয়িতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাভাট—গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধূমকেতু ( কোটাল )—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলা—নারায়ণচন্দ্র বসাক, প্রতিহারী—অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রহরী—ব্রজদুর্লভ দত্ত। এই 'বিদ্যাসুন্দর' দেখেই অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাট্যবিদ্যার দুর্লভ দৈব সংস্কার জাগ্রত হয়ে ওঠে। সেই জাগরণের কাহিনী স্বয়ং অর্দ্ধেন্দুশেখরের মুখ থেকেই শোনা যাক্ :

> "মহারাজ বাহাদুরের বাড়িতে যখন বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় হয়, তখন আমি সেইখানেই থাকিতাম। তখন আমার পঠদ্দশা। আমি

তখন 'কলুটোলা ব্র্যাঞ্চ স্কুলে' পড়িতাম। ইহা কোন্ স্কুলের ব্র্যাঞ্চ ছিল, তাহা জানি না। তবে কালে এই ব্র্যাঞ্চ স্কুলেরই নাম 'হেয়ার স্কুল' হইয়াছে। আমাদের বাগবাজারের নিজবাটী হইতে কলুটোলার স্কুলে যাওয়া সহজ নহে বলিয়াই, আমি তখন রাজবাড়িতে থাকিতাম। থাকিবার আরও একটি কারণ ছিল। মহারাজের জামাতৃবর্গও তখন উক্ত স্কুলে পড়িতেন; সুতরাং একত্র যাতায়াতের সুবিধা হইত বলিয়াও, আমাকে রাজবাড়িতে থাকিতে হইত। মহারাজের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি আমার পিস্তুতো ভাই—পিতার জ্যেষ্ঠ সহোদরার জ্যেষ্ঠ পুত্র। বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের অনেক পূর্ব হইতেই আমি রাজবাড়িতে ছিলাম।

"তখন আমার বয়স ১৬।১৭ বৎসর। আমার অবস্থান সময়েই রাজবাড়ির নাচঘরে স্টেজ বাঁধা হয়। এখন ইহা রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ির নাচঘর। এই ঘরের ছাদ, তখন পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গৃহের ছাদের সহিত সমান ছিল। স্টেজ বানাইবার জন্য ও পরিবারস্থ স্ত্রীদিগের দেখিবার সুবিধার্থে উচ্চ করিবার নিমিত্ত সেই ছাদ ভাঙ্গা হয় ও প্রাচীর বাড়াইয়া তাহাতে জানালা বসান হয়। এই জানালা দিয়া স্ত্রীলোক-দিগের দেখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

"রাজবাড়ির এই স্টেজই যে, আমার প্রথম দেখা স্টেজ, তাহা নহে। উহার পূর্বে আর একবার মাত্র স্টেজ দেখিয়াছিলাম। রাজা স্যর্ শৌরীন্দ্রের বাড়ির ঠিক পশ্চিম গায়ে যে বাড়ি, উহার নাচঘরে এক স্টেজ ছিল। এই বাটী, এখন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবুর মাতামহ ৺রাজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটী। তিনি মহারাজের জ্ঞাতি-ভ্রাতা। যখন ওখানে স্টেজ ছিল, তখন গোপালচন্দ্র বাবুর পিতা ঈশানচন্দ্র জীবিত ছিলেন। রাজবাড়ির স্টেজ দেখিবার পূর্বে আমি ঈশানবাবুর বাড়ির এই স্টেজ দেখি। এই স্টেজে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' অভিনীত হইত। সে অভিনয় আমি দেখি নাই। কেবল একদিন স্টেজটি দেখিয়া আসিয়া-ছিলাম। ঈশানবাবুর বাড়ির স্টেজ দেখিবার পূর্বে আমি থিয়েটারের কথা শুনিয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতেই আমার কল্পনা-শক্তি বড় প্রখর ছিল। যাহা কিছু শুনিতাম, যাহা কিছু দেখিতাম, তাহা লইয়াই নানাবিধ বিষয়ের কল্পনা করা, আমার মনের একটা অত্যন্ত ধর্ম ছিল। থিয়েটার কি, থিয়েটার কেমন, ইহা যদিও কখনও দেখি নাই, তথাপি

বাল্যকালে থিয়েটারের গল্প শুনিয়াই আমার একটা হ-য-ব-র-ল কল্পনা হইয়াছিল। ঈশানবাবুর বাড়ির স্টেজ দেখিয়া সে কল্পনার একটু পরিবর্তন হইল। তখন প্রাণে থিয়েটার সম্বন্ধে আমি কি বুঝিতাম, কোন রূপ ভাষায় আমি আপনাদিগকে বুঝাইতে পারিব না।

"রাজবাড়িতে স্টেজের সূত্রপাত হইলে ঈশানবাবুর বাটীর স্টেজ খুলিয়া আনা হয় ও তাহার অনেকানেক দ্রব্য, রাজবাড়ির স্টেজে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট দ্রব্যাদি মহারাজ বাহাদুরের ব্যয়ে নির্মিত হয়। রিহার্স্যাল প্রত্যহই হইত। গরাণহাটা-নিবাসী বাবু ঘনশ্যাম বসু, ইহার অধ্যক্ষ ও বাগবাজার গোঁসাইপাড়া-নিবাসী বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ইহার শিক্ষক হন। অভিনেতা অনেকেই জুটিয়াছিল। কিন্তু বাছাই করিয়া যাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁহাদের নাম আপনারা পাইয়াছেন। আমি প্রত্যহ রিহার্স্যাল দেখিতাম। ইহা দেখিতে আমার বিশেষ কৌতূহল হইত।

"যেদিন প্রথম অভিনয় হইবে স্থির হইল, সেদিন এক নূতন আগ্রহ জন্মিল। ঈশানবাবুর বাড়ির স্টেজ দেখিয়া আসার পর থিয়েটার সম্বন্ধে আমার প্রাণে যে ধারণা হইয়াছিল, প্রতিদিন রিহার্স্যাল দেখিতে দেখিতে, কল্পনার সাহায্যে নিত্যই তাহাতে কত পরিবর্তন ঘটিত। থিয়েটারের দিনেও দিনের মধ্যে শতবার তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়া শত রকমে গড়িতে লাগিল। আমার মনে হইত, থিয়েটার দেখিলে আমি যতটা তৃপ্ত হইব, ততটা তৃপ্তি, বোধ হয় আর কাহারও হইবে না।

"তাহার পর থিয়েটার দেখিলাম। অভিনয় দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। এতদিন প্রাণে যাহার কল্পনা-মাত্র ছিল, যাহা লইয়া মনে মনে কতই ভাঙ্গিতাম, গড়িতাম, আজ তাহার স্বরূপ দেখিলাম। অভিনয় দেখিয়া আমার একটা বিশেষ তৃপ্তি এই হইল যে, কল্পনার থিয়েটার সম্বন্ধে আমার প্রাণে যে সকল অস্পষ্ট ছবি আসিত, অভিনয় দেখিবার সময়ে তাহারই অনেকগুলিকে সত্য হইতে দেখিলাম। প্রথম দিন অভিনয় দেখিয়াই আমার থিয়েটার সম্বন্ধে বেশ একটা ধারণা হইল। প্রাণে উহার একটা ছবি অঙ্কিত হইয়া গেল।

"এই সময়ে যদিও আমার বয়স ১৬।১৭ ষোল সতর বৎসর,—কিন্তু তখনও আমরা খেলা করিতাম—বালকের উপযুক্ত খেলাই

আমরা খেলিতাম। থিয়েটারের পরদিনই আমার মাথায় এক নূতন খেলার খেয়াল উঠিল। স্থির করিলাম, খেলার থিয়েটার করিতে হইবে। মহারাজের মধ্যম জামাতা বনমালী মুখোপাধ্যায় (এক্ষণে মৃত) ও কনিষ্ঠ জামাতা পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় (যিনি এক্ষণে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ধনাধ্যক্ষ) এই দুই জনের নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিলাম। তাঁহারা সম্মত হইলেন। প্রত্যহ স্কুল হইতে আসিয়া সকলে, ছাদের উপর গিয়া, থিয়েটারের অনুকরণে কেহ রাজা, কেহ কোটাল, কেহ সুন্দর হইতাম। প্রথম প্রথম ধরাধরি ও বাঁধাবাঁধির উপলক্ষে কেবল হুড়াহুড়ি হইতে লাগিল। ক্রমশ অভিনয় দেখিতে দেখিতে, আমাদের অনেকেরই অনেক কথা মুখস্থ হইয়া গেল। খেলার সময় আমরা সেই সকল আবৃত্তি করিতাম, গান গাহিতাম। ক্রমে আমি চেষ্টা করিয়া সেই খেলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলাম। শেষে এমন হইল যে, আমাদের এক এক জনের তিনটা অংশ সম্পূর্ণ মুখস্থ হইয়া গেল এবং অনুকরণ করিতে করিতে হাব-ভাব, অঙ্গ-ভঙ্গী, চলা-ফেরা, বসা-দাঁড়ান সুন্দর অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। শেষে কৌতূহল হইল,—আমাদের এই খেলা, থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গকে দেখাইতে হইবে। রাধাপ্রসাদ বাবু, ব্রজদুর্লভ বাবু আমাদিগকে ভালবাসিতেন। ক্রমশ তাঁহারাই আমাদের খেলার থিয়েটারের দর্শক হইলেন। বালকের ক্রীড়ায় বেশ কৌশল ও শৃঙ্খলা দেখিলে বয়স্ক লোকদিগের যেরূপ আনন্দ হয়, বোধ হয়, আমাদের সেই খেলার থিয়েটার দেখিয়া তাঁহাদেরও সেইরূপ হইত। কারণ, তাঁহারা আমাদিগকে উহাতে উৎসাহ দিতেন। পরিশেষে আমরা এই খেলাকে এমন করিয়া তুলিয়াছিলাম যে, তিনজনেই সমস্ত বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় করিতাম। আর, তাহা সবই ডৌল-মত হইত। কেবল সীন্ (দৃশ্যপট) ও পোশাকপরিচ্ছদ ব্যবহার করিতাম না।

"এইরূপে খেলাটি যখন সর্বাঙ্গসুন্দর হইল, খেলিয়া ও খেলা দেখাইয়া, যখন আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, তখন খেলায় আমার আশ মিটিল। তখন আসল জিনিসটা বিশেষরূপে দেখিতে আমার আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। ব্যাপারটিও অল্পে অল্পে বুঝিতে লাগিলাম। প্রত্যহই রিহার্স্যাল দেখিতাম। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কার্যকলাপ—ধরণ-ধারণ, কথা-বার্তা, সবই বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতাম ও শুনিতাম। দেখিয়া শুনিয়া ক্রমশ আমার বুদ্ধি খুলিতে লাগিল। জ্ঞান মার্জিত

হইতে লাগিল। আমি ক্রমশই বুঝিতে লাগিলাম, অভিনেতব্য বিষয়ের ভাবানুসারে, কল্পনার সাহায্যে, তত্তৎ-ভাব-প্রকাশক স্বর-সংযোগে যিনি যত সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক অঙ্গ-ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া, অভিনয় করিতে পারিবেন, তাঁহার অভিনয়, ততই মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হইবে। রিহার্স্যালে শিক্ষক ইহাই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন। শিক্ষার্থী, ইহাই শিক্ষা করিতে চেষ্টা পান। বুঝিলাম, অভিনয়ে পারদর্শী হইতে হইলে, শিক্ষার্থীকে প্রথমত অনুকরণ-পটু হইতে হয়। কথার জড়তা ও উচ্চারণের দ্রুততা পরিত্যাগ করিতে হয়। যখন এতটুকু বুঝিলাম, তখন রাজবাড়ির বিদ্যাসুন্দরের সমস্ত অভিনেতার অভিনয়ের মধ্যে ব্রজদুর্লভ বাবুর এবং গিরিশবাবুর অভিনয়ই, আমার নিকট সর্বাপেক্ষা নির্দোষ ও মনোরম বোধ হইত। রাধাপ্রসাদ বাবুও তাঁহাদের অপেক্ষা অভিনয়-কৌশলে কোনো অংশেই হীন ছিলেন না; কিন্তু তবু যেন কতকগুলি সূক্ষ্ম কারণে ব্রজদুর্লভবাবুকেই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

"ব্রজদুর্লভবাবু, একজন সামান্য প্রহরী সাজিতেন বটে, কিন্তু সেই সামান্য পাত্রের অভিনয়েই তাঁহার কৌশল স্পষ্ট বোঝা যাইত। মালিনীকে নিগ্রহের সময়ে দুর্লভবাবু যেরূপ স্বাভাবিক ভাব, ভাষা ও অঙ্গ-ভঙ্গীর সহিত মালিনীকে বিরাশী সিক্কার ওজনে এক চড় মারিতে যাইতেন, তাহা আমার বড়ই ভাল লাগিত। ইহার সহিত তুলনায় অপরের অভিনয়ে অনেক হীনতা দেখিতে পাইতাম। দুর্লভবাবু, রাধাপ্রসাদবাবু, গিরিশবাবু ও কৃষ্ণধনবাবু অভিনয়কালে যেরূপ মনোযোগ দিয়া অভিনেতব্য অংশটিকে প্রকৃত ঘটনাবৎ প্রতিফলিত করিবার জন্য তাহার ভাবানুযায়ী অঙ্গ-বিক্ষেপাদি বা স্বর-ভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, অপর কেহ তাহা রাখিতেন না বলিয়াই আমার ন্যায় একজন নাট্যরসবোধহীন বালক ও নূতন দর্শকের মনে অভিনেতব্য ঘটনার বা অভিনয়ের স্থায়ী ছবি আঁকিয়া দিতে পারিতেন না। কেন এরূপ হইত, তাহার মূল কারণ, যদিও তখন আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু অস্বাভাবিক অভিনয় দেখিয়া আমি তখন বিরক্ত হইতাম। ইহার একটা উদাহরণ আপনাদিগকে দিতেছি।

"বিদ্যাসুন্দরের প্রথম মিলনের পর সখীরা, একটা গান করিত।

সেই গানের একটা কলি এই—

হেরি রূপ দুজনার গুণমণি বিধাতার
উভয়ের তরে বুঝি উভয়েরে গড়িল।

"এই গীতাংশ গাহিবার সময় সখীরা, ইহার 'হেরি রূপ দুজনার'—এইটুকু গাহিবার সময় একহাত চিৎ করিয়া বিদ্যাসুন্দরের দিকে দেখাইয়া দিত। 'গুণমণি বিধাতার' এইটুকু গাহিতে গাহিতে বিধাতার উদ্দেশে ঊর্ধ্বে তর্জনী উত্তোলন করিত এবং শেষ চরণ গাহিতে গাহিতে একবার বিদ্যার. একবার সুন্দরের কাছে হাত চিৎ করিয়া দুই হাত একসঙ্গে নাড়িত। এরূপ হস্তভঙ্গী কখনই স্বাভাবিক নয়। কাজেই উহা আমার বড় বিসদৃশ লাগিত।' এতটা অস্বাভাবিকতা যে অভিনেতাদিগের নিজের দোষে ঘটিত, তাহা নহে। তাহার অন্য কারণ ছিল। তাহা কোন কারণবশত আমি এখন বলিলাম না।

"বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় দেখিয়া আমার অভিনয়-জ্ঞান, আপনা হইতে এই পর্যন্ত স্ফূর্তি পাইয়াছিল। আমি এ বিষয়ে তখন কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতাম না। কারণ তখনও আমি পঠদ্দশায়।"

'সন্দর্ভ সংগ্রহ', ১৩০৫ সাল : মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি )

অতঃপর আর-এক ক্ষেত্রে অর্দ্ধেন্দুশেখরের নতুনকোটা নাট্যবোধ পূর্ণতার স্পর্শ পায়। সে ক্ষেত্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালা। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ( ১৮৪৯খ্রীঃ—১৯২৫ খ্রীঃ ), গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথ ( ১৮৪৭ খ্রীঃ—১৮৮১ খ্রীঃ ) ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এক ভগিনীপতি সারদাপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। এখানে প্রথম অভিনীত হয় মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' ; তার কিছুকাল পরে অভিনীত হয় মাইকেলেরই 'একেই কি বলে সভ্যতা ?'। জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত তৃতীয় নাটক 'নব-নাটক'। প্রথম অভিনয়ের তারিখ—৫ই জানুয়ারি, ১৮৬৭ খ্রীঃ, আর শেষ অভিনয়ের তারিখ—২৩এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭ খ্রীঃ। উপর্যুপরি ন-বার 'নব-নাটক' অভিনীত হয়েছিল এবং এর অভিনয় সারা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'-তে লিপিবদ্ধ আছে :

"অভিনয়-দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।...তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের

দ্বারা দৃশ্যগুলি (Scene) অঙ্কিত হইয়াছিল। স্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকীপোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।"

মঞ্চসজ্জার উৎকর্ষসম্বন্ধে সে-কালের সুপ্রসিদ্ধ 'সোমপ্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রের (২৮ এ জানুয়ারি, ১৮৬৭) সপ্রশংস মন্তব্য :

"নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্মিত ও দ্রষ্টব্যার্থগুলি সুন্দর বিশেষত সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতি মনোহর হইয়াছিল।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'—পৃ. ৫৬ থেকে পুনরুদ্ধৃত)

'নব-নাটক'-এর নায়ক গবেশবাবুর চরিত্রে অক্ষয়কুমার মজুমদারের অনবদ্য অভিনয় সম্পর্কে বাবু গৌরদাস বসাকের মন্তব্য :

"In Babu Akshoy Kumar Mazumdar a Jester of no less distinction than Babu Keshub Chunder Ganguly."*

এই 'নব-নাটক'-এর নাট্যরীতির দ্বারা অর্দ্ধেন্দুশেখর কিরূপ গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সেটি তাঁর নিজের উচ্চারণেই জ্ঞাপিত হয়েছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর বলছেন :

"আমি নবনাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। তখনও আমি থিয়েটারের কেহই নহি, থিয়েটারও আমার কিছুই নহে; সুতরাং তখন আমার নিমন্ত্রণ সে হিসাবে হয় নাই। তখন আমার প্রাণে অস্ফুটরূপে নাট্যরসবোধের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাও কেহ জানিতেন না। বোধ হয় আমিও তাহা বুঝিতাম কিনা সন্দেহ। ফলতঃ নাট্যরসজ্ঞ বলিয়া আমি নিমন্ত্রিত হই নাই। এখন আপনারা আমাকে এ সম্বন্ধে যে ভাবে দেখেন, তখন আমাকে সে ভাবে দেখিবার উপযোগিতার বিন্দুমাত্র স্ফুরণও আমাতে হয় নাই। এই নাট্যসম্প্রদায়ের অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রীনাথ ঠাকুরের খুড়তুতো ভগ্নীর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। এই আত্মীয়তার জন্যই আমি নিমন্ত্রিত হই।

*'নাট্যমন্দির' (মাঘ-ফাল্গুন, ১৩১৮) পত্রিকায় 'বিশেষজ্ঞ' (কিরণচন্দ্র দত্ত) লিখিত বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধ—পৃঃ ৫২০-৫২১ থেকে পুনরুদ্ধৃত।

"যথাসময়ে অভিনয় দেখিলাম। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়িতে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় দেখিয়া অভিনয় সম্বন্ধে আমার যতটা জ্ঞান হইয়াছিল, পূর্বে তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। এক্ষণে এই নবনাটকের অভিনয় দেখিয়া অভিনয় সম্বন্ধে আমার আর যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার ও জানিবার ছিল, তাহা দেখা শুনা ও জানা হইয়া গেল। এই অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর ও মনোরম হইয়াছিল। সুসঙ্গত অভিনয়ের সহিত সুসঙ্গত দৃশ্যপটাদি থাকিলে অভিনয় কতটা হৃদয়স্পর্শী হয়, তাহা আমি এই অভিনয় দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। পাথুরিয়াঘাটার রঙ্গমঞ্চ, পট-পরিচ্ছদাদি কোন অংশে অস্বাভাবিক বা সাজসজ্জা অসাময়িক হয় নাই। কিন্তু সকল অভিনেতার সুসঙ্গত অভিনয়ের অভাবে তাহার প্রভাব, ততটা পূর্ণরূপে বোঝা যায় নাই। এখানকার অতি সামান্য অংশের অভিনেতাটি পর্যন্ত অতি দক্ষতার সহিত প্রকৃত বস্তুর অনুকরণ করেন। ঢঙ্-ঢাঙ্, চাল-চলন, বলা-কহা, চলা-ফেরা, বসা-দাঁড়া, হাসা-কাঁদা কিছুতেই কোন অভিনেতাকে কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় নাই। যাহাকে দেখি, সে-ই যেন স্বীয় অভিনেতব্য বিষয়ে মূল প্রকৃত ব্যক্তি। একটা কিছুর নকল বা অভিনয় দেখিতে আমরা সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়া বসিয়াছি, আর আমাদেব সম্মুখে পুতুল-নাচের মত রঙ্গীন পোষাকে সাজিয়া অভিনেতারা হাস্যমুখ নাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, এরূপভাব একবারও মনে হয় নাই। অভিনেতব্য ব্যাপারও অভিনয়গুণে এতটা মর্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, আমরাও ( দর্শকগণও ) এই ব্যাপারের সহিত কোনরূপ লিপ্ত নই, এরূপ একটা স্বাতন্ত্র্য বোধ করিবার অবসর পাই নাই। বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় দেখিয়া আমার মনে যে সকল প্রশ্ন উঠিয়াছিল, এই নবনাটকের অভিনয় দেখিয়াই সেগুলির সমাধান হইয়া গেল। বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়-দর্শন-কালে অভিনয়ে যেন কতকগুলা অভাব ও বৈষম্য ঘটিতেছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল ; কিন্তু সেগুলা যে কি, তাহা তখন ঠিক বুঝিতে পারি নাই। নবনাটকের অভিনয় দেখিয়া সেই অভাবগুলি—সেই অসামঞ্জস্য গুলি কি, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। কিসে সেগুলি দূর হইতে পারে, তাহাও বুঝিয়া লইলাম।

"এই অভিনয় দেখিয়া আসিবার পর কিছুদিন ঐ সম্বন্ধে আমার মনোমধ্যে মহৎ আন্দোলন চলিয়াছিল। এই আলোচনায় আমি স্থির

করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম,—অভিনেতব্য বিষয়ের স্থান-কাল-পাত্রাদির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দৃশ্যপটাদি চিত্রিত না হইলে বা দৃশ্যপটাদির উপযুক্ত আয়োজন না করিলে, অভিনয় সুসঙ্গত হইলেও, তাহার প্রাণ-স্পর্শিনী শক্তি ততটা কার্যকারিণী হয় না—সুতরাং মনোরমও হয় না। তাহার পর পোশাকে সাজিতে হইবে বলিয়াই যে চিত্র-বসন, পরিষ্কৃত বস্ত্র, রঙ্গীন ও জরির কাজ করা পোশাক পরিয়া কালি-ঝুলি ও রঙ্ মাখিয়া সাজিতেই হইবে, এমন নহে। যে, যেরূপ অংশ অভিনয় করিবে, তাহার পোশাক তদনুরূপ হওয়া উচিত। চরিত্রভেদে, অবস্থাভেদে তাহা মলিন, ছিন্ন বা উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক। অভিনেতব্য ঘটনার স্থান ও কাল অনুসারে পাত্র-পাত্রীদের পরিচ্ছদের বিভিন্নতা থাকা উচিত। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষেও পোশাকের পরিবর্তন হওয়া বিধেয়। তাহার পর অভিনয়ের ভাষা। আমরা যখন যে অবস্থায় আত্ম-পরিজনের সহিত যতটা সহজভাবে কথা-বার্তা কহি, প্রয়োজন মত হাত-পা, মুখ, মাথা নাড়িয়া থাকি, চোখমুখ ঘুরাইয়া থাকি, অভিনেতারও অভিনয়কালে সেইরূপ করা আবশ্যক। নতুবা আবৃত্তিমাত্র করিলে, তাহা শুনিয়া দর্শকদের মনে কোন ভাবই জন্মে না। নৈসর্গিক বস্তুকে সর্বপ্রকারে অনুকরণই প্রয়োজনীয়। অভিনয়কালে দর্শকের মনে ধারণা করাইবার জন্য কাল্পনিক ওজস্বিতা বা সুর অবলম্বন করিয়া আবৃত্তি করা অবৈধ। সুসঙ্গতভাবে স্বভাবসঙ্গত ভাষায় ও স্বরে অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে অভিনয় করাই প্রকৃত অভিনয়।

" 'নবনাটকের' অভিনয় যখন দেখি, তখন আমার নূতন দৃষ্টি। সেই নূতন দৃষ্টি, নূতন বিচার-শক্তি লইয়া তখন যেসকল বিষয়ে যতটা মীমাংসা করিতে পারিয়াছিলাম, তখনকার কোমল মস্তিষ্কে যে সকল কঠিন বিষয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই, উপরে বলিলাম। এখন এই বয়সে কার্যক্ষেত্রে থাকিয়া ঐ সকল বিষয়ের উপযোগিতা নিজে পরীক্ষা করিয়া প্রমাণিত করিয়া লইয়াছি এবং অনেক নূতন বিষয়ও জানিয়াছি। অভিনয়ে কৌশল চাই বটে, কিন্তু কেবল কৌশল-ময় অভিনয়ে দর্শক মুগ্ধ হয় মাত্র; তৃপ্ত হয় না। স্বভাবের সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অনুকরণের মধ্য দিয়া কৌশলকে প্রয়োগ করিতে পারিলে, অভিনয়, সুসঙ্গত ও মনোরম হয়। এ সকল কথা এখন বলিতে গেলে, আমার নিকট আপনারা উদাহরণ প্রত্যাশা করিবেন। আমারও দৃষ্টান্ত দেওয়া

উচিত কিন্তু অনেক কারণে তাহা এখন করিতে পারিলাম না।” ( ‘সন্দর্ভ সংগ্রহ’, ১৩০৫ সাল : মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি )।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### প্রতিভার প্রস্ফুরণ

যতীন্দ্রমোহনের বঙ্গনাট্যালয়ে ‘বুঝলে কিনা’* প্রহসনের অভিনয় বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, ঐ প্রহসনের অভিনয়ের সূত্রেই অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতিভার প্রস্ফুরণ ও জীবনের গতিপথের পরিবর্তন ঘটে।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়িতে ‘বুঝলে কিনা’ অভিনীত হয় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে। এই প্রহসনে যতীন্দ্রমোহন তৎকালিক বাঙালী সমাজের একটি প্রতিপত্তিশালী দলবিশেষের প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়া কি ভীষণ আকার ধারণ করেছিল তা সেকালের সংবাদপত্রের বিবরণে পাওয়া যায়—

> “Indeed some of the Dolluputies who were present at the acting looked thunder as the plot developed.” (‘The Bengalee’, 22nd December, 1866)‡

বিরুদ্ধ দলপতিরা জবাব দিলেন ‘কিছু কিছু বুঝি’ নামক প্রহসন অভিনয় করে। প্রহসনটির রচয়িতা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। প্রহসনের মুখবন্ধে লেখক ঘোষণা করেছিলেন যে—

> “কয়লাহাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অধ্যক্ষবৃন্দ অভিনয়ার্থে দেশাচার-সংশোধন-বিষয়ক একখানি প্রহসন আমাকে প্রস্তুত করিতে বলায়, সুরাসেবন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, অপব্যয় ও অল্পবয়স্ক বালকগণ নাটকাভিনয়ে অধ্যয়নে বঞ্চিত হওয়া, ইত্যাদি কয়েকটি প্রস্তাবে এই ‘কিছু কিছু বুঝি’ প্রহসনখানি প্রস্তুত করিলাম।”

* এই প্রহসনটির রচয়িতার নাম নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। অমৃতলাল বসু ও রাধামাধব করের মতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতে প্রিয়মাধব বসুমল্লিক এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

‡Quoted in Brajendra Nath Banerjee's ‘Bengali Stage’, p. 27.

কিন্তু প্রহসনখানির সর্বত্র পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ নিহিত ছিল। শৌরীন্দ্রমোহনের দন্তরোগ ছিল বলে 'দন্তবক্র' চরিত্র অবতারণা করে তাঁকে বিদ্রূপ করা হয়েছিল। ভুলু মুখুয্যে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির প্রতি কটাক্ষপাত ক'রে গান বেঁধেছিলেন :

ওরে নেশাতে ঢুলুঢুলু ক'রে ভুনয়ন
রাবণ মারিল রামে, কাঁদে দুর্যোধন।
না বুঝে করেছি নেশা
কোথায় আমার রইল পেশা
এলোকেশে এলো কেশা করিবারে রণ।
দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো
পদ্মীরে পেয়েছে পেঁচো
বিয়ে হোল গর্ভবতী ঠাকুরের লিখন।
শিবের ঘরে কেষ্টার মেয়ে
পেঁচোর মত রইল চেয়ে
শকুনি ঢাকায় গঙ্গায় নেয়ে কোরলে পলায়ন।
খেয়েছি অসহ্য মদ
দিয়েছি কার লেজে পদ
এতো নহে কম বিপদ কামড়ে না এখন।
একি হোল দাঁতের জ্বালা
লোকালয়ে বিষম জ্বালা
কানেতে করিল কালা বিকট বদন।

এই গানটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'বিশ্বকোষ' বলছেন :

"এই গানটি সুপ্রসিদ্ধ 'ওরে নেশাতে ঢুলঢুল করে ভুনয়ন, কোথায় রহিল আমার সে বিধুবদন॥' (ইত্যাদি) গানের সুরে ও তাহারই শ্লেষ (parody) রূপে রচিত। ভোলানাথবাবুই গানটির রচয়িতা। তখন কবি, পাঁচালী, খেউড়ের আমোদে দেশ পরিপূর্ণ। কবিতায় শ্লেষ বিদ্রূপ পাইলে লোকে আমোদে নাচিয়া উঠিত। এতদ্ব্যতীত তখন যুবক এবং ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপান, বিলাস এবং আমোদের স্রোত এমন অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মদ্যপান করি না বলিতে লোকে লজ্জাবোধ করিত। এ সময়ে যে সকল নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হইত, প্রত্যেক সম্প্রদায়েই মদের স্রোত বহিয়া

যাইত। মদের অকাতর ব্যয় করিতে না পারিলে তখন দল জমান দুরূহ হইত। অনেক দলে এই মদের জন্য অভিনয়ের সময়েও অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত। যখন দেশের রুচির এই অবস্থা, তখন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (ইনি তখনকার যাত্রা, পাঁচালী, তরজার ছড়া ও পালা বাঁধিতেন) গ্রন্থকার হওয়াতে অতর্কিতভাবে এই গানটি 'কিছু কিছু বুঝি'র দলে গীত হইয়াছিল। গানটিতে পূর্ববর্তী কয়েকটি অভিনয়ের প্রতি কটাক্ষ ছিল, গালি ছিল না।

'এলোকেশে এলো কেশা'—শ্রীযুক্ত (মহারাজ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ির নাট্যশিক্ষক কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

'দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো'—বাগবাজারের নলদময়ন্তীর অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য।

'পদ্মীরে পেয়েছে পেঁচো'—বটতলায় পাঁচকড়ি বা পঞ্চানন মিত্রের উদ্যোগে পদ্মাবতীর যে অভিনয় হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য।

'বিদ্যে হল গর্ভবতী ঠাকুরের লিখন'—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ির বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য।

'শিবের ঘরে কেষ্টার মেয়ে'—শোভাবাজারের রাজা শিবকৃষ্ণের বাড়িতে কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

'শকুনি ঢাকায় গঙ্গায় নেয়ে'—ঐ সময়ে গঙ্গার অপর পারে শকুন্তলার অভিনয় হইবার উদ্যোগ হইতেছিল। সেই দলের প্রতি শ্লেষোক্তি।

'খেয়েছি অসহ্য মদ'—সাধারণত মদ্যপ অভিনেতার প্রতি লক্ষ্য।

'একি হল দাঁতের জ্বালা'—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতি লক্ষ্য।

[ প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে ( ১৬শ খণ্ড, ১৩১২ বঙ্গাব্দ ) ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখিত 'রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় )' শীর্ষক প্রবন্ধ ]

উপেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ( অর্দ্ধেন্দুর মেজো পিসেমশায় ) পুত্র অতীন্দ্রনন্দন, শ্যামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় জামাতা ) ও মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের পৌত্র শচীন্দ্রনাথ 'কিছু কিছু বুঝি'-র অভিনয় ব্যাপারে মাতব্বর ছিলেন। এঁরা কিশোর অর্দ্ধেন্দুর সহজাত অনুকরণ-চিকীর্ষা লক্ষ্য ক'রে তাঁকে দলে টেনে নিলেন। অর্দ্ধেন্দুও আপন প্রতিভা

প্রকাশের সুযোগ খুঁজছিলেন, সুযোগ পেলেন। তাঁর ওপর দল গঠন ও অভিনয় শিক্ষা দানের ভার পড়ে। হেমেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর কয়লাহাটার (রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট) বাড়িতে মঞ্চ স্থাপনের আয়োজন চলতে থাকে।

মঞ্চ নির্মাণের জন্যে অর্দ্ধেন্দু তাঁর বাগবাজারের বন্ধু ধর্মদাস সুরকে (১৮৫২ খ্রীঃ—১৯১০ খ্রীঃ) নিযুক্ত করেন।* ধর্মদাস সম্পর্কে পরবর্তীকালে অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন:

> "ধর্মদাস সুর ছিল মামুলী গৃহস্থ ছোকরা; স্কুলে পড়া এন্‌ট্রেন্স অবধি, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তার আঙুলগুলির ব্যবহারে একটা পারিপাট্য দৃষ্ট হ'ত; হাতের লেখা অতি পরিষ্কার, খাতায় রুল টানত সুন্দর, ম্যাপ আঁকত চমৎকার, আর সরস্বতী পূজার সময় কুমারটুলী থেকে ঠাকুর কিনে এনে নিজের হাতে সাজিয়ে চৌকীর উপর বাগান রচনা ক'রে, যখন প্রতিমাখানি তার উপর বসাত, তখন বড় বড় কারিগরও তার তারিফ না ক'রে থাকতে পারত না।" ('ভুবনমোহন নিয়োগী': মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪)

অনেকদিনের অদর্শনে স্কুলের দিনের সহপাঠী অর্দ্ধেন্দুকে মনে রাখবার অমৃতলালের কথা নয়। 'কিছু কিছু বুঝি'-র অভিনয় উপলক্ষে অর্দ্ধেন্দুর ছবি আবার কী ক'রে তাঁর স্মৃতির মধ্যে ফুটে ওঠে সে বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে অমৃতলাল তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন:

> "ইহার পরে** প্রায় চার বৎসর কাটিয়া গেল। অর্দ্ধেন্দুর সহিত আমার দেখাশুনা হয় নাই; তাঁহার নাম পর্যন্ত আমি বিস্মৃত হইয়া গেলাম। আমি ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে তখন অধ্যয়ন করি। আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্বেই প্রাইভেট্ থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা ছেলেমহলে খুব হইত। কোথায় কোন্ নাটক অভিনীত হইল, কে কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, নাটকে কলিকাতা সমাজের

* এই প্রসঙ্গে ধর্মদাস সুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "কয়লাহাটায় 'কিছু কিছু বুঝি' সম্প্রদায়ের যখন রিহার্স্যাল চলিতেছে, তখন মুস্তফী মহাশয় আমার শিল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধে পরিচয় দিয়া ও তাঁহাদের সকলের মত লইয়া আমাকে ষ্টেজ ম্যানেজার করিলেন। আমার এই প্রথম প্রবেশ ও এই উন্নতি, মুস্তফীরও এই প্রথম প্রবেশ ও শিক্ষকতার উন্নতি। উক্ত সম্প্রদায়ের কয়েকরাত্রি অভিনয় হইবার পর কোন বিশেষ কারণবশতঃ উক্ত থিয়েটার উঠিয়া গেল।" 'নাট্যমন্দির', ভাদ্র ১৩১৭, পৃ ৯৭।

** অর্দ্ধেন্দুর কম্বুলিয়াটোলার স্কুল পরিত্যাগের পর।

কোন্ ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই সমস্ত বিষয় লইয়া ছেলেরা জল্পনা কল্পনা করিত। এইখানে আপনাকে বলিয়া রাখি যে 'হুতোম্ প্যাচার নক্সা' রচনার পর হইতে নাটক বা উপন্যাস সাহিত্যে কে, কার জবাব দিল ইহাই সকলে জানিতে চেষ্টা করিত। আমি অনেক নাটক পড়িয়াছিলাম, কিন্তু কখনও থিয়েটার দেখিতে যাই নাই; সন্ধ্যার পরে বাড়ির বাহিরে বেশীক্ষণ থাকা আমাদের নিষেধ ছিল। শুনিলাম যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বুঝলে কিনা'র জবাব ভুলু মুখুয্যে (আহিরী-টোলার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়) খুব দিয়াছে; তাহার জবাবের নাম 'কিছু কিছু বুঝি'। ছেলেমহলে খুব হৈচৈ পড়িয়া গেল। আমরা শুনিলাম জোড়াসাঁকোর কয়লাঘাটায় উহা অভিনীত হইবে। বন্ধুরা আসিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন—'চল, থিয়েটার দেখতে হবে।' আমি বলিলাম, 'আমার যাওয়া হবে না; সন্ধ্যার পরে কখনও বাড়ির বাহিরে থাকি নাই।' তাঁহারা বলিলেন,—'তবে না হয় দিনের বেলায় চল, স্টেজ দেখে আসবে।' আমি সম্মত হইলাম। সেখানে আমার প্রথম থিয়েটারের স্টেজ দর্শন হইল। সীন্ বড় বেশী ছিল না; দেয়ালের গায়ে একখানা 'সীন্' অঙ্কিত দেখিলাম। কৌতূহলবশবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কে কে অভিনয় করিবে? শুনিলাম,—ধর্মদাস আছেন, আর আছেন—অর্দ্ধেন্দু! নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। 'অর্দ্ধেন্দু? কোন্ অর্দ্ধেন্দু?' কে একজন বলিল—'অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। চমৎকার প্লে করে।' এ নাম ত আর কাহারও হইতে পারে না; ইনি নিশ্চয়ই আমার সেই কম্বুলিয়াটোলা স্কুলের সহপাঠী! কিন্তু তখন ত সে অত্যন্ত অরসিক ছিল; এখন চমৎকার অ্যাক্ট করে! জিজ্ঞাসা করিলাম—'একবার তাঁর সঙ্গে দেখার সুবিধা হয় না। সে কোথায়?' দেখা হইল না; ফিরিয়া আসিলাম।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়: বিপিন বিহারী গুপ্ত)

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর (১২৭৪ বঙ্গাব্দের ১৭ই কার্তিক) শনিবার 'কিছু কিছু বুঝি'-র প্রথম অভিনয় হয়। পরিচয়লিপি এই: দন্তবক্র, মুরাদ আলি ও চন্দনবিলাস—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, চন্দন বিলাসী—ধর্মদাস সুর, নট—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, থড়োতেশ্বর—বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, গুরুজী—

শশিভূষণ দাঁ, কলু—বেণীমাধব মিত্র, বিনোদ—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বৈষ্ণবী—কার্তিকলাল মিত্র, বরদা—পূর্ণ মুখোপাধ্যায়।

ভিন্ন ভিন্ন রজনীতে দর্শকের আসনে উপস্থিত ছিলেন মাইকেল, গৌরদাস বসাক, ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভগিনীপতি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর অর্দ্ধেন্দুশেখরের বন্ধুত্রয় অমৃতলাল বসু, রাধামাধব কর (১৮৫২ খ্রীঃ—?) ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫০-১৮৮১ খ্রীঃ)।

'বিশ্বকোষ'—এর মতে :

> "এতদিন যেখানে যত রকমের প্রহসন অভিনয় হইয়াছিল, এই প্রহসনের অভিনয় সে সমস্ত অপেক্ষা মনোরম হইয়াছিল। এই অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু তিনটি বিভিন্ন অংশের অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে সুসঙ্গত প্রকারের অভিনয়ে তাঁহার নিপুণতা এই সময়েই পূর্ণবিকশিত ও প্রদর্শিত হইয়া ছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার এক অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন 'মৃত্তিকেরে বাবা মৃত্তিকে' অর্থাৎ অন্য সকলকে মাটি করিল। * মুস্তফী মহাশয় ও ধর্মদাস সুরের এই প্রথম অভিনয়, এই অভিনয়েই তাঁহাদের জীবনের গতি ফিরিয়া গেল।" [দ্রঃ প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে (১৬শ খণ্ড, ১৩১২ বঙ্গাব্দ) ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখিত 'রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)' শীর্ষক প্রবন্ধ]

'কিছু কিছু বুঝি' নাট্যানুষ্ঠানের রন্ধ্রপথে অর্দ্ধেন্দুর সাংসারিক জীবনে অশুভ পরিণতির শনি প্রবেশ করে। অর্দ্ধেন্দু অভিজাত বংশের সন্তান হলেও তাঁর পিতা শ্যামাচরণের আর্থিক স্বাচ্ছল্য ছিল না। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি তাঁর পিতার সংসারনির্বাহের অবলম্বন ছিল। 'কিছু কিছু বুঝি'-তে অভিনয় করার অপরাধে অর্দ্ধেন্দু পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ি থেকে বিতাড়িত হন। পিতারও তিরস্কারভাজন হন। তাঁর পিতা তাঁকে উক্ত অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে বারংবার নিষেধ করেছিলেন কিন্তু অর্দ্ধেন্দু তাতে কর্ণপাত করেন নি। ফলে মুস্তফী পরিবারের ওপর কঠিন আঘাত নেমে আসে। ক্রুদ্ধ যতীন্দ্রমোহন অর্দ্ধেন্দুর পিতার মাসিক বৃত্তি বন্ধ ক'রে দিলেন। রঙ্গপ্রিয় অর্দ্ধেন্দু রঙ্গের জন্যই রঙ্গমঞ্চে

* কথিত আছে, অভিনয়ান্তে মাইকেল অর্দ্ধেন্দুশেখরকে পাব্‌লিক্ থিয়েটার খোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। (দ্রঃ 'মধুস্মৃতি' : নগেন্দ্রনাথ সোম)

অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু তার পরিণাম যে এত ভীষণ হবে তা তিনি ভাবেননি। যে একবার অভিনয়ের মাদকতা আস্বাদন করেছে, সে কথনও তা থেকে বিরত থাকতে পারে না। নানাদিক থেকে নানা বাধা পাওয়া সত্ত্বেও অর্দ্ধেন্দু অভিনয়ের নেশা ত্যাগ করতে পারলেন না। চূড়ান্ত আর্থিক সঙ্কটে প'ড়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর অতঃপর অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে পেশাদারী থিয়েটার গ'ড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই প্রয়াস-কাহিনী স্বয়ং অর্দ্ধেন্দুশেখরের মুখেই আমাদের শ্রোতব্য।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী'-র অভিনয়
### এবং
### ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস-কাহিনী ( ১৮৬৮-১৮৭২ )

অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিজের জবানীতে তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশের বিবৃতি পাঠকের সামনে উপস্থিত করার আগে কিছু মুখবন্ধের প্রয়োজন আছে। কারণ, পরবর্তীকালে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ও প্রকাশিত 'বিশ্বকোষ'-এ ( ১৬শ খণ্ড, ১৩১২ বঙ্গাব্দ ) 'রঙ্গালয়' শীর্ষক প্রবন্ধের 'রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় )' অংশটি ( পৃ. ১৭১-১৯৮ ) মুখ্যত অর্দ্ধেন্দুশেখরের এই বক্তৃতার উপর ভিত্তি ক'রে রচিত। সকলেই জানেন এই অংশের রচয়িতা অর্দ্ধেন্দু-পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী। উত্তরকালে এই প্রবন্ধের বহু বক্তব্যের ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। অনেকেই প্রবন্ধকারের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত তথ্যবিকৃতির অভিযোগ এনেছেন এবং কেউ কেউ এর মধ্যে অর্দ্ধেন্দু-প্রতিষ্ঠার সূক্ষ্ম প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন। প্রতিবাদীদের মধ্যে আছেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র, রাধামাধব কর, ধর্মদাস সুর প্রভৃতি। বাংলা-সাধারণ রঙ্গালয়ের আদি যুগের এঁরা প্রত্যেকেই এক একজন দিক্‌পাল। সুতরাং এঁদের পরস্পরবিরোধী উক্তিগুলি থেকে সত্যনির্ধারণের চেষ্টা সাধারণ রঙ্গালয়ের আদিযুগের ইতিহাসের পক্ষে প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র মুখবন্ধে সে প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, সমস্ত পরস্পরবিরোধী উক্তির সত্যাসত্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। যেমন, গিরিশচন্দ্রের শ্যালক ব্রজনাথ দেবের বাড়ি থেকে স্টেজের কাঠগুলি নিজেরা বহন করে এনেছিলেন অর্থাভাবে ( অর্দ্ধেন্দু ) না চুপিসারে

কাজ সারার জন্যে ( রাধামাধব ), কাঠগুলি ব্রজবাবুর মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে আনা হয়েছিল ( অর্দ্ধেন্দু ) না তাঁর মৃত্যুর তিনমাস পরে আনা হয়েছিল ( ধর্মদাস ), টিকিট বিক্রি ক'রে থিয়েটার চালানোর প্রস্তাব প্রথমে অর্দ্ধেন্দু করেছিলেন ( অর্দ্ধেন্দু ) না মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন ( রাধামাধব )—ইত্যাদি প্রশ্নগুলির মীমাংসা অসম্ভব, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্দ্ধেন্দুর উক্তি এবং প্রতিবাদীর উক্তি উভয়েই অসমর্থিত (uncorroborated)। কিন্তু এই প্রশ্নগুলির মীমাংসার সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুর পরবর্তী নটজীবন বা সাধারণ রঙ্গালয়ের আবির্ভাবের সম্পর্ক বড় অল্প। আর এক শ্রেণীর বাদ-প্রতিবাদ আছে যা একান্ত ব্যক্তিগত মতামতের ওপর নির্ভরশীল। যেমন, 'নব-নাটক'-এর অভিনয় দেখে অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল ( অর্দ্ধেন্দু ) না হয়নি ( গিরিশচন্দ্র )। অবশ্য অর্দ্ধেন্দু স্বীকার করেছিলেন যে, পরবর্তীকালে নাটক অভিনয় ও প্রয়োগ-কালে তিনি এ বিষয়ে আরও বহুবিধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বোধহয় অর্দ্ধেন্দুর বক্তব্যের নিহিতার্থ ছিল এই যে, তিনি সাক্ষাৎভাবে কারও কাছে অভিনয় শিক্ষা করেননি—প্রথম জীবনে যা শিখেছিলেন তা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আর অক্ষয়কুমার মজুমদারের অভিনয় দেখে এবং তারপরে নিজের নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির ওপর নির্ভর ক'রে।

এই দুই জাতীয় বিতর্কের কথা বাদ দিলেও মূল বিতর্কিত প্রশ্নটি থেকেই যায়। প্রশ্নটি এই, প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনে অর্দ্ধেন্দুশেখরের অবদান কতটুকু? সৌভাগ্যক্রমে, এই প্রশ্ন সমাধানের জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমাদের হাতে আছে এবং এর একপ্রকার সন্তোষজনক মীমাংসাও সম্ভবপর। আমরা এখন সেই চেষ্টা করবো।

প্রথম পদক্ষেপেই কয়েকটি সাল-তারিখের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

(১) অর্দ্ধেন্দু কর্তৃক বিবৃতিটি প্রদত্ত হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ( ২২এ অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ ) তারিখে; উপলক্ষ্য—বাংলা সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার অষ্টাবিংশ সাংবাৎসরিক উৎসব; স্থান—মিনার্ভা থিয়েটার।

(২) 'রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় )' শীর্ষক প্রবন্ধের ( 'বিশ্বকোষ' ১৬শ খণ্ডে মুদ্রিত ) প্রকাশকাল ১৩১২ বঙ্গাব্দ, ইং ১৯০৫-৬।

(৩) অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যু—৩১এ ভাদ্র, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ ( ইং ১৯০৮, ১৭ই সেপ্টেম্বর )।

(৪) গিরিশচন্দ্রের যে প্রবন্ধে ( 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয়

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' ) প্রতিবাদের সূত্রপাত হয় তার প্রকাশকাল ১০ই আশ্বিন, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ ( ইং ১৯০৮, ২৬এ সেপ্টেম্বর )। মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় প্রবন্ধটি গিরিশচন্দ্র কর্তৃক পঠিত হয়।

(৫) রাধামাধব করের প্রতিবাদ ( স্মৃতিকথার আধারে ) 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২২-২৩ সালে। পরে বিপিনবিহারী গুপ্ত 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় ( ১৩৩০ সাল ) গ্রন্থে এই স্মৃতিকথা গ্রন্থিত করেন।

(৬) ধর্মদাস স্থরের বিবৃতি ( আত্মজীবনী ) প্রকাশিত হয় 'নাট্যমন্দির' পত্রিকার ১৩১৭ সালের ভাদ্র সংখ্যায় ও অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'গিরিশচন্দ্র' ( ১৩৩৪ ) গ্রন্থের ১৬শ পরিচ্ছেদে।

(৭) অর্দ্ধেন্দুর বিবৃতি প্রকাশিত হয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকার ১৩৩৬ সালের চৈত্র ও ১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায়। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর 'প্রাচীন পঞ্জী' শিরোনামায় 'বাংলা সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস'রূপে উক্ত পত্রিকায় এটি প্রকাশ করেন। ছাপানোর সময় পূর্ণচন্দ্র নিম্নোক্ত মন্তব্য সন্নিবিষ্ট করেন: "বাগবাজার মদনমোহনতলা নিবাসী প্রসিদ্ধ প্রাচীন নাট্যকার স্বর্গত সুপণ্ডিত গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পুত্র, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে একখানি পুরাতন কীটদষ্ট Cutting Book দিয়াছিলেন। 'বাঙ্গালা সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার'-র অষ্টাবিংশ সাংবাৎসরিক-উৎসব-উপলক্ষে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৭ নভেম্বর [ ডিসেম্বর ] শুক্রবার ( ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, ২২ অগ্রহায়ণ ) দিবসে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' সুহৃদ্বর স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় কলিকাতার থিয়েটার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত ছিল। সেই বক্তৃতার সারাংশ অবলম্বন করিয়াই এই নিবন্ধ এই স্থলে নিহিত হইল।—সংগ্রাহক।"

বলাবাহুল্য, অর্দ্ধেন্দুর ভাষণের প্রতিবাদ কেউ করেন নি; করা বোধ হয় সম্ভবপরও ছিল না, কারণ অর্দ্ধেন্দুর ভাষণের সঙ্গে সরাসরি পরিচয় সম্ভবত প্রতিবাদীদের কারও ছিল না। কারণ, সেই বক্তৃতাসভায় প্রতিবাদীরা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। ছিলেন অমৃতলাল বসু যিনি মাঝে মাঝে অর্দ্ধেন্দুর বক্তৃতাকে ধ্বনিদ্বারা সমর্থন করেছিলেন।

প্রতিবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্য হ'ল 'বিশ্বকোষ'-এর প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুর প্রায় দু'তিন বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল এবং অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুর পূর্বেই প্রতিবাদীদের চোখে পড়েছিল। অথচ, অর্দ্ধেন্দুর জীবদ্দশায় কেউ এ বিষয়ে

মুখ খোলেন নি। প্রথম মুখ খুললেন গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুর পরে—অর্দ্ধেন্দুর স্মৃতিসভায়। প্রতিবাদীরা যদি অর্দ্ধেন্দুর জীবদ্দশায় তাঁদের বক্তব্য পেশ করতেন তাহ'লে সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে যেসব প্রশ্নের মীমাংসা আজ আর সম্ভবপর নয় তার অনেকগুলিরই মীমাংসা হয়ত করা যেত।

এইবার মূল প্রশ্নটির সম্বন্ধে বাদী-প্রতিবাদীদের বক্তব্য পেশ করা যাক্।

অর্দ্ধেন্দু বলেছেন—

"১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ১২৭৮ সালের শীতকালে আমরা এইখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেম। গিরিশবাবু ব্যতীত লীলাবতীর দলের সকলেই যোগ দিলেন। এবার পৃষ্ঠপোষকগণের যত্নে আমাদের কার্যপ্রণালীর একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা গেল। দলের নগেন্দ্রবাবু সেক্রেটারী, ধর্মদাসবাবু সকল বিষয়ের ম্যানেজার, কার্তিকচন্দ্র ড্রেসার হলেন আর ডিরেক্টরী আর মাষ্টারী আমার ঘাড়ে পড়লো।...আমার প্রস্তাব মত 'নীলদর্পণ' রিহার্স্যাল দেওয়া হতে লাগল।"

গিরিশচন্দ্র বলেছেন—

"নীলদর্পণের শিক্ষা সম্বন্ধে নানাবিধ তর্কবিতর্ক শুনিতে পাই ও মুদ্রাঙ্কিত কাগজ দেখিতে পাই। সেইসব কাগজ ও কথার বিশেষ যত্ন, যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে নীলদর্পণের রিহারস্যালে আমার কোন হস্তক্ষেপ ছিল না, কেবল অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষাতেই সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। আমার সংস্রব ছিল বা না ছিল, তাহা জানাইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু নীলদর্পণ সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, একথায় অর্দ্ধেন্দুর বিশেষ প্রশংসা হয় না। কারণ উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ দুইবার অতি উচ্চ প্রশংসার সহিত 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' অভিনয় করিয়াছে। নীলদর্পণে নাটককারের কৃতিত্ব 'লীলাবতী'র অপেক্ষা অধিক হইলেও 'লীলাবতীতে' নীলদর্পণ অপেক্ষা অধিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। যাঁহারা লীলাবতী অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে চাষার শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইত, কারণ কঠিন কঠিন ভূমিকা সাবিত্রী, উড, গোলোক বসু প্রভৃতি অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'লীলাবতীতে' সম্প্রদায় যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি ভূমিকার অধিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। যথা 'লীলাবতীর' শ্রীনাথের পক্ষে নীলদর্পণের দাওয়ান বিশেষ কঠিন নয়। নীলদর্পণে আমার কোন সংস্রব ছিল না, ইহা প্রমাণ

করিয়া যিনি অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিশেষ প্রশংসার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে তিনি কৃতকার্য হইবেন না। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত নীলদর্পণের শিক্ষার অংশ না হোক, সধবার একাদশী ও লীলাবতী শিক্ষার দাবী শ্রীযুক্ত রাধামাধব করও রাখেন। নীলদর্পণ শিখাইবার অংশ অদ্যাবধি জীবিত ধর্মদাসবাবু আমাকে কাগজে কলমে দেন। নীলদর্পণ সম্প্রদায়ের অনেকেই মহেন্দ্রলাল, মতিলাল, কাপ্তেন বেল, শিবচন্দ্র প্রভৃতি আজীবন আমাকে গুরু বলিয়া গৌরব করিতেন। যাঁহার অপর প্রশংসা নাই, তাঁহার পক্ষপাতী ব্যক্তি যদি সত্যের অপলাপ করিয়া তাঁহার প্রশংসা বৃদ্ধির প্রয়াস পান, তাহাতে ফল না হোক, কতক পরিমাণে মার্জনীয় হইতে পারে। 'নীলদর্পণ' লইয়া আমার সহিত অর্দ্ধেন্দুর বিবাদ কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা অমূলক। ন্যাসানাল থিয়েটার স্থাপনের কর্তৃত্বভার শ্রীযুক্ত ধর্মদাস সুর ও ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অল্প ছিল না। নগেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের শিক্ষাও দিতেন। কতকটা স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও এ কর্তৃত্বের দাবী রাখেন। তিনি এই নীলদর্পণে লীলাবতীর ক্ষীরোদ-বাসিনী *চলিয়া যাওয়ায় সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা পান ও এই তাঁহার প্রথম নাটক শিক্ষা। যে সময়ে অমৃতবাবু নীলদর্পণে যোগ দেন, সে সময়ে আমি না থাকিবার কারণ কোনও বিবাদ নয়, মতের অনৈক্য মাত্র।"

( 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' )

ধর্মদাস সুরের বিবৃতি—

"তখন আমাদের লীলাবতীর রিহার্স্যাল চলিতেছে। আমাদের মধ্যে এমন কি অধিকাংশ লোকই Blank Verse ( অমিত্রাক্ষর ছন্দ ) পড়িতে জানিত না। গিরিশবাবু, তাহা কিরূপে পড়িতে হয়, সকলকে শিখাইয়া দেন। প্রকৃতপক্ষে থিয়েটারের ক, খ শিক্ষা হইতেই গিরিশবাবু মাস্টার।" [ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত 'গিরিশচন্দ্র' ( ১৩৩৪ ) গ্রন্থের ১৩শ পরিচ্ছেদ ]

ধর্মদাস সুর ও ভুবনমোহন নিয়োগীর যুক্ত বিবৃতি—

"যাহাই হউক সম্প্রদায় তৎপরে দ্বিগুণ উৎসাহে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর গঙ্গাতটস্থ বৈঠকখানায় গিরিশবাবুর প্রস্তাবমত 'নীলদর্পণের'

* রাধামাধব কর।

রিহারস্যাল দিতে লাগিলেন। রিহারস্যাল সমাপ্ত হইলে, দর্শকবৃন্দের আগ্রহাতিশয় দর্শনে সম্প্রদায়, টিকিট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে তাঁহাদের অভিনয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ অসম্মত হন। তিনি বলেন,—'আমাদের রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম এখনও এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে 'ন্যাসামাল থিয়েটার' নামকরণপূর্বক টিকিট বিক্রয় করিয়া, সাধারণে প্রকাশিত হওয়া যায়।' কিন্তু সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশই এরূপ উত্তেজিত হন যে, তাঁহাদের শিক্ষাগুরু,—যাঁহার অসাধারণ শিক্ষানৈপুণ্যে তাঁহাদের সম্প্রদায় এত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং যাঁহার বিপুল অধ্যবসায়-গুণে সুশিক্ষিত হইয়া, তাঁহারা 'নীলদর্পন' অভিনয়ে এরূপ নবোৎসাহে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই গিরিশবাবুর কথা রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। চিরস্বাধীন গিরিশবাবু, তাঁহার বহু যত্নের শিক্ষাদানের 'নীলদর্পন' অভিনয় দর্শনে, সাধারণে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে, সে কৌতূহল নিবৃত্তির আগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক তৎক্ষণাৎ সম্প্রদায়ের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।" (তদেব)।

অমৃতলাল বসুর সাক্ষ্য—"অর্দ্ধেন্দু ছিলেন আমাদের General master, কিন্তু সব বিষয়েই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নগেন বন্দ্যোপাধ্যায়।" (অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা : 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

রাধামাধব করের সাক্ষ্য—"অর্দ্ধেন্দুবাবু দলের শিক্ষকতা করিতেন।" (রাধামাধব করের স্মৃতিকথা : 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

উপরের বক্তব্যগুলি খুঁটিয়ে দেখলে এই কথাটা স্পষ্ট হয় যে "গিরিশবাবু ব্যতীত লীলাবতীর দলের সকলেই এসে যোগ দিলেন"—অর্দ্ধেন্দুর এই কথার সরাসরি প্রতিবাদ কেউ করেন নি। মতানৈক্যের কারণে গিরিশচন্দ্র ঐ দলে ছিলেন না একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। যদিও "কিন্তু নীলদর্পণ সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, এ কথায় অর্দ্ধেন্দুর বিশেষ প্রশংসা হয় না"—এই তির্যক মন্তব্য দিয়ে গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর গৌরব লাঘবের চেষ্টা করেছেন। "প্রকৃত পক্ষে থিয়েটারের ক, খ, শিক্ষা হইতেই গিরিশবাবু মাস্টার" (ধর্মদাস সুর) বা "নগেন্দ্রবাবু, রাধামাধববাবু তাঁহারাও যে গিরিশবাবুর অনুপস্থিতি-কালে ছোট ছোট ভূমিকাগুলি শিখাইতেন" (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)—প্রতিবাদীদের এসব মন্তব্যের সত্যতা স্বীকার ক'রেও এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সাধারণ নাট্যশালার উদ্বোধনী নাটক 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয়-শিক্ষকতা ও নাট্য-

পরিচালনার দায়িত্ব অর্দ্ধেন্দুশেখরের ছিল। কি ভাবে তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, নাট্যশালার ইতিহাস-আলোচকদের কাছে তা সুবিদিত। এতে অর্দ্ধেন্দুশেখরের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল কিনা বা গিরিশচন্দ্র সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আদি শিক্ষক কিনা সে সব প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে অবান্তর।

সেযুগের আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ নট যিনি সাধারণ নাট্যশালার প্রথম অভিনয়রাত্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেই অমৃতলাল বসুর দু'টি উক্তি দিয়ে আমরা এ প্রসঙ্গের উপসংহার টানবো। তাঁর উক্তিকে নিরপেক্ষ সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার সপক্ষে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে। অমৃতলালের সেই দুটি উক্তি :—

(১) "কবিবর গিরিশচন্দ্র সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের কতকটা বিরোধীই ছিলেন, সুতরাং একমাত্র এই অর্দ্ধেন্দুই ন্যাশনাল থিয়েটারের তৎকালীন সুদক্ষ অভিনেতাদিগকে শিক্ষাপরামর্শ দানে প্রস্তুত করিয়া তুলেন।" ('অমৃত-মদিরা')

(২) "আমি পেছন দিকে ফিরে যত বার-ই ভেবেছি, তত বার-ই আমার মনে হয়েছে যে, সে সময়ে ৪টি লোক না থাকলে এদেশে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হ'তে পারত না। সেই ৪টি লোক হচ্ছে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বতঃসিদ্ধ যোগাড়ে অর্থাৎ অর্গানাইজ করবার অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী এবং একজন বিশিষ্ট নট। ধর্মদাস সুর—যোগাড়ে নগেনের সহায় এবং হাতের কাজে বিশেষ পটু। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—বিধাতার হাতে গড়া এক্‌টার ও অতুলনীয় নাট্য-শিক্ষক, অর্দ্ধেন্দু ছিল সেই রকম মাস্টার, যিনি কখন কোন ছেলেকে বলেন না যে, তোর কিছু হবে না ; একটা দু'কথার পার্টের ভিতরেও মনে রাখবার মতন ছবি ফুটিয়ে দিতে সমর্থ। আর ভুবনমোহন নিয়োগী—যার সাহায্যে প্রথম একটা দল বসাবার জায়গা পাই ও পরে যাঁর টাকায় বিডন স্ট্রীটে একটি সুদৃশ্য নাট্যশালা স্থাপিত হয়।"
('ভুবনমোহন নিয়োগী' : মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪)

এখন আমরা অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিবৃতি পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করছি—

"আমি যেখান থেকে আরম্ভ করবো, সেখান থেকেই বাঙ্গালা থিয়েটারের হামাগুড়ি দেবার অবস্থা। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মুখে কয়লাহাটার "কিছু কিছু বুঝি" দলের বিবরণ শুনে আপনারা জানতে পেরেছেন থিয়েটার জিনিসটা কি করে

আমার প্রাণে ফুটে উঠল। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের দলের পূজ্যপাদ কেশববাবুকে দেখে, আমি থিয়েটার কি, ত' বুঝলেম। তারপর নবনাটকের অভিনেতা অক্ষয়বাবুকে দেখে থিয়েটার কাকে বলে তা শিখলেম। অবশ্য আমি এঁদের কারই ছাত্র বা শিষ্য নই, একটা কথাও কারও কাছে কোনদিন শিখি নি। তবু আমি এঁদেরই গুরু বলে স্বীকার করি। দ্রোণাচার্যের সঙ্গে একলব্যের যে ভাবের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ এঁদের সঙ্গেও আমার সেইরকম গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ। তবে আমার ভাগ্যে তাঁরা এ পর্যন্ত কোন অর্জুনকে শিষ্যত্বে পান নি, তাই আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কাটা যায় নি। তারপর কয়লাহাটার দল ভেঙ্গে গেলে, আমি কোন কার্যোপলক্ষে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকতেম। সে কার্য সেরে যখন বাড়ি এলেম, তখন আমাদের বাগবাজারের মুখুয্যে পাড়ায় (হরলাল মিত্রের লেনে) একটা থিয়েটারের দল বসে গেছে। এতদিন কোন না কোন ধনীর যত্নে স্বায় আশ্রয়ে, ধনীর ব্যয়ে থিয়েটারের দল গঠিত হ'ত, কিন্তু এ যা অনুষ্ঠান হয়েছিল, এর মধ্যে ধনীর সংস্রব ছিল না। যাঁরা উদ্যোগী, তাঁরা সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। আরও একটা আনন্দের বিষয় তাঁরা সকলেই আমার বাল্যবন্ধু। মুখুয্যে পাড়ার হরলাল মিত্রের লেনে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র হালদারের বাড়িতে ইহার প্রথম অনুষ্ঠান হয়। আমার বাল্যবন্ধু ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[২], শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর[৩] এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ[৪] ইহার প্রথম উদ্ভাবক। নগেন্দ্রবাবু আর রাধামাধববাবু 'কিছু কিছু বুঝি'র অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে আমাকে আর ধর্মদাসবাবুকে অধিকাংশ কর্মে নেতৃত্ব কত্তে দেখে তাঁরা বুঝলেন, ধনীর আশ্রয় ব্যতীতও এ কার্য করা যেতে পারে। এই কল্পনা থেকে পরামর্শ, পরামর্শ থেকেই ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত হল। বাল্যবন্ধু গিরিশবাবু আমাদের অপেক্ষা বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বয়োজ্যেষ্ঠ। নগেন্দ্রবাবু তাঁর কাছে এবিষয়ে প্রস্তাব করেন। সমস্ত ঠিক হলে, গিরিশবাবুকেই রিহার্স্যালের ভার দেবার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। 'কিছু কিছু বুঝি'-র দলে শিক্ষকতা ও অভিনয় ক'রে, আমি এখন কৃতকর্মার দলে একজন হয়ে পড়েছি, গিরিশবাবু আমাকে ভার দেবার কথা বলেন। আমি তখন অন্যত্র অন্য কর্মে নিযুক্ত ছিলেম। নগেন্দ্রবাবুরা কাজেই গিরিশবাবুকে ধরেই কাজ আরম্ভ করে দিলেন। ১৮৬৭ সালের মাঝামাঝি বাঙ্গালা ১২৭৪ সালে দল বসে গেল। গিরিশবাবুর প্রস্তাবে পোশাক পরিচ্ছদবিহীন তখনকার সমাজচিত্র রায় দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' অভিনয় করা স্থির হল। প্রত্যহ শিক্ষা চলতে লাগল। গিরিশবাবুর উপযুক্ত হাতে উপযুক্ত কাজের ভার পড়েছিল। কাজও বেশ চলতে লাগল। নগেন্দ্রবাবু ও গিরিশবাবু ব্যতীত পূর্ণচন্দ্র দাস, রাধানাথ পাল, ঈশানচন্দ্র নিয়োগী প্রভৃতি দলে-

ছিলেন। ক্রমে এঁদের রিহার্স্যাল শেষ হয়ে এল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জুন কি জুলাই মাসে[৫] ( ১২৭৫ সালের আষাঢ় শ্রাবণের একদিন ) এঁদের ফুল রিহার্স্যাল হবার কথা, ঘটনাক্রমে সেই দিনই প্রাতে আমি বাড়ি এলেম। নগেন্দ্রবাবু আমার আসা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ এসে আমায় দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ কল্লেন। আমি জানতেম,—নগেন্দ্রবাবুর বাসাতেই দল ছিল, হঠাৎ তা হতে থিয়েটার সৃষ্টি শুনে একটু বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেলেম। গিরিশবাবু আমায় বিশেষ আদর ক'রে নিলেন আর সেদিনকার অভিনয়ের দোষগুণ বিচারের ভারটা আমার ঘাড়েই চাপালেন। যথাসময়ে অভিনয় আরম্ভ হ'ল। এই অভিনয়ে গিরিশবাবু নিমচাঁদের, নগেন্দ্রবাবু অটলের, নন্দলাল ঘোষ কাঞ্চনের, ঈশানচন্দ্র নিয়োগী জীবনচন্দ্রের, অরুণ হালদার কেনারামের, একটি পূর্ববঙ্গবাসী বন্ধু রামমাণিক্যের অভিনয় করেন। নগেনবাবুর বৈঠকখানায় একটা বড় দরজার একপিঠে অভিনেতারা রইলেন, অপর দিকে আমি বসলাম। অভিনেতারা দরজার সামনে বসে অভিনয় করতে লাগলেন, দর্শক আমি একা। অভিনয় শেষ হল। গিরিশবাবু, নগেন্দ্রবাবু, অক্ষয়বাবু আমার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তখন যথাজ্ঞান উত্তর দিলেম,—নিমচাঁদ, অটল বেশ হয়েছে, আর কিছু ভাল হয় নি, আর জীবনচন্দ্র একেবারে খারাপ হয়েছে। আমার এই সমালোচনায় কেউ কষ্ট হলেন না ; বরং অনেকে আমার সঙ্গে একমত হয়ে, আমায় দলে যোগ দিতে বল্লেন। আমিও সম্মত হলেম। আমার তখন "সেধো, ভাত খাবি ?—হাত ধুয়ে বসে আছি" গোছ অবস্থা হয়ে আছে। তারপর গিরিশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আমি কয়েকটি অংশ বদলে দিলেম। রামমাণিক্যের অংশ রাধামাধববাবুকে দেওয়া হল[৬] আর কেনারামের অংশ আমি নিজে নিলেম। আপনাদের সুপরিচিত ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়—যাঁকে আপনারা বেলবাবু বা "কাপ্তেন বেল" ব'লে জানেন, তাঁকে কুমুদিনীর অংশ দেওয়া হল।[৭] আমাদের রিহার্স্যালের আড্ডা, অরুণ হালদারের বাড়ী হতে উঠিয়ে নগেন্দ্রবাবুর নিজ বাড়ীতে আনা হল। এই সময়ে এই দলের নাম রাখা হয়েছিল,—The Bagbazar Amateur Theatre.

"তারপর শিক্ষা দেওয়ার ভার আমার আর গিরিশবাবুর ওপর ভাগাভাগী হয়ে পড়ল। তিনিও শেখান, আমিও শেখাই। গিরিশবাবু তখন এ্যাট্‌কিন্‌সন্ টিল্টনের বাড়ীতে চাকরী করতেন আর আমি নিষ্কর্মা ছিলেম, কাজেই কার্যতঃ রিহার্স্যালের ভারটা আমারই ঘাড়ে পড়ে গেল। আমি আমার বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে সমস্ত অভিনেতাকেই অভিনয়ের ধরণ-ধারণ, ভাব-ভঙ্গী, চলা-ফেরা

ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সূক্ষ্মভাবে শেখাতে লাগলেম। এইগুলোরই বেশী অভাব ছিল। ক্রমে দল বেশ মার্জিত হয়ে উঠলো। সকলেরই ইচ্ছা, একদিন অভিনয় খোলা হোক। মুখুয্যেপাড়ায় গোপাল নিয়োগীর গলিতে ৺প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে[৮] পূজোর সময় তখন খুব আমোদ-প্রমোদ হত। কথায় কথায় পূজোর সময় ( ১৮৬৮/১২৭৫ ) সপ্তমীর রাত্রিতে[৯] সেই বাড়িতে অভিনয় করবার জন্যে আমরা নিমন্ত্রিত হলেম। আমাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। হালদারের বাড়িতে অভিনয়ের কথা স্থির হয়ে গেলে কারা বাজাবে তার ভাবনা পড়ে গেল। এই সময়ে শ্যামবাজারের ৺নবকৃষ্ণ নিয়োগীর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বাঁশী বাজিয়ে রাজেন্দ্রনাথ নিয়োগী এক কনসার্টের দল বসিয়েছিলেন। তাঁদেরই নিমন্ত্রণ করা হল। সপ্তমীর রাত্রিতে যথানিয়মে অভিনয় হয়ে গেল, কিন্তু সেদিন অভিনয়ে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে,[১০] সেইজন্যে আমরা একটু লজ্জিত হয়ে, অতি শীঘ্র আর কোথাও অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেম। বিজয়া-দশমীর রাত্রিতে গিরিশবাবুর কনিষ্ঠ শ্যালক দ্বারকানাথ দেব আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কথায় কথায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে তাঁদেরই বাড়ীতে অভিনয় করা স্থির হয়ে গেল। এইদিন সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হয়।[১১] নিমচাঁদের অভিনয় দেখে সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে বিশেষ প্রশংসা করে। গিরিশবাবু যে কালে একজন সুদক্ষ অভিনেতা হবেন, সেদিন সকলেই তার প্রমাণ পেয়েছিল। নগেন্দ্রবাবুও অটলের অভিনয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতি পেয়েছিলেন।

"এই অভিনয়ের পর নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে গিরিশবাবুর মনান্তর হয়। সেই সূত্রে গিরিশবাবু আমাদের দল ছেড়েছিলেন।[১২] তবে এর পর যতবার অভিনয় হয়েছে, ততবারই তিনি আমাদের সঙ্গে গিয়ে নিমচাঁদের অংশ অভিনয় করে এসেছিলেন। তাঁর এই সহৃদয়তায় আমরা সকলে তাঁর কাছে বাধ্য ছিলাম। গড়পারে জগন্নাথ বসুর বাড়িতে সধবার একাদশীর তৃতীয় অভিনয় হয়।[১৩] এই অভিনয়ের জন্য আমাদের স্টেজের অভাব হয়। খুঁজতে খুঁজতে সংবাদ পাওয়া গেল, শিবপুরে কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ের স্টেজ আছে। আমরা গিয়ে সেই স্টেজ নিয়ে এলেম।[১৪] আর্টস্কুলের কালী আর প্রিয় নামক দুটি ছাত্র স্থানে স্থানে মেরামত করে দিলে। তারপর সরস্বতীপূজার রাত্রিতে ( ১৮৭০/১২৭৬ )[১৫] শ্যামবাজারে তোষাখানার দেওয়ান রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়িতে আমাদের চতুর্থ অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে আমাদের দলের যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের[১৬] প্রস্তাবে স্টেজের প্রসিনিয়মের ( মুখপটের ) উপর ইংরাজীতে He holds the mirror upto Nature[১৭]... অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[১৮] কেনারামের অংশ অভিনয় করেন। এই অবিনাশবাবু

এত সুন্দর অভিনয় করেছিলেন, যে অভিনয়ের পর হতে পাড়ার সকলে তাঁকে 'ঘটিরাম' বলে ডাকত, এমন কি আমরণ তিনি পাড়ায় ঐ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামমাণিক্যের অভিনয়ে রাধামাধববাবু অসাধারণ গুণপনা প্রকাশ করেছিলেন।[১৯] তাঁহার পূর্বে আমাদের যে বিক্রমপুরের বন্ধুটি[২০] রামমাণিক্য সাজতেন, তিনি নিজে বাঙ্গাল হলেও রাধামাধববাবুর ন্যায় অভিনয়-পরিপাট্য দেখাতে পারতেন না। নগেন্দ্রবাবুর আর গিরিশবাবুর ত কথাই ছিল না। তাঁদের প্রশংসা না করেছিল এমন লোকই ছিল না। আমি সেদিন একটু উপর চাল চেলেছিলাম। ২য় দৃশ্যের পর যখন জীবনচন্দ্র অটলকে তিরস্কার কোরে "আমি তোকে ত্যজ্যপুত্র কল্লেম" বলে চলে যায়, সেইসময়ে জীবনচন্দ্ররূপে আমি অটলকে একটা মৃদু পদাঘাত করে বেরিয়ে গিয়েছিলেম। সেদিন দর্শকের মধ্যে গ্রন্থকার রা'য় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ের পর তিনি জীবনের অভিনেতাকে দেখতে চান। আমি সম্মুখে গেলে তিনি ঐটুকুর জন্য যে সকল কথা বলেন, তাতে বুঝলেম তিনি অসন্তুষ্ট না হয়ে ববং সন্তুষ্টই হয়েছেন এবং সধবার একাদশী পুনর্বাব ছাপার সময় ঐটুকুই লিখে দেবেন বলে স্থির করেন,[২১] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁব জীবদ্দশায় সধবার একাদশীর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নি, সুতরাং তাঁর বাসনাও সিদ্ধ হয় নি। এই দিনটি স্মরণীয় দিন। সধবার একাদশীর পর আমরা প্রথম প্রহসন অভিনয় করি। সে প্রহসন "বিয়ে পাগলা বুড়ো"।[২২] গিরিশবাবু একটি কবিতায় এর একটা প্রস্তাবনা রচনা করে দেন। কবিতাটি বেশ,—

মাত্‌লামীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর রঙ্‌।
বাসরঘরে টোপর পরে কিবা বিয়ের ঢঙ্‌॥
আয়না নসে, রতা কোথা যা পারিস তা বল।
ক্ষমা করিবেন দোষ, রসিক মণ্ডল॥
আসছে এবার ছোঁড়ার দল, ভুবনো নসে রতা।
সভ্যগণ নমস্কার, ফুরাল আমার কথা॥

বিয়ে পাগলা বুড়ো রাজীব মুকুয্যে আমাকেই সাজতে হয়েছিল। হাস্যরসাত্মক অংশ নিয়ে এই আমি প্রথম দর্শকের সামনে উপস্থিত হলেম। তারপর বিয়ে পাগলা বুড়োর ক'নে রতা নাপতে সেজেছিলেন বন্ধুবর রাধামাধব কর আর গোপালচন্দ্র দাস সেজেছিলেন পেঁচোর মা, ক'নের ভগ্নী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেজেছিলেন।

"তারপর বসুপাড়ায় শ্রীলোকনাথ বসুর বাড়িতে আমাদের ৫ম অভিনয় হয়। এইদিন দর্শকের মধ্যে শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

তারপর খিদিরপুর নন্দলাল ঘোষের বাড়িতে পূজার সময় ( ১৮৭০/১২৭৭ ) ৬ষ্ঠ অভিনয় হয়।[২৩] এঁদের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসুর[২৪] কুটুম্বিতা ছিল। এই অভিনয়ের উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তাঁর কাছে একটা পেশোয়াজ…আনতেম। তারপর চোরবাগানের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়ি জগদ্ধাত্রী পূজোর রাত্রিতে ৭ম অভিনয় হয় ( ১৮৭০/১২৭৭ )।[২৫]

"এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটল। বোসপাড়ার গতিনাথ দত্তের বাড়িতে একটি যাত্রার দল বসেছিল। সেখানে শর্মিষ্ঠার পালা গাওনা হত। তাঁদের দলের একজন আমায় লক্ষ্য ক'রে বল্লেন—"বাবা এতো আর রঙচঙে পোশাক পরে, রঙচঙে কাপড়ের আড়াল থেকে শুনে শুনে চীৎকার আর লাফালাফী করা নয়, এতে রীতিমত নাচগান বাজনা, সুরতাল জানা চাই।" আমি উত্তর দিয়ে এলেম "বেশ, আজ হতে ১৫ দিন পরে তোমাদের এই সুরতাল বাজনাওলা যাত্রা ক'রে আমরা শুনিয়ে দেব, কিন্তু তোমরা আজ থেকে একমাস পরে একটা থিয়েটার কর দেখি।" সেইদিনই নগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে যাত্রার পরামর্শ স্থির করলেম। মণিমোহন সরকারের "ঊষা অনিরুদ্ধ" অভিনয় করা স্থির হ'ল, একখানা বই নিয়ে গিরিশ-বাবুর কাছে গেলেম, তিনি তাতে ২৬ খানা গান রচনা ক'রে স্থানে স্থানে বসিয়ে দিলেন। ঠন্‌ঠনে নিবাসী অদ্বিতীয় বাজিয়ে শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ চক্রবর্ত্তী আমাদের দলে বাজিয়ে হলেন। বর্দ্ধমান আমোদপুর নিবাসী সুগায়ক উমাচরণ চক্রবর্ত্তী আর তাঁর ভাগ্‌নে শ্রীদুর্লভচন্দ্র গোস্বামী আমাদের দলের জুড়ী গাবেন স্থির হল। হিঙ্গুল খাঁ নাচগান শেখাতে লাগলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় ১৫ দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল। মহেন্দ্রলাল বসুর সঙ্গে এই সময় ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হল। যাত্রার দলের উপযুক্ত অনেক পোশাক তাঁর কাছে ছিল। তিনি কতকটা আমাদের পোশাক সরবরাহকার হয়ে পড়লেন। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ি ( ১৮৭০/১২৭৬ ) আমাদের যাত্রার প্রথম গাওনা হল। এই যাত্রার দলেই আপনাদের সুপরিচিত মতিলাল সুর[২৬] আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। যেদিন আমাদের গাওনা সেইদিনই বোসপাড়ার শর্মিষ্ঠার দল বোসপাড়ার মাঠে আটচালা বেঁধে যাত্রা কল্লেন।[২৭] শেষে উভয় দলে সং দিবার ছলে উভয় দলকে উপস্থিত কবির মত গান বেঁধে শ্লেষবিদ্রূপ শেষে গালাগালি দেওয়া পর্যন্ত হল।[২৮] তারপর আমাদের যাত্রার আর চার পাঁচ আসর গাওনা হয়ে যাত্রার দল বন্ধ হয়। তারপরও আরও দু'একবার সধবার একাদশীর অভিনয় হয়েছিল।

"এই সধবার একাদশীর অভিনয়ের সঙ্গে পাবলিক থিয়েটারের কোন সংশ্রব নাই,[২৯] এমন কি, পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করব, এমন কোন কল্পনাও

আমাদের কারও মনে ছিল না, তবে যাঁহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে পাবলিক থিয়েটারের সৃষ্টি হল, তাঁদের হৃদয়ে প্রথমে কিভাবে নাট্যস্পৃহা অঙ্কুরিত হয়েছিল, তাই দেখাইবার জন্যে আমি এগুলো আপনাদের শোনাচ্ছি।

"যাক তারপর আমাদের বড় অর্থকষ্ট উপস্থিত হল, এমন হয়ে এল দল বন্ধ হয়ে গেল। দল গেল বটে, কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর বাড়ি আমাদের মজলিস ভাঙল না। এ সময়ে গিরিশবাবু আমাদের মধ্যে ছিলেন না, অর্থাৎ আমরা তাঁকে আমাদের পরামর্শের মধ্যে পেতেম না। নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে যে মনান্তর হয়েছিল, তাই নিয়ে তিনি আসতেন না।...তবে দলের আর পাঁচজনের অনুরোধে ও বন্ধুত্বের সমাদর রেখে প্রয়োজনের সময় অভিনয়ও করতেন, আর যখন যা বলা যেত তাও করতেন। গিরিশবাবুর ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ এই সময়ে হয়েছিল।

"এই সময়ে আমার মনে বড় ক্ষোভ হতে লাগল। যাত্রা গেল, থিয়েটার গেল, অর্থাভাবে এমনটা হ'ল বুঝে আমার মনে মাইকেলের অনুরোধটা আবার জেগে উঠল।[৩০] কিছুদিন পরেই, আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে নগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের জুটিয়ে আবার দল গড়বার চেষ্টা করতে লাগলেম, এবার লীলাবতী অভিনয় করা হবে স্থির করলেম। অল্পে অল্পে শিক্ষা দিতে লাগলেম, অর্থাভাবে নিয়মিত রিহার্স্যাল হত না। যাও বা হচ্ছিল, শেষে তাতেও গোল বাঁধল। যোগজীবন আর অরবিন্দ সাজবার লোকের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য থাকা আবশ্যক। কিন্তু তেমন লোক কি সহজে মেলে, সে ভাঙ্গা অবস্থায় তেমন আগ্রহ ক'রে খোঁজেই বা কে? কাজেই যতটুকু রিহার্স্যাল হচ্ছিল, তা বন্ধ হয়ে আসতে লাগল; তার উপর এক ধাক্কা লাগল। ব্রজবাবু এই সময়ে নিজে একটা থিয়েটারের দল খোলেন।[৩১] আমাদের বন্ধুবান্ধবেরাই সেখানে গিয়ে জমতে লাগল। শেষে ব্রজবাবুর অনুরোধে আমাকেও যেতে হল। আমারই হাতে তিনি শিক্ষাভার দিলেন, আমি রাধামাধববাবুকে ও সুপ্রসিদ্ধ স্টেজ ম্যানেজার ধর্মদাস-বাবুকে নিয়ে গেলেম। কৃষ্ণকুমারীর রিহার্স্যাল আরম্ভ হল। ব্রজবাবুর সঙ্কল্প ছিল, কোন স্থানে একটা স্টেজ স্থায়ীভাবে বেঁধে অভিনয় চালাবেন। তিনি তখন জন্ এ্যাট্‌কিনসনের বাড়ির বুককিপার ছিলেন। সেখানকার দালালদের নিকট হতে চাঁদা তুলে ঐ উদ্দেশ্যে কিছু অর্থসংগ্রহও করেছিলেন। ঐ অর্থে শ্যামপুকুরের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির উঠোনে স্থায়ী মঞ্চের আয়োজন হতে লাগল। প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত হল, এমন সময় ব্রজবাবু পীড়িত হয়ে পড়লেন, সমস্ত কার্য বন্ধ হয়ে গেল, দলও ভেঙ্গে গেল।

"ব্রজবাবুর দল ভাঙতে শ্যামপুকুরের যুবকদের আগ্রহে একটা যাত্রার দল বসল, আমরাও অনুরোধে পড়ে এসে যোগ দিলেম, আমরা এসেই আবার নিতাই চক্রবর্ত্তী, উমাচরণ চক্রবর্ত্তী, দুর্লভ গোস্বামী, হিঙ্গুল খাঁ প্রভৃতিকে আনালেম। প্রথমে 'শকুন্তলা' দুচার আসর গাওনা হল। তারপর 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' খোলা হল। এই পালা অনেক আসর গাওনা হয়েছিল। তারপর 'সীতার বনবাস' হয়। তারপর আমাদের যাত্রার দল ভাঙ্গে, আমরা আবার নগেন্দ্রবাবুর বাড়ি এসে জমলেম, আবার থিয়েটারের লালাবতীর পরামর্শ চলতে লাগল।

"যখন আমাদের শকুন্তলার যাত্রার দল চলছিল, সেই সময় ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে ১২৭৬ সালের শেষে 'কিছু কিছু বুঝি'-র গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় চড়কডাঙ্গার ৺জয়রাম বসাকের বাড়িতে একটি থিয়েটারের দল বসান। সেখানে তাঁরই রচিত "ভ্যালারে মোর বাপ" নামক প্রহসন অভিনীত হয়। জনাইবাসী অতুলচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েরা দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। অবশেষে এই দল আহিরীটোলার জনাইয়ের মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠে যায়। সেখানে দোলের রাত্রিতে (১৮৭০।১২৭৬) অভিনয় হয়। নগেন্দ্রবাবু আর রাধামাধববাবু দেখতে গিয়েছিলেন। দেখে এসে তাঁরা ওর উত্তর দেবার জন্য নগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে একটি ছোট দল বসান। আমি তখন যাত্রার দলে, এই ক্ষুদ্র থিয়েটারের দলে আমার যোগ দেওয়া ঘটেনি। ৺প্রিয়লাল বসুমল্লিক "ভ্যালারে মোর বাপের" উত্তরে এই বইখানা লিখে দেন। ভোলানাথবাবু তা জানতে পেরে প্রিয়বাবুকে শ্লেষ ক'রে 'প্রভাকরে' কবিতা প্রকাশ করেন। প্রিয়বাবুও প্রভাকরে উত্তর দিতে আরম্ভ করেন। প্রিয়বাবুর কবিতাগুলিই বেশি সরস হত।

"এই সময় কল্‌কেতায় ডেঙ্গুজ্বর হয়। ডেঙ্গুজ্বরের সময়েই কোন্নগরে একটি থিয়েটারের দল হয়েছিল, তাঁরা 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয় করেন। জলধরের ভুঁড়ি করবার জন্য এঁরা অভিনেতার পেটের উপর একটা তানপুরার লাউ বেঁধে দিতেন।

"ডেঙ্গুজ্বরের বৎসরে আমি নিজে একটি নূতন পথ ধরলাম। দু-দুবার যাত্রার দল ক'রে আমার নিজেরই-একটু বাজনার সখ বেশী হয়। লীলাবতীর আয়োজন চটপট করতে না পারায়, আমি একটি কনসার্টের দল গড়তে লাগলেম। প্রথমে ধর্মদাসবাবুর বাড়িতে তারপর ১৭৯ নং আপার চিৎপুর রোডে ঐ দল বসে। নগেন্দ্রবাবু, রাধামাধববাবু, ধর্মদাসবাবু, হিঙ্গুল খাঁ,[৩২] নন্দবাবু,[৩৩] যোগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি যোগ দিলেন। ব্রজবাবু তখনও শয্যাগত। তিনি নিজের জন্য যে ক্লারিওনেট আর ভাস আনিয়েছিলেন, রাধামাধববাবু আমাদের জন্য সেইটি কিনে

আনলেন। নন্দবাবু রাধামাধববাবু ক্লারিওনেট, ধর্মদাসবাবু এসরাজ, নগেন্দ্রবাবু ও যোগেন্দ্রবাবু ঢোল, হিঙ্গুল খাঁ আর আমি বেহালা বাজাতেম। কনসার্টের বাজনায় এতদিন ক্লারিওনেট বা ভাস আর কেহ ব্যবহার করেননি, আমাদের দ্বারা এই তার প্রথম চলন হল। আমরা আরও একটি নূতন প্রথা চালালেম। এতদিন সমস্ত কনসার্ট ভি সুরে বাজত, আমরা একেবারে এক্‌সুরে বাজান আরম্ভ করলেম। চড়া সুরে বাজাতে আরম্ভ করায় আমাদের নিমন্ত্রণের মহা ধুম পড়ে গেল। রাসের একরাত্রিতে ( ১৮৭১/১২৭৭ ) বেনেটোলায় ৺কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়িতে আমাদের বাজনা হয়। সেইদিন হাবড়া ব্যাটরার এক থিয়েটারের দল "প্রভাবতী"[৩৪] অভিনয় করেন।..."

"এই যে দল হবার সূত্রপাত হল, এই আপনাদের সুপবিখ্যাত ন্যাসনাল থিয়েটারের অঙ্কুর। এই গোবিন্দবাবুকে[৩৫] অবলম্বন ক'রে আমরা নগেন্দ্রবাবু, ধর্মদাসবাবু, রাধামাধববাবু আর আমি এই চারজনে ন্যাসনাল থিয়েটারের গোড়াপত্তন করলেম। দুঃখের বিষয় তখন গিরিশবাবুকে আমরা আমাদের মধ্যে পেলেম না। তারপর সেদিন যেমন করে নামকরণ হয় তাও বলছি।

"যেদিন আমরা গোবিন্দনাথকে পেলেম, সেই দিনই যে আমাদের দল—ন্যাসনাল থিয়েটারের দল, বসে গেল তা নয়। তখন আমাদের ৺নগেন্দ্রবাবুদের বাড়িতেই বৈঠক হত। গোবিন্দবাবুও সেইখানে আসতেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে গোবিন্দবাবু নিজের অমায়িকতায় আমাদের মধ্যে এমন মিশে গেলেন যে, আমরা তাঁকে গোবিন্দনাথ থেকে একেবারে "গোবে বাঙ্গাল" করে নিলেম। আনন্দ প্রকৃতির গোবিন্দবাবুও "গোবে বাঙ্গাল" নামটা বড় আদর করতেন। তিনি নিজেই আপনাকে Gobey of Bengal ( গোইবা অফ বাঙাল ) বলে অভিহিত করতেন। "গোবে বাঙাল" বলে পরিচয় দিতে তাঁর এত আনন্দবোধ হত যে, তিনি এক সময়ে ৺মতিলাল সুরকে অনুরোধ করেছিলেন যে, যদি তিনি কোনদিন থিয়েটারের সংস্রবে তাঁর নামটা ছাপান, তবে যেন "গোবিন্দনাথের" পরিবর্তে "গোবে অফ বাঙাল" ছাপান। আজ সে অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য মতিবাবু বেঁচে নাই, যদি আজকের এই সভার বিবরণ কোথাও ছাপা হয়, তবে আমাদ্বারাই সে কাজটা হয়ে যাক। গোবিন্দবাবু আজও বেঁচে আছেন, দেশে আছেন।

"বাগবাজার মুখুয্যেপাড়ায় হরলাল মিত্রের লেনে গোবে বাঙ্গালের শ্বশুরবাড়ি ছিল। এবার তাঁকে অবলম্বন ক'রে তাঁরই শ্বশুরবাড়ীতে থিয়েটারের দল বসান হল।[৩৬] সধবার একাদশীর দলের এক গিরিশবাবু ব্যতীত আর সকলেই এসে

জুটলেন। যাত্রার দল হতে আমরা মতিলাল সুরকে পেয়েছিলেম, তিনিও এলেন। মহেন্দ্রলাল বসুর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে দিন দিন ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়েছিল; এই সময়ে তিনিও যোগ দিলেন। হিঙ্গুল খাঁও এলেন। নূতন অনেকগুলি লোক যোগ দিলেন; তার মধ্যে শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র, ৺কার্ত্তিকচন্দ্র পাল প্রভৃতি বিশেষ উৎসাহে কার্যে অগ্রসর হলেন। ধর্মদাসবাবুও এই সময়ে আমাদের মধ্যে সকল প্রকার কার্য যাতে যথাসময়ে সুশৃঙ্খলে নির্বাহ হয়, তার জন্য এত যত্নচেষ্টা করতে লাগলেন যে, তিনিই আমাদের মধ্যে অধ্যক্ষ হয়ে পড়লেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের প্রথমে ১২৭৭ সালের মাঝে আবার আমাদের থিয়েটারের দল বসে গেল। আমারই ঘাড়ে শিক্ষার ভার পড়ল।[৩৭] গিরিশবাবু নাই, কাজেই সবাই আমায় চেপে ধরলেন। লীলাবতীর রিহার্স্যাল আরম্ভ হল। গোবিন্দবাবু যে খরচা দিতেন তাতে আখ্‌ড়ার খরচটা মাত্র চলত।[৩৮] স্টেজ, পোশাক বা অভিনয়ের খরচটা তাঁর কাছ থেকে পাবার আশা ছিল না। রিহার্স্যাল যত সম্পূর্ণ হয়ে আসতে লাগল, ততই অভিনয়ের জন্য উদ্বেগ বাড়তে লাগল। আমি উপায়ান্তর না দেখে প্রস্তাব করলেম—এরকমে একটা লোকের অর্থ নষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত নয়, বরং কোথাও একটা স্টেজ ভাড়া ক'রে এনে, টিকিট বেচে অভিনয় করার চেষ্টা করা যাক, তাহলে কিছু অর্থসংগ্রহ হতে পারে। তারপর কোথাও একটা স্থায়ী স্টেজ বাঁধবার চেষ্টা করা যাবে। আমার পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বলে সকলে গ্রহণ করলেন। রিহার্স্যালে আরও তাড়া পড়ে গেল। তখনও গিরিশবাবু আমাদের মধ্যে নেই। (Hear Hear) ধর্মদাস বাবু, মহেন্দ্রবাবু, হিঙ্গুল খাঁ প্রভৃতি ললিতের অংশ শিক্ষা করতেন। অবশেষে টিকিট বেচেই অভিনয় করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়ে একদিন ড্রেস রিহার্স্যাল দেবার (Experimental Play) প্রস্তাব করা গেল। নগেন্দ্রবাবুর বাড়িতেই ১৮৭১ সালে ১২৭৭ সালের শেষে এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল প্লে হয়ে গেল।[৩৯] অভিনয়ে ধর্মদাস-বাবু ললিতের অংশ অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের সুখ্যাতি পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে পর্ড়ল, গিরিশবাবু তখন এসে যোগ দিলেন, আমরাও মহাআনন্দে তাঁকে ললিতের অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করলেম।[৪০] তিনিও সম্মত হলেন। শেষে তাঁকে আমাদের অভিপ্রায় জানালেম। তিনি পেশাদার হয়ে টিকিট বেচে থিয়েটার করতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। তিনি প্রস্তাব করলেন মাইকেলের কথামত সকলে ৫ হাজার টাকা চাঁদা তোলবার চেষ্টা দেখ। আমরাও তখন কাজ বড় সহজ ভেবে তাঁরই কথায় সম্মত হলেম।

"তারপর চাঁদার খাতা প্রস্তুত হল।[৪১] রাধামাধববাবুর বাড়ি ১০৭ নং

শ্যামবাজার স্ট্রীটে আমাদের থিয়েটারের কার্যালয় স্থির হল। ধর্মদাসবাবু ম্যানেজার, নগেন্দ্রবাবু সেক্রেটারী হলেন। চাঁদার আটখানি খাতায় A হইতে H পর্যন্ত নম্বর দেওয়া হইল। প্রত্যেক খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় ইংরাজীতে এক একখানি আবেদন-পত্র এঁটে দেওয়া হল, তার মধ্যে উদ্দেশী লেখা হল "Subscription to be raised for the benefit of a public stage and the dramatic writing"—খাতায় ধর্মদাসবাবু, নগেন্দ্রবাবু আর যোগেন্দ্রবাবু Projector বলে নাম সহি করেছিলেন। শেষে ঐরূপ নাম দিয়ে একটা সাধারণ বিজ্ঞাপনও ছাপান হয়। ধর্মদাসবাবুর বাড়িতে বসে ঐসকল কার্য হয়। এক একখানি খাতা এক একজনের নিকট আদায়ের জন্য দেওয়া হয়। A সংখ্যক খাতায় রাধামাধববাবু, ধর্মদাসবাবু, নগেন্দ্রবাবু আর আমি প্রত্যেকে ২০৲ টাকা করে চাঁদা সহি করি। এই খাতা নিয়ে মতিলাল সুর, গোপালচন্দ্র দাস ও আমি সহরের বড়মানুষদের নিকট চাঁদা সাধতে যাই। প্রথমেই নাট্যামোদী মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের বাড়ি যাই। তখনও তিনি মহারাজ নন। আমার আত্মীয়-স্থল বলে আমি ভিতরে যাই নি। মতিবাবু আর গোপালবাবু যান। মহারাজের ভগ্নীপতি নবীনবাবু প্রস্তাবটি শুনে বললেন, "বাপু, তোমাদের মধ্যে বোধহয় আমোদের পয়সার অভাব হয়েছে, সাধারণের জন্য থিয়েটার হল আর নাই হল বড় বয়েই গেল, আর বোধহয় তার কোনও প্রয়োজনও নেই।" মহারাজার বাড়িতে এইরূপ নিরুৎসাহ হওয়ায় আমরা আর কোন বড়মানুষের দ্বারস্থ হলেম না। পাড়া-প্রতিবাসী গৃহস্থদের নিকট ২৲, ৫৲ করে ৩০০৲ পর্যন্ত সহি হয়। এই তিনশ টাকার মধ্যেও ২৫০৲ টাকা মাত্র আদায় হয়েছিল। তাই দিয়েই কার্য আরম্ভ করা গেল। স্টেজ তৈয়ারীর জন্য কিছু কিছু জিনিসপত্র ধর্মদাস বাবুকে আনতে দেওয়া গেল, দৃশ্যপটের উপযুক্ত কাঠ, কাপড়, রং কেনা হল। গোবর্দ্ধন পোটো একখানি রাজপথের দৃশ্য এঁকে দিলে[৪২] আর পয়সা নাই, পোটোকে বিদায় দিয়ে ধর্মদাসবাবু নিজেই তুলি ধরলেন।[৪৩] এই সময়ে আবার গোবিন্দনাথবাবুও দেশে গেলেন। আথড়ার খরচ চালান দায় হল। তখন মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু, আমি—আমরাই মধ্যে মধ্যে ১০/২০ টাকা দিয়ে দলটি বজায় রাখলেম।[৪৪] এত কষ্টে পড়ে আমি আবার একদিন স্টেজ ভাড়া করে টিকিট বেচে টাকা তোলবার প্রস্তাব করলেম। শেষে তিনি[৪৫] বিরক্ত হয়ে আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন।

"ধর্মদাসবাবুর বাগবাজারের বাড়ির সম্মুখে একটা মাঠ পড়ে আছে, তখন সেখানে একটা পুষ্করিণী ছিল। এই পুকুরের পাড়ে একঘর কামারের বসতি ছিল।

সে উঠে গেলে তার ভিটে পড়েছিল। আমরা সেইখানে নাট্যমঞ্চ বেঁধে টিকিট বেচে অভিনয় করব বলে স্থির করলেম। স্থানটা বাগবাজার স্ট্রীটের উপর। এই পরামর্শই স্থির হল। তখন প্লাটফর্মের কাঠের ভাবনা জুটলো, ইতিপূর্বে শ্যামপুকুরের গোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ব্রজবাবুর প্রস্তুত প্লাটফর্মের কথা বলেছি, সে কাঠ-কাটরা তখন মজুত ছিল। ব্রজবাবু তখনও পীড়িত। আমি একদিন গিয়ে সেগুলি প্রার্থনা করলেম।[৪৬] ব্রজবাবু সমস্ত শুনে আনন্দমনে সমস্ত দান করলেন। তখন অর্থের অবস্থা এমনি স্বাচ্ছল্য যে, শ্যামপুকুর হতে কাঠগুলা বাগবাজারে মুটে ভাড়া দিয়ে আনবার সঙ্গতি নেই। শেষে গভীর রাত্রে আপনারাই হাতাহাতি করে সেই সকল কাঠ এনে ফেলে গেল।[৪৭] (Hear Hear) ঠিক এই সময়ে একটা ইংরাজ নাবিক ভিক্ষা করতে আসে, তার নাম ম্যাকলীন। তার থাকবার স্থান, খাবার উপায় ছিল না। ধর্মদাসবাবু তাকে আহার দিতে স্বীকার করেন।[৪৮] তারপর যৎসামান্য খরচ করে আমরা জমিটাকে ঘিরে নিয়েছিলাম বটে, কিন্তু লোকাভাবে টুক্‌রো কাঠ চুরি যেতে লাগল দেখে, ঐ সাহেবকে তার রক্ষক রাখা গেল। সে ধর্মদাসবাবুর বাড়ি খেত আর সেই মাঠে পড়ে থাকত। তাকে দিয়ে আমরা কুলীমজুরের কাজও করিয়ে নিতেম। লোকটা জাহাজে থাকার জন্য অনেকগুলো রঙ প্রস্তুত করতে জানত। আমরা তাকে দিয়ে অল্প খরচে অনেক-গুলো রঙ প্রস্তুত করিয়ে নিয়েছিলাম। ধর্মদাসবাবু আঁকতেন, ক্ষেত্রমোহন জোগাড় দিতেন, আর সাহেব রঙ বেটে রঙ চালিয়ে দিত।[৪৯] কিছুদিন থাকতে থাকতে সাহেব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর কোচ্‌ম্যান হয়ে গেল। লোকটার বস্ত্রাদি নেই দেখে কৃষ্ণকিশোরবাবু একসুট ইংরাজী পোশাক কিনে দিলেন, পোশাক পেয়ে একদিন চলে গেল আর এল না।

"আমাদের দৃশ্যপট আঁকা আর প্লাটফরম্ তৈয়ারী যখন অর্দ্ধেক প্রস্তুত হয়ে এসেছে, তখন শুনলেম আমাদের একজন বাল্যবন্ধু আগুন দিয়ে পুড়িয়ে উহা নষ্ট করবার চেষ্টায় আছেন। তিনি আমাদের মধ্যেই ছিলেন, তবে মনের মিল হতনা বলে মাঝে মাঝে আসতেন আবার ছেড়ে দিতেন। আমরা তাঁর এই অভিসন্ধি জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ ধর্মদাসবাবুর পরামর্শমত একদিনে সমস্ত খুলে শ্যামবাজারে ৺বৃন্দাবন পালের বাড়িতে নিয়ে গেলেম।[৫০] বৃন্দাবনবাবুর পোষ্যপুত্র রাজেন্দ্রনাথ পাল আমাদের একজন বাল্যবন্ধু। তাঁর আশ্রয় ও তাঁর সাহায্যে তাঁরই বাড়ির উঠানে নাট্যমঞ্চ বাঁধা হতে লাগল। কার্তিকচন্দ্র পাল, ধর্মদাসবাবু এই সময় একপ্রকার ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করে কাজ করতে লাগলেন। নগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে আবার রিহার্শাল চলতে লাগল। গিরিশবাবু টিকিট নাই শুনে আবার যোগ

দিলেন।[৫১] এইরূপে অনেকদিন রিহার্স্যালের পর (১৮৭১) ১২৭৮ সালের বর্ষাকালে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে আমাদের নিজের স্টেজে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হল।[৫২] এই অভিনয়ে মতিবাবু[৫৩], মহেন্দ্রবাবু[৫৪] আর হিঙ্গুল খাঁ[৫৫] প্রথম অভিনয় করেন। রাজেন্দ্র নিয়োগীর কনসার্ট বাজে। এই সময় কোন কোন দিন রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর[৫৬] আমাদের সঙ্গে ঢোল বাজাতেন। এই সময়ে হিন্দুমেলার নবগোপাল মিত্র[৫৭] আমাদের দলে যোগ দিয়েছিলেন[৫৮], তিনি অভিনয় করতেন না বটে, কিন্তু দেখাশুনায় অনেক সাহায্য করতেন। একদিন নগেন্দ্রবাবুর বাড়ি নগেন্দ্র, রাধামাধব, মতিলাল সুর, ধর্মদাস, যোগেন্দ্র মিত্র আর আমি বসে আছি। কথা উঠল থিয়েটারের নাম কি দেওয়া হবে? নানা জনে নানা নাম প্রস্তাব করলে। নবগোপালবাবুর ন্যাশনাল নামটার উপর ভারী ঝোঁক ছিল, তিনি যা কিছু করতেন তার নামে ন্যাশনাল শব্দ যোগ করে দিতেন। এইজন্য আমরা তাঁর নামই ন্যাশনাল নবগোপাল করে নিয়েছিলাম। নবগোপাল বাবু আমাদের থিয়েটারের নাম The Calcutta National Theatre রাখবার প্রস্তাব করেন, শেষে মতিবাবুর প্রস্তাবমত Calcutta টুকু বাদ দিয়ে কেবল The National Theatre রাখা হয়। প্রথম দিন ঐ নামেই হয়।[৫৯] রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে পরপর তিনটি শনিবারে তিনটি অভিনয় হয়। ঐ অভিনয়ে গিরিশবাবু ললিতের, নগেনবাবু হেমচন্দ্রের, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র নদেরচাঁদের, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীনাথের, মহেন্দ্রবাবু ভোলানাথের, মতিবাবু মেজখুড়োর, হিঙ্গুল খাঁ রঘুয়া উড়ের, সুরেশচন্দ্র মিত্র লীলাবতীর, বেলবাবু সারদাসুন্দরীর, আর রাধামাধব বাবু ক্ষীরোদবাসিনীর, ক্ষেত্রবাবু রাজলক্ষ্মীর অংশ আর আমি হরবিলাসের অংশ আর একটা ঝিয়ের অংশ অভিনয় করি। এই ঝিয়ের ভাষা গ্রন্থকার যা রেখেছেন অভিনয় সময় তা বদলে আমি মেদিনীপুর অঞ্চলের ভাষায় অভিনয় করি।[৬০] হিঙ্গুল খাঁ ২/১ বার রঘুয়া সাজেন, শেষে শশিলাল দাস ঐ অংশ অভিনয় করে এতটা গুণপনা দেখিয়েছিলেন যে শেষে তাঁর ভাষা "বিশাড়ী" হয়ে গিয়েছিল[৬১], তারপর ঐ স্থানেই বন্দুকওয়ালা মথুরামোহন বিশ্বাসের বাড়িতে একরাত্রি লীলাবতীর অভিনয়ের হয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের অবৈতনিকভাবে এই শেষ অভিনয়।

"মহেন্দ্রবাবু ও অন্যান্যের সাহায্যে যে অর্থ সংগৃহীত হয়েচিল তা এই চারটি অভিনয়ে মঞ্চ প্রস্তুত করতেই শেষ হয়ে গেল। শেষে আর এমন খরচাও হাতে রইল না যে আর একদিন অভিনয় হয়। তখন আমি আবার টিকিট বেচে অভিনয় করবার প্রস্তাব তুললেম।[৬২] এবার স্টেজ ছিল, ভাববার বিষয় ছিল না। সকলেই সম্মত হলেন, গিরিশবাবু কিন্তু শুনেই বেঁকে বসলেন, তিনি বললেন,

পেশাদার যদি হতে হয়, তবে এ রকমে হওয়া হবে না। একেবারে যদি ছাতুবাবুর মাঠে প্যাভিলিয়ন করতে পার, আমি রাজী আছি। আমরা তাঁর সেই অসম্ভব প্রস্তাব শুনে চমকে গেলেম, তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেম, পীড়াপীড়ি করতেই তিনি দল ছেড়ে দিলেন।

"আমাদের তখন বড়ই অর্থকষ্ট। এমন সামর্থ্য নাই যে, তখন টিকিট বেচে অভিনয় করবার জন্য যতটা টাকার প্রয়োজন, তা আমরা আমাদের নিজেদের মধ্য হতে তুলতে পারি। রাজেন্দ্রবাবুর উঠানে স্টেজ ছিল, কিন্তু বর্ষায় তা খারাপ হয়ে যেতে লাগল। সে উঠান এত বড় নয় যে তাতে টিকিট বেচে দর্শকের স্থান কুলান হতে পারে। কাজেই টিকিট বেচে থিয়েটার করতে হলে অন্যত্র স্টেজ নিয়ে যেতে হয়। সে খরচ কুলাবার অবস্থা নাই, কাজেই গোলমালে দিন কাটতে লাগল, রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীর উঠানে প্লাটফর্ম পচতে লাগল, ক্রমে দলও ভেঙ্গে গেল।[৬৩] নগেন্দ্র, ধর্মদাস, মতি আর আমি আমরা চারজনে প্রায় কাছাকাছি বাড়িতে থাকতেম. কাজেই আমাদের দেখাশুনা, শৃগালের ন্যায় বৃথা যুক্তি বন্ধ হত না। শেষে আমরা পরামর্শ করে আমরা এক নূতন প্রথায় কার্য করতে অগ্রসর হলেম। আপনাদের বোধহয় স্মরণ আছে আমরা যখন পাড়া প্রতিবাসীর নিকট চাঁদা আদায় করতে যাই সেই সময়ে আমাদের সঙ্গে এ পাড়া ও পাড়ায় কতকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। লীলাবতীর অভিনয়ে তাঁরা আমাদের দেখাশুনা, তদ্বির করা প্রভৃতি কার্যে বিস্তর সাহায্য করতেন। আমরা এবার তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে আমাদের পরামর্শদাতা ও পরিচালকের মতো স্থির করলেম। তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ পাল (বৃন্দাবন পালের পোষ্যপুত্র), আর একজন রাজেন্দ্রনাথ পাল ওরফে বুধো পাল, শ্রীঅমৃতলাল পাল, শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ইন্‌স্পেক্টর, শ্রীব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনন্দগোপাল নিয়োগী (এক্ষণে এটর্নি), ফটিক ওরফে হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, আমাদের নগেন্দ্রবাবুর বড় ভাই দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রের পিসতুতো ভাই শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাদের যেন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

"চাঁদা আদায়ের সময় আমরা রসিকচন্দ্র নিয়োগীর মধ্যমপুত্র ভুবনমোহন নিয়োগীর নিকট কিছু সাহায্য পেয়েছিলাম। এই বালক এই দুর্দশার সময়ে আমাদের সহিত কিছু বেশি মিশতে আরম্ভ করলে। ক্রমে আমাদের দুর্দশার কথা জানতে পেরে আপনা- হতে আমাদের সাহায্য করতে প্রবৃত্ত হল। ভুবনবাবুর নিকট ভরসা পেয়ে আমরা আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেম। ধর্মদাস, নগেন্দ্র, মতি, রাধামাধব আর আমি, আমরা আবার দল বসাবার আয়োজন করতে লাগলেম।[৬৪]

"ভুবনবাবুকে স্থানের কথা বলায় তিনি তাঁহার পিতামহ প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণার ঘাটের চাঁদনীর উপর বারদ্বারী বৈঠকখানা ছেড়ে দিলেন।[৬৫] ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ১২৭৮ সালের শীতকালে আমরা এইখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেম।[৬৬] গিরিশবাবু ব্যতীত লীলাবতীর দলের সকলেই এসে যোগ দিলেন। এবার পৃষ্ঠপোষকগণের যত্নে আমাদের কার্যপ্রণালীর একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা গেল। দলের নগেন্দ্রবাবু সেক্রেটারী, ধর্মদাসবাবু সকল বিষয়ের ম্যানেজার, কার্তিকচন্দ্র পাল ড্রেসার হলেন, ডিরেক্‌টরী আর মাষ্টারী আমার ঘাড়ে পড়ল।[৬৭] আদি ব্রাহ্মসমাজের সুবিখ্যাত গায়ক বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় এই সময় আমাদের গীত-শিক্ষক ছিলেন। গান গাইবার আবশ্যক হলে তিনিই স্টেজের ভিতর গান করতেন। আর সকলে অভিনেতা হলেন। এই সময়ে আমরা আমাদের সধবার একাদশীর দলের যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেশচন্দ্র মিত্র, নন্দলাল ঘোষ, রাধামাধব, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনকে হারালেম। অনেকে আর থিয়েটার করবেন না বলে, আর অনেকে অন্যান্য অসুবিধায় ছেড়ে দিলেন। অবশেষে সুবন্দোবস্তের সঙ্গে কার্য আরম্ভ হল। আমার প্রস্তাবমত 'নীলদর্পণ' রিহার্স্যাল দেওয়া হতে লাগল।[৬৮]

"কিছুদিন রিহার্স্যাল দেবার পর একদিন শ্যামবাজারের বেণীমাধব মিত্র ও পূর্ণচন্দ্র মিত্র তাঁদের কোন আত্মীয়কে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে এনে অন্নপূর্ণার ঘাটে এনে রাখেন। মুমূর্ষুর তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁরাও ঐখানে থাকতেন। এই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। আমরা দোতালায় রিহার্স্যাল দিতেম আর তাঁরা মুমূর্ষুকে নিয়ে নীচে থাকতেন। বেণীবাবু, পূর্ণবাবু, যিনি যখন থাকতেন, তিনি তখনই আমাদের রিহার্স্যাল শুনতে যেতেন; এবং আমাদের সৎপরামর্শ দিতেন। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ যত্ন আর সহানুভূতি দেখে আমরা বেণীবাবুকে আমাদের প্রেসিডেন্ট হতে অনুরোধ করলেম।[৬৯] বেণীবাবুও স্বীকার ক'রে আরও যত্ন প্রকাশ করতে লাগলেন। সেইসময়ে একদিন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার[৭০] আমাদের রিহার্স্যাল দেখতে আসেন।[৭১] একা রাধমাধববাবু উপস্থিত ছিলেন[৭২], তাঁরা একা তাঁরই কতকটা আবৃত্তি শুনে চলে যান, পরে তাঁরা[৭৩] মাঝে মাঝে আসতেন। এই সময় কিছুদিন থাকার পর রাধামাধব বাবুও আমাদের ত্যাগ করেন।

"যখন আমাদের রিহার্স্যাল নির্বিবাদে চলছে, বেণীবাবু প্রত্যহ পরিদর্শন করে কাজ যাতে সুশৃঙ্খলে চলে যায় তার জন্য বিশেষ পরিশ্রম কচ্ছেন, সেই সময় গিরিশবাবু এক সখের যাত্রার দল করেন। এই দলে তিনি সঙএর পালা বেঁধে

দেন। ঐ সঙ-এর মধ্যে একজন প্রয়াগের লুপ্তবেণী ত্রিধারা ভাগীরথীর বর্ণনাত্মক একটি গান গাইত। ঐ গানটিতে আমাদের থিয়েটারের দলের প্রেসিডেন্ট হতে আরম্ভ করে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম এমন সুন্দর সুকৌশলে গাঁথা ছিল, যে তাতে রচয়িতা গিরিশবাবুর বিশেষ কবিত্বশক্তি ও শব্দ গাঁথবার আশ্চর্য ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল। আমাদের বন্ধু রাধামাধববাবুই এই গানটি গাইতেন।[৭৪]

লুপ্তবেণী বই তিরিধার।[৭৫]
তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ-ইন্দু কিরণ সিঁদুর মাখা মতির হার॥
নগ হতে ধারা ধায় সরস্বতী ক্ষীণকায়
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়,—
শিবশম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি যদুপতি অবতার॥
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান, কিবা ধর্মক্ষেত্র স্থান,[৭৬]
অবিনাশী মুনি ঋষি করছে বসে ধ্যান ;
সবাই মিলে ডেকে বলে 'দীনবন্ধু' কর পার॥
কিবা বালুময় বেলা, পালে পালে রেতের বেলা,
ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা ;
মিলে যত চাষা, কোরে আশা, নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার॥
কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে,
জ্ঞান হয় দীনের গৌরব যায় বুঝি বা খসে ;[৭৭]
স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার॥

"যাক, এইরূপ আমোদ আহ্লাদ উৎসাহের মধ্যে আমরা দৃঢ় অধ্যবসায়ে ও মহাযত্নে রিহার্স্যাল দিয়ে নীলদর্পণ খোলবার মত ক'রে প্রস্তুত হলেম। রিহার্স্যালে আমাদের প্রায় একটি বৎসর কেটে গেল।[৭৮] ১৮৭২ সালের নবেম্বর মাসে (১২৭৯ সালের কার্ত্তিক মাসে)[৭৯] নগেন্দ্রবাবুর বাড়ি আমাদের ড্রেস রিহার্স্যাল হল। অভিনয় হবার কিছুদিন পূর্বে আপনাদের সুপরিচিত স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীঅমৃতলাল বসু আমাদের দলে যোগ দেন। তিনি পাটনায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী পড়তেন। এই সময়ে তিনি কলকাতায় আসেন। আমারই আগ্রহে তিনি আমাদের দলে যোগ দেন।[৮০] যদুনাথ ভট্টাচার্য আমাদের দলে সৈরিন্ধ্রীর অংশ নিয়েছিলেন, তিনি দীর্ঘকায় পুরুষ বলে তাঁকে বধূ সাজলে মানাত না। আমি অমৃতবাবুকে এই পার্ট দিলেম। অমৃতবাবুও অতি অল্পদিনে বেশ অভ্যাস করে নিলেন।[৮১] তিনি আমাদের সৈরিন্ধ্রীর অংশ অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে যাঁরা অভিনেতা ছিলেন, তাঁরাই শেষে পাবলিক থিয়েটারের

প্রথমাভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন সুতরাং তাঁদের নামগুলি পাবলিক থিয়েটারের ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকা উচিত,[৮২]—

| | | |
|---|---|---|
| গোলোক বসু | ... | শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। |
| নবীনমাধব | ... | ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| বিন্দুমাধব | ... | শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| তোরাপ | ... | ৺মতিলাল সুর।[৮৩] |
| রাইচরণ | ... | ঐ ঐ। |
| সাধুচরণ | ... | শ্রীমহেন্দ্রলাল বসু। |
| উড্ সাহেব | ... | শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। |
| রোগ্ সাহেব | ... | ৺অবিনাশচন্দ্র কর।[৮৪] |
| গোপীনাথ | ... | শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। |
| ম্যাজিস্ট্রেট | ... | শ্রীমহেন্দ্রলাল বসু। |
| গোপ | ... | ৺মতিলাল সুর। |
| কবিরাজ | ... | ৺শশিদাস দাস।[৮৫] |
| লাঠিয়াল | ... | শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র।[৮৬] |
| রাখাল | ... | শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য।[৮৭] |
| নীলকরের মোক্তার | ... | ৺মতিলাল সুর। |
| নবীনমাধবের মোক্তার | ... | ৺গোপালচন্দ্র দাস।[৮৮] |
| সাবিত্রী | ... | শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। |
| সৈরিন্ধ্রী | ... | শ্রীঅমৃতলাল বসু। |
| সরলতা | ... | শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।[৮৯] |
| রেবতী | ... | ৺তিনকড়ি মান্না।[৯০] |
| ক্ষেত্রমণি | ... | ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। |
| পদীময়রানী | ... | শ্রীমহেন্দ্রলাল বসু। |
| খুড়ী | ... | ৺অবিনাশচন্দ্র কর। |
| আদুরী | ... | ৺গোপালচন্দ্র দাস। |
| খালাসী | ... | ৺গোলোকনাথ দে।[৯১] |

"* * * * আমরা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ১২৭৯ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ শনিবারে নীলদর্পণ প্রথম খোলা হবে স্থির করলেম।[৯২] বৃন্দাবন পালের পুত্র রাজেন্দ্রবাবু গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিংএ কাজ করতেন। প্রথম রাত্রের প্লাকার্ড পুলিশ নোটিফিকেশনের মত ক'রে কেবল ইংরাজীতে স্ট্যানহোপ্ প্রেস হতে ছাপিয়ে

আনেন।[৯৩] তারপর ২য় রাত্রিতে ইংলিশ্‌ম্যান আপিসের ছাপাখানা বা ইয়াসম্যাস জোন্সের ছাপাখানা হতে ইংরাজীতে দস্তুরমত প্লাকার্ড ছাপান আরম্ভ হয়।

নগেন্দ্র স্টেজের হ্যাণ্ডবিল, প্লাকার্ড ইত্যাদি ছাপালে, বেহারা নিয়ে নিজেরাই এক একজন সহরের এক একদিকে প্লাকার্ড লাগিয়ে এলেম।[৯৪] স্বহস্তে হ্যাণ্ডবিল বিলালেম। সে উৎসাহ যে কি তা ভাষায় প্রকাশ করে বলা যায় না। দর্শকের বসবার জন্য চেয়ার ভাড়া করে আনা হল। গৌরমোহন ধর কোম্পানী প্রথমে বিনা পয়সায় গ্যাসের আলোর বন্দোবস্ত করে দিলেন,[৯৫] স্টেজের সিন আঁকা তখনও চল্‌চে। অভিনয়ের দিন বেলা ৪টার সময়েও ধর্মদাসবাবু নিজে তুলি, ধরে উইংস্‌ আঁকছেন,[৯৬] এমন সময়ে মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের ভগিনীপতি ৺নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একখান শাল মুড়ি দিয়ে এসে ২৲ টাকা দিয়ে একখানি সিট রিজার্ভ করে গেলেন। তখন আমরা তিন রকম সিটের বন্দোবস্ত করেছিলেম;[৯৭] ২৲ ১৲ ॥০ আনা। উঠানের মাঝখানে ২০ খানা চেয়ার একটা বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেম সেইগুলি ২৲ টাকার, তার নাম রিজার্ভ সিট। তার সামনে স্টেজের নিকটে কতকগুলি চেয়ার, দাম ১৲ নাম ফার্ষ্ট ক্লাস; আর রিজার্ভ সিটের পিছনে বেঞ্চির দাম ॥০ নাম সেকেণ্ড ক্লাস। আর দালানের দাম।০ আনা। তার আগে থেকেই টিকিট বেচা সুরু হয়েছিল।[৯৮] ৭টার মধ্যে আমাদের সমস্ত সিট বিক্রয় হয়ে গেল। অধিকাংশ বড়মানুষ এবং কৃতবিদ্য লোক রিজার্ভ করে গেলেন। যথাসময়ে অভিনয় আরম্ভ হবে। দর্শকেরা সব সজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে এসে বসেছেন। তখনকার সময়ে ভদ্রলোকে বাড়ি হতে বার হতে গেলেই স্বপদোচিত পোশাক পরে বার হতেন; এখনকারমত যথেচ্ছা পোশাক পরে কোন মজলিসে যাওয়া তখন ঘৃণাকর ছিল। শালের পাগড়ী, শালের চোগা, জামিয়ার, শাল-দোশালায় উজ্জ্বল হয়ে দর্শকবৃন্দ সভা উজ্জ্বল করে বসেছেন।[৯৯] কনসার্ট বেজে উঠল। কনসার্টে সেদিন কালিদাস সান্যাল হারমোনিয়ম, নিতাই ওস্তাদজী বেহালা, গৌরদাস বাবাজী বেহালা, বোসপাড়া নিবাসী সুবিখ্যাত বেহালাবাদক রাজাবাবু বেহালা, আর শ্যামপুকুর নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে কাণা যোগে ঢোল বাজিয়েছিলেন। যোগেন্দ্র আমাদের দলস্থ অভিনেতাও বটে। তাঁহাদের বাজনার ধুম দেখে কে? বাজাতে বাজাতে এক এক বার এক একটা যন্ত্রে উপেন বাজাতে লাগলেন, আর অন্য সকলে তাঁকে অনুসরণ করে সুর দিতে লাগলেন। শ্রোতারা মোহিত হয়ে গেলেন, কিন্তু অভিনয়ে বড় বিলম্ব হতে লাগল; আমরা মধ্যে মধ্যে বলতে লাগ্‌লেম আমরা প্রস্তুত, আপনারা বন্ধ করুন। তখন তাঁরা মত্ত, কে সে কথা শোনে? সহরের অধিকাংশ গুণগ্রাহী বড়মানুষ এবং সঙ্গীতজ্ঞ লোক

একস্থানে জড় হয়েছেন, বাহবা দিচ্ছেন, তাঁরা কি সে অবসরে সে মত্ততা সহজে কাটাতে পারেন ? যাই হোক শেষে অভিনয় আরম্ভ হল।[১০০] সুশৃঙ্খলে শেষও হল।[১০১] দর্শক কেঁদে কেটে সারা হয়ে গেল। সহস্র মুখে প্রশংসা বৃষ্টি হতে লাগল। আমরা আনন্দে প্রত্যেকে যেন ডবল ফুলে উঠলেম। সে রাত্রিতে ৭০০ টাকা বিক্রয় হয়।"[১০২] ( 'পঞ্চপুষ্প', চৈত্র ১৩৩৬ ; জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৩৭ )

অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিবৃতি প্রসঙ্গে ( পৃ. ৩৪ থেকে পৃ. ৫২ পর্যন্ত ) অতিরিক্ত টীকা ও তথ্য ঃ

১. "ঠাকুরদের বাড়িতে নবনাটকে গবেশবাবু সাজেন অক্ষয় মজুমদার। তাঁহার বৃদ্ধ জমিদারের ভঙ্গীশুদ্ধ অভিনয় দেখিয়া অর্দ্ধেন্দুর মাথা খুলিয়া যায়। তাহার idea মাত্র clear হইল, সে তাঁহার নিকট কিছু শেখে নাই। শেষে সে ঐ বৃদ্ধের অভিনয়ে প্রথমেই যাহা দেখাইল, তাহা গবেশের উপর ঢের—অনেক বেশী improvement." ( অমৃতলাল বসু/'নাচঘর', ২৩ শ্রাবণ, ১৩৩১ )

২. নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৫০-১৮৮২ ) ঃ বাংলা সাধারণ নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট নট। ৺অনুরূপা দেবী ও ৺সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মাতামহ। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র। ইনি মধ্যম পুত্র। অগ্রজ দেবেন্দ্রনাথ সান্যাল বাড়িতে ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা হেমচন্দ্র। চতুর্থ ভ্রাতা কিরণচন্দ্র 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর প্রথম 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে 'বিন্দুমাধব' সেজেছিলেন। এঁরা প্রথমে ১৯নং রাজা গুরুদাস স্ট্রীটে বাস করতেন। পরে ঐ গলি বেশ্যাপল্লীতে রূপান্তরিত হতে থাকলে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে ( ৫৭ নং ) বাড়ি ক্রয় ক'রে বাগবাজারের বাসিন্দা হন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে সিমুলিয়া শুঁড়িপাড়ায় জনার্দন সাহার বাড়ির বাঁধা স্টেজে মাইকেলের 'পদ্মাবতী' নাটকে অভিনেতারূপে এঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। পূর্ণযৌবনে ছাদ থেকে প'ড়ে গিয়ে শোচনীয়ভাবে তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

৩. রাধামাধব কর ( ১৮৫৩-? ) ঃ সেকালের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক দুর্গাদাস করের মধ্যম পুত্র। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর ( ১৮৫২ ) বা আর. জি. কর, যাঁর কীর্তি ঘোষণা করছে কলকাতার আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। এঁরা থাকতেন ১০৭নং শ্যামবাজার স্ট্রীটে।

৪. গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ( ১৮৪৪-১৯১২ ) ঃ বাগবাজারের ( ১৩নং বোসপাড়া লেন ) বাসিন্দা ছিলেন।

৫. অর্দ্ধেন্দুশেখরের এখানে স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে। তিনি 'কিছু কিছু অভিনয়'-এর (অভিনয়-তারিখ ২রা নভেম্বর, ১৮৬৭) পরে বাগবাজারের দলে যোগদান করেন। অতএব সময়টা ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের জুন-জুলাই হবে।

৬. 'সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয় রজনীতে 'রামমাণিক্য' সেজেছিলেন নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় আর 'কাঞ্চন' সেজেছিলেন রাধামাধব কর। (দ্রঃ রাধামাধব করের স্মৃতিকথা: 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

৭. 'সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয় রজনীতে 'কুমুদিনী' সেজেছিলেন আপালচন্দ্র বিশ্বাস। (দ্রঃ তদেব)

৮. বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুয্যের পাড়ায়।

৯. ধর্মদাস সুর তাঁর আত্মজীবনীতে ১৮৬৯ সন লিখে গেছেন। (দ্রঃ 'নাট্যমন্দির', ১৩১৭, পৃ. ৯৭)

১০. "অভিনয় ভাল হইল না।" (রাধামাধব করের স্মৃতিকথা: 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

১১. রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "কোজাগর পূর্ণিমার নিশীথে শ্যামপুকুরে নবীনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের (গিরিশচন্দ্রের শ্বশুর মহাশয়—শ. ভ.) বাড়িতে পুনরায় অভিনয় করা হইল। এবার আমাদের অভিনয় দেখিয়া সকলে খুসী হইল। (তদেব)

১২. "এই অভিনয়ের পর রঙ্গমঞ্চ মেরামতি হিসাবে ৪০ টাকার গোলমাল হয়। সেই গোলমাল লইয়া গিরিশবাবু রঙ্গমঞ্চ আটকাইয়া রাখেন। এই সূত্রে গিরিশবাবুর সহিত সমগ্র দলের বিবাদ হয় এবং গিরিশবাবু দল ছাড়িয়া দেন।" ('বিশ্বকোষ', ১৬শ খণ্ড)

"কিছুদিন পরে (দ্বিতীয় অভিনয়ের পরে—শ. ভ.) গিরিশবাবু আমাদের থিয়েটারের স্টেজ তাঁহার শ্বশুরবাড়িতে পাঠাইয়া দিয়া আমাদের দল হইতে সরিয়া গেলেন। আমরা তখন গদা-গোপালকে ধরিয়া তাঁহার স্থানে বসাইয়া rehearsal দিতে লাগিলাম।" (রাধামাধব করের স্মৃতিকথা: 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

১৩. "এটর্ণি দীননাথ বসুর বাড়িতে আমাদের তৃতীয় অভিনয় হইল। সে রাত্রিতে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ আমাদের অভিনয় দেখিয়া বলিলেন—"তোমরা বেশ প্লে করেছ, কিন্তু তোমাদের স্টেজ ভাল নয়।" (রাধামাধব করের স্মৃতিকথা: 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

"গড়পারে জগন্নাথ দত্তের বাড়ি ইহাদের তৃতীয় অভিনয় হয়।" ( 'বিশ্বকোষ', ১৬শ খণ্ড )

১৪. "এই অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চের অভাব হয়। শিবপুরে তখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইত। সেই দলের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করিয়া অভিনয় করা স্থির হয়। গিরিশবাবু এই সংবাদ পাইয়া নিজে আসিয়া নিমচাঁদ অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন।" ( 'বিশ্বকোষ', ১৬শ খণ্ড )

১৫. রাধামাধব কর ও অমৃতলাল বসু তাঁদের স্মৃতিকথায় বলেছেন 'সধবার একাদশী'র চতুর্থ অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের শ্রীপঞ্চমীর রাত্রে। ( দ্রঃ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

"১২৭৫ সালের মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার দিন ( ১৮৬৯ ফেব্রুয়ারি ) এই সম্প্রদায়ের ৪র্থ অভিনয় তোষাখানার দেওয়ান ৺রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়িতে হয়।" ( 'বিশ্বকোষ', ১৬শ খণ্ড )

কিন্তু সারদাচরণ মিত্র লিখেছেন: "১৮৭০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতী-পূজার রাত্রে কলিকাতার শ্যামবাজারে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে আমি 'সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয় দেখি।" ( ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ—পৃ. ৭৪ থেকে পুনরুদ্ধৃত )

১৬. যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বাগবাজারের দলের 'লীলাবতী'রও মঞ্চ-পরিকল্পক ছিলেন। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে প্রথম ট্রেন যাওয়ার দৃশ্য দেখানো হয় অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ' নাটকে ( ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত )। দৃশ্যটির পরিকল্পনা করেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ। তিনি স্বয়ং ড্রাইভার সেজে মঞ্চে ট্রেন চালাতেন। যোগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু লিখেছেন: "যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, সেই সেকালের প্রথম 'লীলাবতী' অভিনয়ে ইনি নদেরচাঁদ, এমন নদেরচাঁদ আজ পর্যন্ত হয় নি, তবে অভিনেতারূপে তাঁর বিশেষ নাম নাই। মঞ্চসম্বন্ধীয় নেপথ্যাচার কার্যে তিনি ধর্মদাস সুরের সুদক্ষ সহায় ছিলেন, আর স্টার থিয়েটারের কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ বর্তমান বাটীই তাঁহার স্থপতি বিদ্যার সাক্ষ্য দিতেছে; মন্দিরোপম সুচিত্র কারুকার্য-ভূষিত উক্ত নাট্যশালার গোপুরটি যোগীবাবুর কল্পিত আদর্শে গঠিত।" ( 'ভুবনমোহন নিয়োগী': 'মাসিক বসুমতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ )

১৭. এ প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও লিখেছেন: "একদিনের অভিনয় রজনীতে গ্রন্থকার উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেইদিন তাঁহার প্রতিভার সম্মানের জন্য রঙ্গমঞ্চে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল—He holds

the mirror upto Nature," ( 'অর্দ্ধেন্দু কথা' : 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক ১৩২৭)

১৮. রাধামাধব করের মতে অবিনাশ মুখোপাধ্যায়। ( দ্রঃ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ২য় পর্যায় )

১৯. অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন : "আমার যখন নাট্যজীবনের আরম্ভ হয় নাই, তখন 'সধবার একাদশী'র রামমাণিক্য ভূমিকায় মাধুর ( রাধামাধবের ডাক নাম—শ. ভ ) খ্যাতি আমাকে উতলা করিয়া তুলিল।" ( তদেব )

২০. নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়।

২১. এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন : "কৃতবিদ্য বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধু বাবু, রায় বাহাদুর ৺রামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে, উক্ত অবৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আসেন। অর্দ্ধেন্দুর 'জীবনচন্দ্রের' ভূমিকা (Part)। জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, 'আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব।" ( 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' )

দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র লিখেছেন : "অভিনয়শেষে একজন মুস্তফী মহাশয়কে বলিলেন, গ্রন্থকার আপনাকে দেখিতে চাহেন। তিনি কম্পিত হৃদয়ে উপস্থিত হইলে, গ্রন্থকার তাঁহাকে আদরের সহিত বলিলেন—'যদি ব্রাহ্মণ হও তো পায়ের ধূলা দাও, নইলে আশীর্বাদ গ্রহণ কর।' উৎসাহ দিবার জন্য আরও বলিয়াছিলেন,—অটলের উপর বিরক্তি দেখাবার জন্যে, যাবার সময়ে তুমি যে তাকে পদাঘাত করেছিলে, that is an improvement on the author. পরবর্তী সংস্করণে Stage Direction-এ একথা সন্নিবিষ্ট করিয়া দিব।" (অর্দ্ধেন্দু কথা' : 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক, ১৩২৭)

২২. ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখেছেন : "পঞ্চমাভিনয়ের সময়ে দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও অভিনীত হয়।" ) 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', ১৯৪৫, পৃ. ২২ )

রাধামাধব করের মতে সপ্তমাভিনয়ের শেষে। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন : "১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের পূজার সময় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের (স্বনামধন্য অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ—শ. ভ. ) চোরবাগানের বাড়িতে 'সধবার একাদশী'ও

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অভিনীত হইল। গিরিশবাবু একটা নটনটীর Prologue রচনা করিয়া দেন।" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

এই সূত্র ধ'রেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন: "বাগবাজার এমেচার থিয়েটার কর্তৃক 'সধবার একাদশী' ৭ম বা শেষবার অভিনীত হয় ১৮৭২ সনে দুর্গাপূজার সময় চোরবাগানে লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়িতে। এবার 'সধবার একাদশী'র শেষে দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অভিনীত হইয়াছিল।" ( 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৭৪ )

২৩. সন-তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। 'বিশ্বকোষ'-এর মতে ১২৭৬ আশ্বিন, ১৮৭১ অক্টোবর।

২৪. বাগবাজারের দলের ( 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' ) 'লীলাবতী' অভিনয়ে (১১ই মে, ১৮৭২) মহেন্দ্রলাল বসু (১৮৫৪-১৯০১) 'ভোলানাথ চৌধুরী'র ভূমিকায় প্রথম মঞ্চে অবতীর্ণ হন।

২৫. সন-তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ২২ ও ২৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬. ১৮৭২-এর ১১ই মে তারিখে বাগবাজারের দল ( 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' ) কর্তৃক অভিনীত 'লীলাবতী' নাটকে 'মেজো খুড়ো'-র ভূমিকায় মতিলাল সুর প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

২৭. 'উষা-অনিরুদ্ধ' যাত্রা হয় 'সধবার একাদশী'-র চতুর্থ বা পঞ্চমাভিনয়ের পরে। রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "আমাদের সুখ্যাতি শুনিয়া 'শর্মিষ্ঠা'-ওয়ালারা বিদ্রূপ করিয়া বলিল—'ওঃ, ভারি তো বাহাদুরি করেছে! ছবি এঁকে, পর্দার আড়ালে ও রকম নাচগান তো সকলেই করতে পারে। আমাদের মত খোলা আসরে যাত্রা করতে পার তো বুঝি।' আমদপুর হইতে যাত্রার সাট মিলাইয়া পনের দিনের মধ্যে আমরা যাত্রা গানের আসরে নামিলাম। 'উষা-অনিরুদ্ধ' পালায় আমি উষা সাজিলাম। হিঙ্গুলখাঁর সুরে গিরিশবাবু গান বাঁধিয়া দিলেন। মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ সাজিলেন। মতিলাল সুর হইলেন বাণরাজা।···কলিকাতার একটি গলির ভিতরে একই দিনে দুই পৃথক আসরে 'শর্মিষ্ঠা' ও 'উষা-অনিরুদ্ধ' যাত্রা গাওয়া হইল। উভয়ের মধ্যে ৩।৪ খানি বাড়ির ব্যবধান ছিল। আমাদের পালা খুব জাঁকিয়া উঠিল।" (পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

২৮. রাধামাধব করের স্মৃতিকথাতেও অনুরূপ উল্লেখ আছে। ( দ্রঃ তদেব )

২৯. অমৃতলাল বসুর মতে: "That play was the unconscious germ of the public stage" (তদেব)

৩০. কয়লাহাটায় 'কিছু কিছু বুঝি'-তে অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় নৈপুণ্য দেখে মাইকেল তাঁকে পাবলিক থিয়েটার খোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ( দ্রঃ 'মধুস্মৃতি': নগেন্দ্রনাথ সোম )

৩১. ব্রজবাবু গিরিশচন্দ্রের শ্যালক। 'বিশ্বকোষ' বলেন ব্রজবাবুর এই দলের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সংস্রব ছিল না।

৩২. "আমাদের এক মুসলমান বন্ধু হিঙ্গুল খাঁ বাজিয়ে ছিলেন।...সুন্দর বেহালা বাজাইতেন। তাঁহার আসল নাম হামিদুদ্দীন খাঁ। শ্যামবাজারে নিকারীপাড়ার মোড়ে তাঁহার বাড়ি ছিল। তাঁহার পিতা নীলকাপড় ছোপাইয়া খালাসীদের কাপড়ের ব্যবসা করিতেন। সর্বদা মুসলমানের সঙ্গে উঠা-বসা করি, ইহা তখনকার সমাজের দৃষ্টিতে লুকাইবার জন্য আমরা আবার হিঙ্গুল খাঁর একটা বাংলা হিন্দুনামও দিয়া রাখিয়াছিলাম—হেমবাবু। উত্তরকালে তিনি সংগীত বিদ্যায় বেশ পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতাও হইয়াছিলেন। তিনি অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, তাঁহারই নকলে রহস্যরসের অভিনয় করিতে শিখিয়াছিলেন এবং নিজেও উপস্থিত মত রহস্যরচনা করিতে পারিতেন।"—রাধামাধব কর: রঙ্গমঞ্চ, আশ্বিন, ১৩১৭

৩৩. নন্দলাল ঘোষ; 'সধবার একাদশী'র কাঞ্চন।

৩৪. কালিদাস ভট্টাচার্য-বিরচিত; শেক্‌স্‌পীয়রের 'মার্চেন্ট অফ্ ভিনিস' অবলম্বনে লিখিত।

৩৫. অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "আমাদের রিহার্স্যাল হইত গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়িতে; গাঙ্গুলী হাইকোর্টের কর্মচারী ছিলেন। বেশ সৎ লোক; কিন্তু তাঁহাকে লইয়া আমরা কিছু কিছু হাসিঠাট্টা করিতাম।" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

৩৬. "লীলাবতী লইয়া আমাদের আখড়া বসিল,—গোবিন্দ গাঙ্গুলীর শ্বশুরবাড়িতে। কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু গৃহস্বামীর সহিত মনান্তর হইল। আমরা 'ঊষা-অনিরুদ্ধ' যাত্রার বাড়িতে rehearse করিতে আরম্ভ করিলাম। সেখান হইতে আমরা রাজেন্দ্র পালের বাড়িতে চলিয়া গেলাম।" ( রাধামাধব করের স্মৃতিকথা: 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

৩৭. "এইখানে আমরা বলিয়া রাখি, 'ঊষা-অনিরুদ্ধ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'লীলাবতী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক আমরা অভিনয় করিয়াছিলাম, সমস্তগুলির স্ত্রীলোকের ভূমিকার শিক্ষকতা আমাকেই করিতে হইত।...স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র

ঘোষ আমার নামের উল্লেখ করিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর থিয়েটারে শিক্ষকতার দাবী রাখেন।" ( তদেব )

৩৮. "লীলাবতীর অভিনয় আরম্ভ হইল। সম্প্রদায় স্থাপনে আমার একজন পূর্ববঙ্গীয় বন্ধু উদারচেতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ উৎসাহী। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ না থাকিলে সম্প্রদায় স্থাপিত হইত না, তাঁহারই অর্থব্যয়ে আকড়া খরচ চলিত।" ( 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' : গিরিশচন্দ্র ঘোষ )

৩৯. "অবশেষে ১২৭৮ সালের বৈশাখে ( ১৮৭১ এপ্রিলে ) নগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে একদিন পরীক্ষার্থে অভিনয় (Dress-Rehearsal) হইল।" ( 'বিশ্বকোষ', ১৬শ খণ্ড )

৪০. রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন : "লীলাবতী ও ললিতের কথা অমিত্রাক্ষর ছন্দে থাকার দরুন অনেকেই পশ্চাৎপদ হইলেন। শেষে গিরিশবাবু আসিয়া যখন ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, তখন আর কোনও বাধা রহিল না।" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

৪১. রাধামাধব করের স্মৃতিকথায় আছে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে স্টেজ নির্মিত হওয়ার পরে চাঁদার খাতা হয় এবং সেটা ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি স্মৃতিচারণে বলেছেন : "স্টেজ নির্মিত হইল। প্রসিদ্ধ গীতগোবিন্দ গায়ক মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, 'এইবার আমাদের টিকিট বিক্রয় করা উচিত। পরামর্শটা মন্দ বলিয়া মনে হইল না। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইল। স্যর রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র রূপলাল মিত্র মহাশয় ইংরাজী ভাষায় একটি আবেদনপত্র লিখিয়াছেন। জোড়াসাঁকোর যোগেন্দ্রনাথ বসুর একটি ছাপাখানা ছিল; সেইখানে আমাদের prospectus মুদ্রিত হইল; উক্তপত্রে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের স্বাক্ষর ছিল। পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ধনীগৃহস্থের বাড়িতে আমরা যাতায়াত করিলাম; বিদ্রূপ ও টিটকারী ভিন্ন আমাদের বেশি কিছু লাভ হইল না। অনন্যোপায় হইয়া চাঁদার খাতায় তখন প্রত্যেকে ২০৲।২৫৲ টাকা সই করিলাম।" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

কিন্তু ধর্মদাস সুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে স্টেজ নির্মিত হওয়ার আগে চাঁদার খাতা প্রস্তুত হয়। তিনি লিখেছেন : "তখন দুর্গাদাস মহাশয়ের (রাধামাধব করের পিতা—শ. ভ.) বাটীতে আমাদের বসিবার একটি আড্ডা ছিল।...পরামর্শ করা হইল, একটি prospectus ছাপান হউক।

প্রস্পেক্টাস ছাপান হইল, চাঁদার বহি বাঁধান হইল। প্রথম আমি ২০৲ টাকা তারপর নগেন ২০৲ টাকা সই করিল। পরে প্রসপেক্টাস ও বই লইয়া সকলে বাহির হইল, কিন্তু সমস্ত কলিকাতা ঘুরিয়া একমাসকালের মধ্যে কোনো বড় লোকের সই করাইতে পারিলাম না। ঐ প্রসপেক্টাসে আমার ও নগেন ও আর একজনের সই ছিল।…যে যে রকমে পারে অর্থের জোগাড়ে চাঁদা সহি করাইতে লাগিল। এই রকমে আমাদের ভিতর আমার ও নগেনের টাকা লইয়া আশী টাকা যোগাড় হইল। তাহাতে কয়েকখানি সিনের উপযোগী কাপড় ও রং কেনা হইল।…এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু বেনারস হইতে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। এখানে যদি থাকেন, আমাদের সহিত অভিনয় করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। তিনি রিহার্সালে যাইতেন ও আমার বাটীতে আসিয়া সিন আঁকা দেখিতেন।…

"এই রকমে দুই মাসের মধ্যে 'লীলাবতী'র উপযোগী সমস্ত stage আমি শেষ করিলাম। স্টেজ-সংক্রান্ত কার্য বা টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমার উপর সকলের ভার ও বিশ্বাস ছিল। আমি খরচপত্র ও টাকার সমস্ত হিসাব রাখিতাম। পরে থিয়েটার খুলিবার জন্য শ্যামবাজার বৃন্দাবন পালের গলিতে রাজেন্দ্রপালের বাটীতে স্টেজ বাঁধিয়া অভিনয় আরম্ভ হইল।" ('নাট্যমন্দির', ভাদ্র ১৩১৭)

চুঁচড়োয় 'লীলাবতী' অভিনয়ের (৩০ মার্চ, ১৮৭২) পরে বাগবাজারের দলের ('শ্যামবাজার নাট্যসমাজ') 'লীলাবতী'র অভিনয় হয় ১৮৭২-এর ১১ই মে তারিখে।

এই প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন: "লীলাবতীর রিহার্সাল চলিতে লাগিল। …অর্দ্ধেন্দু আমাকে জোর করিয়া যোগজীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন। তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া আসিল, কাশী হইতে লোকনাথবাবু কলিকাতায় আসিয়া আমাকে কাশীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। …আমার আর স্টেজে দাঁড়ান হইল না।…১৮৭২ সালের গোড়ায় কাশী পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে আসিলাম।" (পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

৪২. রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "লীলাবতী'তে রাজপথের সীনই ছিল না"। (পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

ধর্মদাস সুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "গোবর্দ্ধন নামে একজন চিত্রকরকে একখানি বাটীর সম্মুখ আঁকিতে দেওয়া গেল। সেই সীনখানি আঁকিতেই আমাদের সমস্ত টাকা প্রায় শেষ হইয়া আসিল কাজেই আঁকার কাজ বন্ধ হইয়া

গেল। তখন আমি অন্য উপায় না দেখিয়া নিজেই আঁকিব স্থির করিলাম ও একখানি চেয়ার আঁকিতে আরম্ভ করিলাম।" ('নাট্যমন্দির,' ভাদ্র, ১৩১৭)

৪৩. রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "ধর্মদাস তুলি ধরিলেন। ঠিক কথা; কিন্তু একা নয়, ক্ষেত্র ও আর্টস্কুলের অন্যান্য ছাত্রেরা সীন আঁকিয়া দিয়াছিল।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

৪৪. রাধামাধব করের মতে "মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু কেহই টাকা দিয়া দল বজায় রাখেন নাই।" (তদেব)

৪৫. গিরিশচন্দ্র।

৪৬. রাধামাধব কর বলেন "শুধু অর্দ্ধেন্দুবাবু নয়, দলের অন্যান্য সকলেই স্টেজ ব্রজবাবুর নিকট প্রার্থনা করেন।" (তদেব)

৪৭. রাধামাধব কর এর প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন "অর্থ-কষ্টের জন্য আমরা জিনিসগুলা ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছিলাম, ইহা মিথ্যা কথা। ধর্মদাস সুরের বাড়ির সম্মুখে একটা ছোট মাঠ ছিল, সেইখানে ঐ কাঠগুলা আমরা রাখিয়াছিলাম। সেই প্ল্যাটফরমের উপরে আমাদের স্টেজ খাড়া হইল।" (তদেব)

এই প্রসঙ্গে ধর্মদাস সুরের বক্তব্য: "এই সময় গিরিশবাবুর শ্যালক ৺ব্রজনাথ দেব (যিনি Atkinson-এর বুককিপার ছিলেন) ব্যাপারিদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া একটি স্টেজ শ্যামপুকুরে তাঁহারই বাড়ির নিকট আরম্ভ করেন। এই নির্মাণকার্যের সমস্তই আমার উপর ভার ছিল, কিন্তু অকালে আমার সুহৃদ ব্রজবাবুর কাল হওয়ায় উক্ত কার্য বন্ধ হইয়া গেল ও ঐ প্লাটফরম ইত্যাদি পড়িয়া মাটি হইতে লাগিল। তখন গিরিশবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, যদি ঐ কাঠকুটো সব আমি তোমাদের দেওয়াতে পারি, তোমরা stage ভাল করিয়া করিতে পারিবে কি? আমরা সকলে বলিলাম, অবশ্য পারিব। তখন তিনি তাঁহার অপর শ্যালক দ্বারকানাথ দেবকে বলিয়া ঐ সমস্ত কাঠ আমাদের দেওয়াইলেন। আমরা সকলে মিলিয়া শ্যামপুকুর হইতে কেহ মাথায়, কেহ কেহ কাঁধে করিয়া ঐ সমস্ত কাঠ আমার বাগবাজারের বাটীতে লইয়া আসিলাম।" ('নাট্যমন্দির' ভাদ্র, ১৩১৭)

৪৮. রাধামাধব কর বলেন: "ধর্মদাস ও রাজেন্দ্র ম্যাকলিনকে রাখে নাই; রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তখনও আমাদের দলের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ২য় পর্যায়)

৪৯. "দৈবক্রমে এক ইংরেজ এই কাজে আমাকে সহায়তা করিয়াছিল।

সে জাহাজে রঙের কাজ করিত। সে আমার সমস্ত রঙ ফলাইয়া দিত।" ('ধর্মদাস সুরের আত্মজীবনী' : 'নাট্যমন্দির', ভাদ্র, ১৩১৭)

৫০. "বৃন্দাবন পালের বাড়িতে স্টেজের জিনিসগুলা লইয়া যাইবার সময় অর্দ্ধেন্দুবাবু কোনও কথাই বলেন নাই; এসকল ব্যাপারে তিনি মোটে কথাই কহিতেন না।" ('রাধামাধব করের স্মৃতিকথা' : 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

৫১. বাগবাজারের 'লীলাবতী'-র আক্‌ড়ায় গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার যোগদান করেন ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এর আগে চুঁচ্‌ড়োর মল্লিক বাড়িতে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উদ্যোগে 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে; অভিনয়ের তারিখ ৩০এ মার্চ ১৮৭২। চুঁচড়োর 'লীলাবতী' অভিনয়ের সমালোচনা ১৮৭২-এর ৪ঠা এপ্রিল তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন: "বহুদিন লীলাবতীর আক্‌ড়া চলে। প্রথমে তথায় আমার বেশি যাতায়াত ছিল না; কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া বিশেষরূপে যোগদান করিতে হয়। চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও সাধারণীর সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া 'লীলাবতী'র সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের সুখ্যাতি অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইল। বাগবাজারে 'লীলাবতী' বসিয়াছে বটে, কিন্তু সকল অংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। যদিও অন্যরূপ কারণ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাই, আমার যোগদানের স্বরূপ কারণ বলিতে আমায় বাধ্য হইতে হইয়াছে। উল্লিখিত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিভাশালী স্টেজ-ম্যানেজার ধর্মদাস সুর সমবেত হইয়া আসিয়া অর্দ্ধেন্দু আমার নিকট বলেন, চুঁচড়ার দলের নিকট হারিয়া যাইব, তুমি কি বসিয়া দেখিবে? অর্দ্ধেন্দুরই সর্বাপেক্ষা বিশেষ অনুরোধ। নাট্যকার দীনবন্ধুবাবু, তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন, 'তোমরা পারিবে না'।" ('বঙ্গীয় নাট্যশালায় স্বর্গীয় নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী')

৫২. সঠিক অভিনয় তারিখ ১১ই মে, ১৮৭২ (দ্র: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', চতুর্থ সংস্করণ, পৃ: ৭৫-৭৬)। এই অভিনয় সম্বন্ধে দীনবন্ধু-পুত্র ললিতচন্দ্র লিখেছেন, "যখন অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্র 'লীলাবতী' অভিনয়ের আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে চুঁচুঁড়ায় 'লীলাবতী'র অভিনয় সম্পাদিত হয়। অভিনয় রজনীতে গ্রন্থকার উপস্থিত ছিলেন। সে অভিনয়ের কথা জানিয়া কলিকাতার নবীন অভিনেতারা

অধিকতর যত্নের সহিত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শিখাইবার ভার প্রধানতঃ মুস্তফী মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের অভিনয়ের দিনও গ্রন্থকার উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিনয়দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অভিনেতৃগণকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিয়াছিলেন, 'এবার চিঠি লিখবো—তুয়ো বঙ্কিম।' এই অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র 'ললিত' ও অর্দ্ধেন্দুশেখর 'হরবিলাস' সাজিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, যে দৃশ্যে লীলাবতী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া খেদোক্তি করিতেছেন তাহা শুনিয়া অর্দ্ধেন্দু মুখের ভাবের ব্যঞ্জনা দেখাইবার যে ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে গ্রন্থকার মুগ্ধ হইয়াছিলেন।" ( 'অর্দ্ধেন্দু কথা' : 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক, ১৩২৭ )

৫৩. মতিলাল সুর ; 'মেজখুড়ো'-র পার্ট করেছিলেন।

৫৪. মহেন্দ্র লাল বসু ; ভোলানাথ চৌধুরীর পার্ট করেছিলেন।

৫৫. হিঙ্গুল খাঁ ; 'রঘু উড়ে'-র পার্ট করেছিলেন। "উড়িয়ার ভূমিকায় 'হিঙ্গুল খাঁ অদ্বিতীয় ছিল।" ( রাধামাধব করের স্মৃতিকথা' : 'পুরাতন প্রসঙ্গ,' দ্বিতীয় পর্যায় )

৫৬. বৈকুণ্ঠ নাথ বসু ( ১৮৫৪-১৯২১ ): ইনি ১৮৭০ খৃঃ টাঁকশালের নায়েব দেওয়ানের পদ, ১৮৮০ খৃঃ শিয়ালদহ ( শিবাদহ ) পুলিশকোর্টের এবং ১৮৯২ খৃঃ কলকাতার অন্যতম অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খৃঃ 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ১৯১০ খৃঃ শিয়ালদহ কোর্টে সরাসরি বিচার করবার অধিকার (summary power) পান। ইনি আলিপুর সেন্ট্রাল, জুভিনাইল ও প্রেসিডেন্সী জেলের অন্যতম বেসরকারী পরিদর্শক ছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ে সঙ্গীতশিক্ষা করেন এবং ১৮৮১ খৃঃ Bengal Academy of Music এর অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি 'সঙ্গীত উপাধ্যায়' উপাধি ও স্বর্ণকেয়ুর উপহার পেয়েছিলেন। সেতার, সুরবাহার, এসরাজ, হারমোনিয়াম, পিয়ানো, মৃদঙ্গ, তবলা ও ঢোল বাদনে সুদক্ষ ছিলেন। ইনি অনেকগুলি নাটক ও প্রহসনেরও রচয়িতা। এঁরই রচিত 'মান' অর্দ্ধেন্দুশেখরের আমলে এমারেল্ড থিয়েটারে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে অভিনীত হয়।

৫৭. নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশনাল পেপার' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ও 'হিন্দু মেলা'র ( প্রতিষ্ঠা দিবস : চৈত্র-সংক্রান্তি, ১৮৬৭ ) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৪০-১৯২৬ ) তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন : "নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল ; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত ; কুস্তি, জিমন্যাষ্টিক, প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব

ছিল ; কিন্তু কিরকম কি হওয়া উচিত, সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল, তাঁতি, কামার, কুমার ইত্যাদি লইয়া।... একখানা ন্যাশনাল কাগজ বাহির করিল,...নবগোপালের সময় হইতে এই 'ন্যাশনাল' শব্দটা দাঁড়াইয়া গেল।" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায় )

৫৮. রাধামাধব কর বলেন, "ইহার বহুপূর্বে নবগোপাল মিত্র আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।" ( তদেব )

৫৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "এই উক্তির ( অর্দ্ধেন্দুশেখরের উক্তির—শ. ভ ) উপর নির্ভর করিয়া এ পর্যন্ত সকলেই বলিয়া আসিয়াছেন যে, 'লীলাবতী' অভিনয়ের সময়েই বাগবাজারের দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গ্রহণ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণ যে 'নীলদর্পণ' মহলা দিবার সময়ে হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'লীলাবতী' অভিনয়ের সময়ে এই দলের নাম ছিল 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম ইহার কিছুদিন পরে 'নীলদর্পণ' মহলা দিবার সময়ে প্রস্তাবিত হয়। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুস্তিকায় লিখিয়াছেন,

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর,...'লীলাবতী'তে অর্দ্ধেন্দুকে 'হরবিলাস' দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না। তাহার পর ন্যাসান্যাল থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম 'নীলদর্পণ' অভিনয় আরম্ভ হইল। ( পৃঃ ৫ )

"গিরিশচন্দ্রের উক্তি সম্বন্ধে এই আপত্তি উঠিতে পারে যে, অর্দ্ধেন্দু ও গিরিশচন্দ্র উভয়েই যখন এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী এবং উভয়ের উক্তিই যখন ঘটনার বহু বৎসর পরে লিখিত, তখন অর্দ্ধেন্দুর সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া গিরিশ চন্দ্রের সাক্ষ্যকে নির্ভুল মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে। এ-যুক্তি খণ্ডন কঠিন নয়। কারণ, 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামগ্রহণ লইয়াই গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতির মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে গিরিশচন্দ্র দলত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্র 'লীলাবতী'র অভিনয়ে একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সময়ে তাঁহার সহিত বাগবাজারের দলের কোন সংস্রব ছিল না। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয়, 'লীলাবতী' অভিনয়ের পরে ও 'নীলদর্পণ অভিনয়ের পূর্বে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গ্রহণের প্রস্তাব উঠে।

"ন্যাশনাল থিয়েটার' নামগ্রহণ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের উক্তিই যে ঠিক, তাহার অন্য প্রমাণও আছে। ১৮৭২ সনের ২০এ নভেম্বর তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়,

A New Native Theatrical Society. A few native gentlemen, residents of Bagh Bazar, have established a Theatrical society, named "The Calcutta National Theatrical Society" their object being to improve the stage, as also to encourage native youths in the composition of new Bengali dramas from the proceeds of sales of tickets. The attempt is a laudable one, and is the first of its kind. The first public performance is to take place on the 7th proximo, on the premises of the Late Babu Madhusudan Sandel Upper Chitpore Road.

উহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ১৮৭২ সনের নবেম্বর মাসের কাছাকাছি 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণ ও উহাতে সর্বপ্রথম অভিনয়ের উদ্যোগ হয়। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কালনির্দ্ধারণের জন্য অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।" ( 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৮৫-৮৬ )

রাধামাধব কর বলেন, "Calcutta National Theatre) নামকরণের প্রস্তাব আদৌ উল্লিখিত হয় নাই; নবগোপালের মুখ হইতে এরূপ অসঙ্গত নাম কখনই প্রস্তাবিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ২য় পর্যায় )

৬০. রাধামাধব কর বলেন, "ঝির মুখে খাঁটি মেদিনীপুরের ভাষা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিল।" ( তদেব )

৬১. অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন, "লীলাবতীর রিহার্সাল চলিতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু আমায় বলিল—'দেখ, সব পাওয়া গেছে, উড়েটা পাচ্ছি না, কি করা যায়? আমি বলিলাম—'তোমাদের আমি একটি ভাল উড়ে দিতে পারি।' এই বলিয়া শশীকে লইয়া গেলাম। তার পরে অনেকদিন শশীর নাম 'বিসাড়ি' হইয়া গিয়াছিল।" ( তদেব )

কিন্তু রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "শশী বিশাড়ীকে অর্দ্ধেন্দু এখন কোথা হইতে পাইবেন? কয় বৎসর পরে সে ন্যাশনাল থিয়েটারে আসিয়া জুটিল..." (তদেব)

৬২. রাধামাধব কর বলেন রাজেন্দ্রলাল পালের বাড়িতে 'লীলাবতী' অভিনয়ের জন্য স্টেজ তৈরির পরে মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় টিকিট বেচে অভিনয় করার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে ৪১নং টীকা দ্রষ্টব্য।

গিরিশচন্দ্র বলেন 'লীলাবতী'র প্রথম অভিনয়ের পরে টিকিটের দাম করার প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু প্রস্তাবটির প্রথম উত্থাপক কে, সে বিষয়ে তিনি নীরব। তিনি লিখেছেন: "শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গনে রঙ্গমঞ্চ

স্থাপিত ; দৃশ্যপটগুলি ধর্মদাসবাবুর তুলিতে অঙ্কিত, সামান্য চাঁদার অর্থে কার্য-সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু অভিনয়ের সুখ্যাতি এত বিস্তৃত, যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্য উমেদার। যদিচ বৃহৎ প্রাঙ্গণ, তথাপি স্থানাভাবে বহু টিকিট প্রার্থীকে বঞ্চিত করিতে হইত। এ অবস্থায় টিকিটের দাম করা যাক, প্রস্তাব হইল ; এবং এই প্রস্তাবই ন্যাসান্যাল থিয়েটার স্থাপনের ভিত্তি।" ( 'বঙ্গীয় নাট্য-শালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' )

ধর্মদাস সুরের বিবৃতি গিরিশচন্দ্রের অনুরূপ। তিনি তাঁর 'আত্মজীবনী'-তে লিখেছেন : "এইরকমে দুই মাসের মধ্যে 'লীলাবতী'র উপযোগী সমস্ত stage আমি শেষ করিলাম।···পরে থিয়েটার খুলিবার জন্য শ্যামবাজার বৃন্দাবন পালের গলিতে রাজেন্দ্রচন্দ্র পালের বাটীতে স্টেজ বাঁধিয়া অভিনয় আরম্ভ হইল। অভিনয় দেখিবার জন্য দর্শকের এত আগ্রহ হইল যে, আমরা বলিলাম ও বিজ্ঞাপন দিলাম—ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট না দেখাইলে আমরা টিকিট দিব না। তাহাতেও আমরা স্থান দিতে পারিতাম না। এইরূপে উৎসাহিত হইয়া আমরা স্থির করিলাম, টিকিট বেচিয়া থিয়েটার করিব।" ( 'নাট্যমন্দির', ভাদ্র, ১৩১৭ )

৬৩. রাধামাধব করের মতে 'স্টেজও পচে নাই, দলও ভাঙ্গে নাই।' ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

৬৪. রাধামাধব করের মন্তব্য : "অর্দ্ধেন্দুবাবু দল গড়িবেন কি ? নগেনবাবুই দল গড়িলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু দলের শিক্ষকতা করিতেন ; ওসব ভাঙ্গাগড়ার দিকেই যাইতেন না।" ( তদেব )

৬৫. "রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরে ভুবন নিয়োগীর সেই বাড়িটি এখন আর নাই ; তাহার সোপানাবলী কলবাহিনী ভাগীরথীর জলে ধৌত হইয়া যাইত। দ্বিতলের প্রকাণ্ড হলে আমরা নীলদর্পণের রিহার্সাল চালাইতাম।" ( অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা : 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

৬৬. 'লীলাবতী' অভিনয়ের পরে অর্থাৎ ১৮৭২-এর ১১ই মে-র পরে কোন এক সময়ে বাগবাজারের দল ভুবনমোহন নিয়োগীর বৈঠকখানায় আশ্রয় পায়। নীলদর্পণ অভিনয়ের তারিখ ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২।

৬৭. "অর্দ্ধেন্দু ছিলেন আমাদের General master।"—অমৃতলাল বসু। ( দ্রঃ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

৬৮. গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'গিরিশ গীতাবলী'তে ( ১৩১০ সাল ) লিখেছেন, "যাহাই হউক, সম্প্রদায় তৎপরে দ্বিগুণ উৎসাহে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর গঙ্গাতটস্থ বৈঠকখানায় গিরিশবাবুর প্রস্তাবমত

'নীলদর্পণের' রিহার্সাল দিতে লাগিলেন।" অবিনাশচন্দ্র দাবী করেন তাঁর উক্তির সত্যতা ধর্মদাস সুর ও ভুবনমোহন নিয়োগী কর্তৃক সমর্থিত। এ প্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্রের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থের (১৩৩৪) ১৩শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। কিন্তু স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে নীরব। তিনি তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুস্তিকায় লিখেছেন, "কিছুদিন পরে নীলদর্পণের রিহারস্তাল বসিল।" ধর্মদাস সুরও তাঁর 'আত্মজীবনী'-তে ('নাট্যমন্দির', ভাদ্র, ১৩১৭) এ বিষয়ের উল্লেখ করেন নি। তিনি শুদ্ধমাত্র লিখেছেন, "পরে 'নীলদর্পণের' রিহার্সাল আরম্ভ হইল।"

৬৯. কমিটির প্রেসিডেন্ট বেণীমাধব মিত্র সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতি-কথায় বলেছেন, "ইনি থিয়েটারের বেশি কিছু বুঝিতেন, তাহা নহে। আপিসে চাকরী করিতেন, বয়সে বড়, মুরুব্বি হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তাঁহাকে থিয়েটারে সাজিবার জন্য কখনও অনুরোধ করা হয় নাই।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

৭০. অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭): 'সাধারণী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। বঙ্কিম-গোষ্ঠীর লেখক।

৭১. একা অক্ষয়চন্দ্র সরকার আসেন নি, সঙ্গে ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) ও প্যারীমোহন রায়। (দ্রঃ অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা: 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

৭২. সেদিন উপস্থিত ছিলেন একা অমৃতলাল বসু এবং তাঁরা অমৃতলালেরই আবৃত্তি শুনে চলে যান। (দ্রঃ তদেব)

৭৩. অর্দ্ধেন্দু কর্তৃক 'তাঁরা' পদটি ব্যবহারের দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে একা অক্ষয়চন্দ্র সেদিন আসেন নি।

৭৪. এই প্রসঙ্গে রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "এই সময়ে গিরিশবাবু কোনও সখের যাত্রার দল বসান নাই; কোনও সঙ্-এর পালা বাঁধেন নাই। উনি আপিসে বসিয়া 'লুপ্ত-বেণী' গানটি রচনা করিয়া আমাদের এই বাড়িতে আসিয়া গানটি আমাদিগকে গাইতে বলেন; এই বাড়িতে বসিয়া এই গানের সুর ধরা হয়।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

অর্দ্ধেন্দুশেখর ও রাধামাধব করের বিবৃতিতে একটা মিল দেখা যাচ্ছে যে, 'লুপ্ত-বেণী' গানটি 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পূর্বেই রচিত ও গীত হয়। কিন্তু অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথায় আছে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পরে উক্ত ব্যঙ্গ-কবিতাটি রচিত ও গীত হয়। অমৃতলাল বলেছেন: "আবার শনিবারে (দ্বিতীয় শনিবার

অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭২—শ ভ) 'নীলদর্পণ' অভিনয় করা হইল। একদিন একটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন—'ওহে, গিরিশ ঘোষ তোমাদের নামে একটা গান বেঁধেছে, তোমাদের খুব ঠাট্টা করেছে।' আমরা বলিলাম, 'বটে, কই সে গান দেখি।' আমাদের গালাগালির গানটা পড়িয়া আমাদের এত ভাল লাগিল যে আমি বলিলাম,—'ওহে, চমৎকার গান, এস গাওয়া যাক।' আমরা সকলে গান ধরিলাম"—( তদেব )

৭৫. পাঠান্তর : লুপ্তবেণী বইছে তেরোধার।

৭৬. পাঠান্তর : কিবা ধর্মক্ষেত্র স্থান, অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান।

৭৭. পাঠান্তর : বুঝি বা দিনের গৌরব যায় খসে।

অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় (দ্রঃ 'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ২য় পর্যায়) এই গানটির নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

লুপ্তবেণী—বেণী মিত্র; অভিনয় করিতেন না, অথচ কমিটির মাথার উপরে প্রতিষ্ঠিত; গঙ্গা যমুনা সরস্বতী—সঙ্গম।

তেরোধার—ত্রিধারা।

পূর্ণ—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

অর্দ্ধইন্দু—অর্দ্ধেন্দু।

কিরণ—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মতি—মতিলাল সুর।

নগ হতে ধারা ধায়—বাস্তবিক নগেন্দ্রই Organiser ছিল।

সরস্বতী ক্ষীণকায়—মূর্খ।

বিগ্রহ—একটা মন্দ গালাগাল। আবার অন্যপক্ষে ত্রিধারা-সঙ্গমে দেবমূর্তি।

ধর্মক্ষেত্রস্থান—ধর্মদাস ও ক্ষেত্রমোহন স্টেজ তৈয়ার করিয়াছিল।

বিষ্ণু—ব্রাহ্মসমাজের গায়ক; নেপথ্যে গান করিতেন।

অবিনাশী—অবিনাশচন্দ্র কর।

ভুবনমোহন চরে—গঙ্গাতীরে ভুবনমোহন নিয়োগীর বৈঠকখানা বাটীতে।

চাষা—অভিনেতৃদলের মধ্যে অনেকগুলি সদ্‌গোপ ছিলেন।

দীনবন্ধু—নীলদর্পণ-রচয়িতা।

পালে পালে—পাল পদবীধারিগণ।

শশী—শশিভূষণ দাস।

অমৃত—অমৃতলাল বসু।

৭৮. 'লীলাবতী' অভিনয়ের (১১ই মে, ১৮৭২) পর নীলদর্পণের রিহার্সাল আরম্ভ হয়। তাহলে প্রায় সাত মাস রিহার্সাল দেওয়া হয়।

৭৯. জগদ্ধাত্রী পূজার সময়।

৮০ অমৃতলাল বসু কাশীর প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিস্ট্ লোকনাথ মৈত্রের কাছে হোমিওপ্যাথি শেখার জন্যে সেখানে গিয়েছিলেন। 'লীলাবতী'র রিহার্সাল যখন চলছে তখন তিনি একবার কাশী থেকে কলকাতায় এসেছিলেন এবং লীলাবতী সম্প্রদায়ে যোগদান করেছিলেন। অর্দ্ধেন্দু তাঁকে 'যোগজীবন'-এর ভূমিকায় নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু অভিনয়ের আগেই লোকনাথবাবু কলকাতায় এসে অমৃতলালকে কাশীতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। ১৮৭২-এর গোড়ার দিকে লোকনাথবাবুর চিঠি নিয়ে তিনি কাশী ছেড়ে বাঁকিপুরে ডাক্তারি করতে আসেন। ঐ বছরের নবেম্বর মাসে তিনি বাঁকিপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। অমৃতলাল তাঁর স্মৃতিকথায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "কলিকাতায় আসিয়া যেদিন প্রথম আমি আমাদের স্কুল (কম্বুলীটোলার স্কুল; বর্তমান শ্যামবাজার এ ভি. স্কুল—শ.ভ.) দর্শন করিতে যাই অর্দ্ধেন্দু আমাকে দেখিয়া (অর্দ্ধেন্দু ও ধর্মদাস তখন এই স্কুলে মাস্টারী করতেন—শ. ভ.) ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখনই হেড্‌মাস্টারের নিকট ছুটি লইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া ভুবন নিয়োগীর বাগবাজারের গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানায় গেল।…পথে যাইতে যাইতে অর্দ্ধেন্দু সকল কথা খুলিয়া বলিল। গিরিশবাবুর সঙ্গে মনোমালিন্য হইয়াছে। অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে টিকিট বিক্রয় করিবার কথা শুনিয়া তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন; তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে টিকিট বিক্রয় করিয়া পয়সা লওয়া হয়, কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন টিকিট বেচা সকলের ইচ্ছা, তিনি থিয়েটারের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন, 'থিয়েটারের জন্য একখানা ভাল বাড়ি না করিয়া টিকিট বেচিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে না; আগে ভাল স্টেজ কর, তারপর টিকিট বিক্রয় কর; নইলে লোক টিকিট কিনবে কেন?' অর্দ্ধেন্দু ও নগেন্দ্র বন্দ্যো বলিলেন—'আমরা ছোট বাড়িতেই আরম্ভ করি, ছোটোখাটো স্টেজ করি; একেবারে বড় বাড়ি বড় স্টেজ কোথায় পাওয়া যাবে?' এই কথা লইয়া দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছিল।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

৮১. এই প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "আমি ত

সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। প্রথমে নিজে নিজেই আমার পার্টটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। একদিন অর্দ্ধেন্দু বলিলেন, 'তোমার পার্টটা কেমন হ'ল দেখি?' তিনি আমার পরীক্ষা লইয়া বলিলেন—'না, হয় নি।' এই বলিয়া সৈরিন্ধ্রীর প্রথম দৃশ্যে চুলের দড়ি বিনানর সময় কথার ভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। আমার মেয়েলিপনা ঠিক হইল না। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমি ভাবিলাম, বক্তৃতার ধরণটা ঠিক করিয়া লইতে বেশি দেরি হইবে না; আসল ব্যাপারটা হইতেছে ঐ কান্না। ঐটাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া আমি আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কালিদাস সান্যাল মহাশয়ের নিকটে কান্না শিখিতে গেলাম। তাঁর সেকেলে ধরণের কান্না; সুরটাই মেয়েলি, কিন্তু আমার মনে হইল যেন emotion-এর অভাব। আমার ঠিক উহা ভাল লাগিল না। আমি একাই চেষ্টা করিয়া দেখিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ পোড়ো বাড়িতে (অমৃতবাবুর নিজের বাড়ির পাশে একটা খালি ভাঙ্গা বাড়ি—শ.ভ) দ্বিপ্রহরে আমি মড়াকান্না অভ্যাস করিতাম। একাকী করিতাম; অর্দ্ধেন্দু বা অন্য কেহ আমার দোসর ছিলেন না। অনেকদিন পরে আমি অর্দ্ধেন্দুকে বলিলাম, 'একবার আমার কান্নার জায়গাটা শোনো দেখি।' মড়াকান্নার অভিনয় দেখিয়া তিনি সানন্দে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—'বহুৎ আচ্ছা! বেশ হয়েছে।' আমার নাট্যজীবনে অর্দ্ধেন্দু আমার প্রথম গুরু বটে; কিন্তু এই কান্না সাধনায় আমি গুরুকে লুকাইয়া স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার নাট্যগুরু অর্দ্ধেন্দুশেখরের আশীর্বাদে সফল-প্রযত্ন হইলাম। তাঁহার নিকটে আমি যে কত ঋণী তাহা স্বীকার করিতে আমি কখনও সঙ্কোচ বোধ করি নাই। সঙ্কোচ বোধ করাটাই অত্যন্ত লজ্জাকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা দাঁড়াইয়া যাইবে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি বাস্তবিক যাহা করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি থাকিয়া যাইবে। আমার সঙ্গে সেই পোড়ো বাড়িতে গলা সাধেন নাই বলিয়া তাঁহার কৃতিত্বের কিছুমাত্র খর্বতা হইবে না।" (তদেব)

৮২. নীলদর্পণের প্রথম অভিনেতৃদলের নামের একটি তালিকা অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথায় ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়) লিপিবদ্ধ আছে। তাতে দেখা যায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর 'একজন চাষা রায়ৎ'-এর ভূমিকাতেও অভিনয় করেছিলেন।

৮৩. মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না।" (অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা: 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

৮৪. "এই একটি পার্ট সে প্লে করিল, তেমনটি আর কেহ পারিল না।

আমিও রোগ সাহেবের পার্ট প্লে করিয়াছি, কিন্তু অবিনাশের মত হয় নাই।" (তদেব)

৮৫. প্রকৃত নাম শশিভূষণ দাস (বিসাড়ী)। ইনি 'আমিন' ও 'পণ্ডিত-মশাই'-এর পার্টও করেছিলেন।

৮৬. অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথায় আছে—'পূর্ণচন্দ্র ঘোষ···লাঠিয়াল (ইনি বেশি দিন অভিনয় করেন নাই)।'

৮৭. যদুনাথ 'একজন রায়ৎ-ও সেজেছিলেন।

৮৮. গোপালচন্দ্রও 'একজন রায়ৎ' সেজেছিলেন।

৮৯. "চমৎকার প্লে করিতেন"—অমৃতলাল বসু।

৯০. "তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি মান্না নহে"; "এমন চমৎকার রেবতী আর কেহ কখনও হইতে পারিল না। বেচারা শেষটা পাগল হইয়া মারা গেল।"—অমৃতলাল বসু।

৯১. অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথায় আছে, খালাসী সেজেছিলেন গোলোক চট্টোপাধ্যায়।

৯২. অভিনয় হয় ৩৬৫ নং আপার চিৎপুর রোডস্থ (বর্তমান ২৭৯-এক রবীন্দ্র সরণি) মধুসূদন সান্যালের সুবৃহৎ অট্টালিকার বহির্বাটির উঠানে। পরবর্তী কালে মল্লিকরা এই বাড়ি ক্রয় করেন। মল্লিকদের আমল থেকে বাড়িটি 'ঘড়ি-ওয়ালা বাড়ি' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। 'বিশ্বকোষ' বলেন মাসিক তিরিশ টাকা ভাড়ায় উক্ত বহির্বাটির উঠানটি ভাড়া করা হয় আর অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতি-কথায় বলেন মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায়।

৯৩. "নগেন্দ্র ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেস হইতে থিয়েটারের নোটিশ মুদ্রিত করিয়া আনিল" ('অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা' : 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

৯৪. "তাই দেখিয়াছে লোক লালদীঘি-ধারে।
প্ল্যাকার্ড মযেতে উঠে' 'ভুনিবাবু' মারে॥
—'অমৃত-মদিরা' : অমৃতলাল বসু।

অমৃতলাল বসুর ডাক নাম ছিল 'ভুনি'

৯৫. "অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া গ্যাস বসাইয়া দিবার জন্য গৌরমোহন ধরকে রাজী করান হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গ্যাস বসান হইল।" ('অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা' : 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

৯৬. "অপরাহ্নকালেও আমাদের আয়োজন করা অনেক বাকী ছিল,···" (তদেব)

৯৭. "তিন শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হইল,—দুই টাকার, এক টাকার ও আট আনার; প্রথম শ্রেণীর জন্য জানবাজার হইতে চেয়ার ভাড়া করিয়া আনা হইল, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বাঁশের খুঁটির উপর তক্তা দিয়া একরকম বেঞ্চি করা হইল, তৃতীয় শ্রেণীর জন্য দালানের সিঁড়ির উপর ও রকে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল।" ( তদেব )

৯৮. "একটা জানালায় টিকিট বিক্রয় করা হইয়াছিল। দলে দলে দর্শক আসিতে লাগিল। এত ভিড় হইবে আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই।" ( তদেব )

৯৯. "জাব্বা-জোব্বা-পরা ভদ্রলোকেরা চেয়ারগুলি দখল করিয়া বসিলেন।" ( তদেব )

১০০. অভিনয় আরম্ভ হয়েছিল রাত আটটার পরে। অর্দ্ধেন্দুশেখর সূত্রধার রূপে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শকের কাছে কিঞ্চিৎ সদর্প, কাতর স্বরে নিজ মনোবেদনা নিবেদন করেন, "আমাকে অর্থলোভীই বলুক আর যে যা বলুক. আমি দর্শকবর্গের উৎসাহ পাইলেই কর্তব্য-কর্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হইব না।" এই প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকা ( ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ ) মন্তব্য করেন, "...আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বাস্তবিক তিনি অসারগ্রাহী অল্পবিবেচক লোক কর্তৃক কটুবাক্যে পীড়িত হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্য সমাজ তাঁহাকে উৎসাহদানে কখনই বিমুখ হইবে না।" ( ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ—পৃঃ ৮৮ থেকে পুনরুদ্ধৃত )

১০১. অভিনয় শেষ হয় রাত একটায়। প্রথম রাতের অভিনয় সুশৃঙ্খলে হয় নি। প্রেক্ষাগৃহে আলোকাভাবের জন্যে বহু দর্শককে দেশলাই জ্বালিয়ে প্রোগ্রাম দেখতে হয়। একতান বাদ্য বঙ্গীয় হয় নি। দৃশ্যপটসমূহ মঞ্চোপযোগী হয় নি। আসনানুযায়ী টিকিট বিক্রয় হয়নি; ফলে বহু দর্শককে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখতে হয়। ( দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৮৯-৯০-৯১ )

১০২. নবগোপাল মিত্র সম্পাদিত 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রের বিবরণ থেকে জানা যায়, 'প্রথম রজনীতে টিকিট বিক্রয় করিয়া দুইশত টাকা আয় হয়।" ( দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৮৯ )

## সংযোজন

সহৃদয় পাঠকের স্মরণার্থে পুনরায় উল্লেখ করি বাংলা সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ( ২২এ অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ ) তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে এক জনসভা অনুষ্ঠিত

হয়। উক্ত সভায় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও অর্দ্ধেন্দুশেখর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা শুদ্ধমাত্র অর্দ্ধেন্দু শেখরের ভাষণ (প্রায় সম্পূর্ণাংশ) উপস্থাপিত করেছি। এই স্থলে পাঠকদের জ্ঞাপনার্থে নিবেদন করি, উক্ত জনসভা স্বয়ং অর্দ্ধেন্দুশেখর আহ্বান করেছিলেন। প্রচারের উদ্দেশ্যে অর্দ্ধেন্দুশেখর 'বসুমতী' সংবাদপত্রের সম্পাদককে একটি পত্রও প্রেরণ করেন। পত্রটি ১৩০৭ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ (২৯এ নভেম্বর, ১৯০০) তারিখে 'বসুবতী' সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। পত্রটির শেষে সম্পাদক তাঁর মন্তব্যও সন্নিবিষ্ট ক'রে দেন। এই স্থলে সেই পত্রটি উপস্থাপিত করে দেওয়া গেল—

মান্যবর শ্রীযুক্ত বসুমতী সম্পাদক

মহাশয় সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, সাহিত্যের মধ্যে নাটকের স্থান অতি উচ্চে। সেই নাটকের উন্নতি নাট্যশালার অভিনয়ে হইয়া থাকে। কালিদাসাদির নাটকও অভিনীত হইত, তাহার প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থেই আছে; আর য়ুরোপীয় নাটকাদির কথা ছাড়িয়া দিন। আমাদের দেশেও বর্তমান যুগে নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় নাট্যশালার সাহায্যে বাঙ্গালা নাটকের উন্নতি হইতেছে, কি অবনতি হইতেছে, তাহার বিচারক আপনারা। আপনারা সদসদ্বেবী—গ্ল্যাডস্টোনের রাজনীতির ভুল ধরিয়া থাকেন; দিনের মধ্যে তিনবার গবর্নরজেনারেলকে বহাল বরতরফ করিতেছেন; আর নাটকের কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা যে বুঝেন না, এমন কথা বলা যায় কি? যাক, নাটক থাক, নাট্যশালা সম্বন্ধে আমি সাধারণের নিকট কতকটা দায়ী; কাজেই তাহার সম্বন্ধে গোটাকয়েক কথা আমি পার্থিব সংস্রব ত্যাগের পূর্বে বলিয়া যাইতে চাই। নাট্যশালায় সভ্য-জাতির গৌরবসূচক তিনটি প্রধান কলাবিদ্যা,—সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার একত্র সমাবেশ হয়। চেষ্টা থাকিলে, জাতি উন্নতিপ্রয়াসী হইলে এই তিনটি কলার একত্র উন্নতি এই এক প্রতিষ্ঠান হইতে করিয়া লইতে পারে, বাঙ্গালী ততটা উদ্যোগী কবে হইবে তাহা জানি না। সে যাহা হউক, এখন কথা এই, আজ ২৭ বৎসর পূর্বে ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর শনিবারে ৺মধুসূদন সান্যালের (এখন যোড়াসাঁকোর ঘড়িওয়ালা) বাড়ীতে যখন ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম খোলা হয়, তখন সে কার্যটায় অধীনের কিঞ্চিৎ সহায়তা ছিল; আমরা যে কয়জনে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর এ-জগতে নাই। আমরাও যে তিন চার জন আছি সকলেই পালাই পালাই করিতেছি।

য়ুরোপীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার দিন হইতে একাল পর্যন্ত তাহার উন্নতির একটা ধারাবাহিক ইতিহাস যখন আছে, তখন অনুকরণপ্রিয় আমরা, আমাদের এই শিশু নাট্যশালার একটা ইতিহাস রাখিয়া না যাই কেন ? আমাদের অবশিষ্ট তিনচার জনের "ইতি"-র পর আর সে ইতিহাস আপনারা কেহ পাইবেন না। তখন যদি কাহারও এ বিষয়ে "সখ" হয় তাহা হইলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া কতকগুলা "বোধ-হয়" আর "অনুমান হয়" এর শ্রাদ্ধ করিবেন। এ সকল অপেক্ষা আমার ইচ্ছা, আমরাই একটা ইতিহাস সাধারণে বলিয়া কহিয়া বিদায় হই। এই উদ্দেশ্যে আমি স্থির করিয়াছি, আগামী ৭ই ডিসেম্বর বাঙ্গালা থিয়েটারের জন্মদিন উপলক্ষে মিনার্ভা থিয়েটারে একটু উৎসবের আয়োজন করিয়া আপনাদের ন্যায় পাঁচজনের কাছে, এসম্বন্ধে সমস্ত কথাগুলা বলিয়া কহিয়া ফেলিব। অনুগ্রহ-পূর্বক এই কথাটা আপনাদের পাঠকবর্গকে জানাইয়া দিলে বাধিত হইব।

বশংবদ

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

অর্দ্ধেন্দুবাবু 'নাট্যশালার ইতিহাস' সম্বন্ধে- আগামী ৭ই ডিসেম্বরে মিনার্ভা থিয়েটারে বক্তৃতা করিবেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে ? সেদিন কি অবৈতনিক কি বৈতনিক সকল নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনেতৃবর্গের এবং নাট্যসাহিত্যপ্রিয় সাহিত্যসেবিগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয় বটে। আমরা মুস্তফী মহাশয়ের এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। সম্পাদক।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### ন্যাশনাল থিয়েটারে নটলীলা (১৮৭২-৭৩)

১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর, শনিবার—এই দিনটি বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় দিন। এই দিনটিতেই বাঙলা দেশের প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর পত্তন হয়। অর্থাৎ জনসাধারণকে টিকিট বিক্রয় ক'রে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয়। এর আগে নাট্যাভিনয় হ'ত ধনাঢ্য অভিজাত পরিবারগুলির বাসভবনে বা বাগানবাড়িতে। অভিজাতদের পারি-বারিক রঙ্গমঞ্চগুলি ছিল শৌখিন আর ক্ষণস্থায়ী। সেখানে সাধারণের প্রবেশা-ধিকার ছিল না। কেবল তাঁদের নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরাই দর্শক হতে পারতেন।

সেই কারণে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সেকালের নাট্যামোদী জনসমাজে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল। সেই প্রয়োজন মেটালেন বাগবাজারের কয়েকটি নিঃসম্বল যুবক। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এঁরা ধনিক সমাজের দ্বারস্থ হননি। অমৃতলাল বসু বলেছেন,—

"বাস্তবিকই আমরা ধনী ও অভিজাত সমাজের নিকটে অর্থ ভিক্ষা করি নাই। ...ন্যাশনাল থিয়েটারের স্টেজ বাস্তবিকই democratic ছিল ; দেশের আপামর সাধারণের আনন্দের সামগ্রী হইবে, ইহাই তাহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার বিষয় ছিল।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

ন্যাশনাল থিয়েটার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' দিয়ে অভিনয় শুরু করে। বিদেশী নীলকর জমিদারদের দেশের রায়তদের ওপর নীলচাষের জন্যে নৃশংস জুলুম আর বর্বর অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে নীলচাষীদের বিদ্রোহ এর নাট্য বিষয়। নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার (১৮৬০ খ্রীঃ) সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় "কোন গ্রন্থবিশেষ যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না, 'নীলদর্পণ' কে লিখিল তাহা জানিতে পারা গেল না, কিন্তু বাসাতে বাসাতে 'ময়রানী লো সই নীল গেজেছে কই ?' ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল।" ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎ-কালীন বঙ্গসমাজ')

স্বদেশে ও বিদেশে নীলচাষীদের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়ে এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নীলকর অত্যাচার বন্ধ করতে বাধ্য হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

"এই গ্রন্থের নিমিত্ত লংসাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্তই হউক, নীল-দর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই।...ইহার প্রচার করিয়া লংসাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন ; সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবিকানির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্তা নিজে কারাবদ্ধ কি কর্মচ্যুত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ...নীলদর্পন বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin. 'টমকাকার কুটীর' আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে। নীলদর্পণ, নীলদাসদিগের দাসত্বমোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। ('রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা')

স্বাভাবিকভাবেই রাজরোষের ভয়ে অভিজাতদের রঙ্গমঞ্চে 'নীলদর্পণ'-এর স্থান হয় নি। পাঠকদের হাত থেকে রঙ্গমঞ্চে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই নাটককে দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়েছিল মুক্তিদাতা অর্দ্ধেন্দুশেখরের জন্যে।

'নীলদর্পণ'-এর প্রথম অভিনয়ানুষ্ঠানেই ন্যাশনাল থিয়েটারের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দর্শকমহল ও সমকালীন পত্র-পত্রিকা অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। অভিনয় দেখবার জন্যে দর্শক ভেঙে পড়ত। এর সমস্ত কৃতিত্ব প্রাপ্য অর্দ্ধেন্দুশেখরের। ন্যাশনাল থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ তিনি। তাঁর অভিনয় দেখবার জন্যেই দর্শক উন্মুখ। একটি নতুন অভিনয়ধারা গড়ে তুলেছেন অর্দ্ধেন্দুশেখর। গিরিশচন্দ্র যদি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যেতেন তাহ'লে অভিনয়ের গড়মান আরও উন্নীত হ'ত। কিন্তু অভিমানী গিরিশচন্দ্র কেবল দূরে সরেই রইলেন না, ছদ্মনামের আড়ালে সংবাদপত্রে তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় অভিনয়ের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের উনিশ ও সাতাশ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে যথাক্রমে 'এ ফাদার' ও 'এ স্পেক্‌টেটর' স্বাক্ষরে যে-দুটি ব্যঙ্গাত্মক পত্র মুদ্রিত হয়েছিল তা গিরিশচন্দ্রেরই রচনা। (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৯৪-৯৫-৯৬)

ইংরেজি বাংলা প্রায় সব কাগজেই 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। নবগোপাল মিত্র তাঁর 'ন্যাশনাল পেপার'-এ (১১ই ডিসেম্বর) 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর অভ্যুদয়কে স্বাগত জানিয়ে ঘোষণা করলেন—"The event is of national importance." অভিনয়ের প্রশংসা করে লিখলেন—

"All the acts of the drama were satisfactorily performed. But if preference is to be given to one or two or more over others, then certainly we say, that the second part, especially its first scene, and the fifth act, also it; first scene were far better played than the rest. The actors also acquitted themselves admirably well. It would be invidious to draw any distinction between them. But still superior merit, must have its superior reward. And we trust we echo public voice if we give the palm of superiority to the following actors over

the rest—amongst the male, 1st Torab, 2nd Golok Bose, 3rd Nobinmadhub, 4th the Dewan, 5th the Ryots, 6th the little boys and among the female, Golok Bose's wife, Shoirindri, Khettermoni and Pudi Mairani. The actings of the females were most sympathetic, especially, when Golok Bose's wife played the idiot's part, when Khettermoni grew righteously indignant at the shameful conduct of Rogue, the Sahib, and when all lamented over the miserable condition of the Bose's family. Many amongst the audience shed copious tears when they saw the enactment of these parts···" (Quoted in Brajendra Nath Banerjee's 'Bengali Stage', p. 43)

উদ্বোধন রজনীর অভিনয় সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকার ( ১১ই ডিসেম্বর ) সপ্রশংস মন্তব্য : "অভিনেতৃগণের মধ্যে আমরা তোরাপেরই সম্যক্ প্রশংসা করি। তেজস্বী, প্রভুভক্ত তোরাপের চরিত্র সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছিল। গোলোক বসু ও গোলোক বসুর গৃহিণীর চরিত্র একজন কর্ত্তৃকই অভিনীত হইয়াছিল। ইনি একটি পাকা লোক। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইনি গৃহিণীর চরিত্র তেমন সুন্দর রূপ দেখাইতে পারেন নাই। সাবিত্রী ও রেবতী অতি উত্তম, সৈরিন্ধ্রী তত ভাল হয় নাই। কিন্তু তাঁহার রোদনস্বর অপূর্ব বলিতে হইবে। সরলা অতি সুশীলা, প্রকৃত ছোট বৌই বটে। আতুরি—উত্তম।···সকলেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অভিনয়ক্রিয়াও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।···" ( ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৮৯ থেকে পুনরুদ্ধৃত )

১৩ই ডিসেম্বর তারিখের 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত জনৈক দর্শকের একটি প্রশস্তিপত্রের কিয়দংশ : "···অভিনেতৃবর্গকে প্রথমতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রথম শ্রেণীতে তোরাপ ; গোলোকচন্দ্র ও সৈরিন্ধ্রী ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে—গোপীনাথ ; ক্ষেত্রমণি ; উড ; নবীনমাধব ; রেবতী ও সাধুচরণ ; তৃতীয় শ্রেণীতে—সরলতা ; সাবিত্রী ; ময়রানী ; রোগ ; বিন্দুমাধব ও অন্যান্য অভিনেতৃবর্গ ক্রমশঃ স্থাপনযোগ্য।

"···গোলোকবাবুর অভিনয় ঠিক পল্লিগ্রামস্থ বর্দ্ধিষ্ণুলোকের ন্যায় হইয়াছিল, বিশেষতঃ তাঁহার অঙ্গভঙ্গী ও কথাগুলি ঠিক বৃদ্ধলোকের অনুরূপ হইয়াছিল···" ( তদেব, পৃঃ ৯০ থেকে পুনরুদ্ধৃত )

প্রথম রজনীর অভিনয় সম্বন্ধে অমৃতলাল বসুর স্মৃতিচারণ—

"...গোলোক বোস ও উড্‌সাহেবরূপে প্রথম দুই দৃশ্যে অর্দ্ধেন্দু দর্শকমণ্ডলীর মন অধিকার করিয়া বসিলেন।

"করতালি-ধ্বনিতে বৃহৎ অট্টালিকা কম্পিত হইতে লাগিল।...

"...প্রত্যেক অ্যাক্টর যেন নিপুণ শিল্পীর মত দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'কে নিজের মনের মতন করিয়া স্টেজের উপর গড়িয়া তুলিল। কোন্ অভিনেতাকে বিশেষভাবে সুখ্যাতি করিব জানি না। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সুপুরুষ নগেন্দ্রনাথকে নবীনমাধবের ভূমিকায় যেমন মানাইয়াছিল, তেমন নবীনমাধব আর জীবনে দেখি নাই। অনন্যসাধারণ রূপগুণসম্পন্ন মহেন্দ্র বসু পদীময়রানীর ভূমিকায় অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্ষেত্র গাঙ্গুলীর মত সরলা কোনও স্ত্রীলোক কখনও সাজিতে পারে নাই। ক্ষেত্রমণির, রেবতীর, সরলার, সাবিত্রীর ও সৈরিন্ধ্রীর বিচিত্র রোদনধ্বনি বাঙ্গালীর বিভিন্ন সমাজস্তরের বিভিন্ন বয়সের রমণীকণ্ঠের আর্তনাদ সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিল।..." ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিচারণ—

"...ন্যাসান্যাল থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম 'নীলদর্পণ' আরম্ভ হইল। অর্দ্ধেন্দু গোলোক বসু, উডসাহেব, একজন রায়ত ও সাবিত্রীরূপে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক ভূমিকাই বিস্ময়কর, প্রশংসায় কলিকাতা পরিপূর্ণ। আমি শুনিয়াছিলাম, দেখি নাই, কারণ ন্যাসান্যাল থিয়েটারের সহিত প্রথমে আমার সম্বন্ধ ছিল না।" ('বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী')

১৩৩৫ সালের ১লা আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গৃহে অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অর্দ্ধেন্দু স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত ভাষণে অমৃতলাল বসু বলেছিলেন—

"অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাতে আমার আজ মাত্র গলবস্ত্র হয়ে জোড়হাত ক'রে দাঁড়ান উচিত, আর কিছু নয়। তবু আমায় দু'একটা কথা বলতে হবে, কেন না আজ আমি ছাড়া তা বলবার কেউ নেই। একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাই, থিয়েটার যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন টিকিট বিক্রী আরম্ভ হ'তে অ্যাক্টাররা এসে জোটে, তারা নাকি ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি এ কথার প্রতিবাদ করি।

"আজ-কাল চুল পোষাক, এমন কি রাম, লক্ষ্মণ সবই কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তখন সব তৈরি ক'রে নিতে হ'ত মাথা খাটিয়ে। আমরা জনকয়েক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান মিলে সখের খাতিরে থিয়েটার আরম্ভ করি। আমরা নিজেরাই

চাঁদা দিয়ে সব মেটাতুম। কিন্তু তাতেও খরচ উঠত না। তাই 'নীলদর্পণের' সময় খরচ ওঠাবার জন্যে টিকিট বিক্রী করি, যে-কদিন চলে এই ভেবে। তারপর আপনা-আপনি থিয়েটার টেঁকে গেল, এই হচ্ছে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৮৮১ পর্যন্ত কারও মাইনে ছিল না; যার যা একটু আধটু দরকার হ'ত খরচ নিতুম। রঙ্গালয়ে সভ্যতার উন্নতি হয়েছে, commercial spirit বেশি ক'রে ঢুকেছে মাত্র বছর পনেরো কুড়ি।

"তারপর অর্দ্ধেন্দু। বড়লোককে দূর থেকে দেখতে হয়, তার খাদ বাদ দিয়ে—শ্রদ্ধা সম্মান ইত্যাদি দূর থেকেই সম্ভব—আমার সে ঘরের লোক। অর্দ্ধেন্দুর ভেতরে যে এত রস তা' তার বাইরে দেখে ছেলেবেলায় বুঝতেই পারি নি। স্কুলে যখন একসঙ্গে পড়তেম তখন তার রসকষ ছিল না। তারপর জোড়াসাঁকোতে 'কিছু কিছু বুঝি' অভিনয় দেখতে গিয়ে অর্দ্ধেন্দুকে দেখি। সে বললে—'আমি প্লে করব'; অবাক হয়ে গেলুম—বেশ অভিনয় করলে।

"অর্দ্ধেন্দু হচ্ছে national property; যেমন গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে, রূপো মালিনী, কেশো মালিনী। অদা মুস্তফীকে লোকে ভালবাসে, এ আমার আনন্দের কথা। সে আমার সহপাঠী, নাট্যগুরু। ছেলেবেলায় আমাদের আড্ডা ছিল; তাতে হয়তো অর্দ্ধেন্দু সাজত পূর্বদেশীয় কবিরাজ; আমরা নানা-দেশীয় রুগী—এইরকম। অর্দ্ধেন্দু চিরকালই যেটা পার্ট নয়, সেইটে নিত; He could create a part.

" 'নীলদর্পণের' গোলোক বসুর 'হুজুর, আমি কি শেখাবার মানুষ!'—এ আর কেউ বলতে পারে কিনা জানি না। পার্টে জীবন দেবার ক্ষমতা ছিল তার অপূর্ব।" ('নাচঘর', ৫ই আশ্বিন, ১৩৩৫)

দীনবন্ধু-পুত্র ললিতচন্দ্র উত্তরকালে লিখেছেন: "যখন বাগবাজারের দল 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, সেই সময় গিরিশচন্দ্র কোন কারণবশতঃ ঐ সম্প্রদায় হইতে তফাৎ হইলেন। শিখাইবার ভার অর্দ্ধেন্দুবাবুর উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হইল। তখন স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্রতী হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু তাঁহাকে সে পথ হইতে লইয়া আসিয়া নিজেদের দলভুক্ত করেন। বঙ্গের রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। অমৃতবাবু চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন না করায় বঙ্গে সুচিকিৎসকের অভাব হয় নাই; কিন্তু তিনি রঙ্গালয়ে যোগ না দিলে তাঁহার মত একাধারে উৎকৃষ্ট নট ও নাট্যকার আমরা পাইতাম না। বঙ্গের নাট্যসাহিত্য ও নাট্যশালা ইহার জন্য অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

"নীলদর্পণে অর্দ্ধেন্দুশেখর 'গোলোকচন্দ্র', 'সাবিত্রী' ও 'উডসাহেবের' ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে বাহির হন।* তিনটি বিভিন্ন প্রকারের ভূমিকা লইয়া সকলগুলিই দক্ষতার সহিত অভিনয় করা সামান্য ক্ষমতার পরিচয় নহে। কর্তা ও গিন্নী উভয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বলিতেন আমি 'নীলদর্পণে' একাধারে রামকৃষ্ণ হইয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে উডসাহেবের রূপে অনেকবার দেখিয়াছি, সে সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় একবার দেখিলে ভুলিতে পারা যায় না। …একবার গিরিশচন্দ্র উডসাহেব সাজিয়া পাঁচকড়িবাবুকে † জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কেমন হয়েছে?' পাঁচকড়িবাবু উত্তর দেন, 'বেশ হয়েছে বটে, কিন্তু মুস্তফী মশায়ের মত হয় নি।' গিরিশচন্দ্র কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া হাসিয়া কহিয়াছিলেন, 'দেখ, ওর মত সাহেব সাজতে বাঙ্গালী কেউই পারবে না'।" ('অর্দ্ধেন্দু-কথা' : 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক, ১৩২৭)

পরের শনিবারে (১৪ই ডিসেম্বর) দীনবন্ধুর 'জামাই-বারিক' মঞ্চস্থ হয়। অর্দ্ধেন্দু 'পদ্মলোচন' সাজলেন। সে রাতের অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৯এ ডিসেম্বর) লেখেন: "…ন্যাসনাল থিয়েটারে নীলদর্পণের অভিনয় দেখিয়া আমরা যেমন ক্রন্দন করি, গত শনিবারে জামাই-বারিক দেখিয়া তেমনি হাসিয়াছিলাম। জর্মেনীর পণ্ডিত সেলেগেল সেক্‌স্‌পীয়রকে লোকের নিকট চিনাইয়া দেন, এডিসন মিলটনকে প্রথম চিনাইয়া দেন এবং দীনবন্ধুবাবুকে ন্যাসনেল থিয়েটার অনেকের নিকট চিনাইয়া দিল। দীনবন্ধুবাবুর গুণ ইতিপূর্বে অনেকে জানিয়াছেন বটে, তাঁহার অনেক নাটকও ইতিপূর্বে অভিনয় হইয়াছে, কিন্তু এবার তাঁহার গ্রন্থনিহিত বস্তুগুলি যেরূপ জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিতেছে, ইতিপূর্বে আর কোথাও সেরূপ হইয়াছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা গতবারে লিখি যে, ন্যাসনাল থিয়েটার নীলদর্পণকে পূর্ণযৌবন প্রদান করিল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, জীবিত করিয়াছে লিখি।…

এবারকার অভিনেতৃগণ এক একটি রত্নবিশেষ। সকলের বিশেষতঃ পদ্মলোচন, বগলা ও বিন্দুর অংশ বড় অপূর্ব হইয়াছিল। ইঁহারা এক একটি বিষয় অভিনয় করিলেন, আর আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। কিন্তু ইঁহারা একটি বিষয়ের অভিনয় না করিয়া আমাদের বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ করেন। কামিনীর স্বামীর ভিটার উপরে পড়িয়া স্বামীর নিমিত্ত রোদন করা গ্রন্থের একটি অত্যুৎকৃষ্ট অংশ

* নীলদর্পণে অর্দ্ধেন্দুশেখর তিনটি নয়, চারটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। উপরে উল্লিখিত তিনটি অংশ ছাড়াও 'একজন রায়ৎ' সেজেছিলেন।

† বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবং সেইটি কামিনীর দ্বারা অভিনয় না করাইয়া ময়রানীর মুখে বলানতে একেবারে মাটি হইয়াছে। ফলে এটি গ্রন্থকর্তার ভুল এবং দীনবন্ধুবাবু উপস্থিত থাকিলে উহা বুঝিতে পারিতেন। আর একটি ভুল, দুই সতিনীর ঝগড়ার পর পদ্মলোচনের বগলার অঞ্চল ধরিয়া বাট্টার সঙ্গে নৃত্য ও গীত করা। পদ্মলোচনের পূর্বেকার চরিত্রের সঙ্গে এটি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন হইয়াছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, অভিনেতৃগণ এ অংশটি বাদ দিয়া অভিনয় করিবেন।" ( 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ—পৃঃ ৯২ থেকে পুনরুদ্ধৃত )

অর্দ্ধেন্দুর 'পদ্মলোচন' সম্বন্ধে দীনবন্ধু-পুত্র ললিতচন্দ্র লিখেছেন: "জামাই বারিকে অর্দ্ধেন্দু 'কর্তা' সাজিতেন। জামাইরূপে রামায়ণের কথকতা শুনিলে মোহিত হইতে হইত এবং মাণিকপীরের গানে হাসির ফোয়ারা ছুটিত। গান গাহিবার পূর্বে তিনি মুসলমানদের মত অঙ্গপ্রক্ষালনাদির যে ভঙ্গি দেখাইয়াছিলেন, তাহা বহুদিনের কথা হইলেও, আজও ভুলিতে পারি নাই।" ( 'অর্দ্ধেন্দু কথা': 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক ১৩২৭ )

২১এ ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ'-এর দ্বিতীয় অভিনয়। সে রাতের অভিনয়ের প্রশংসা ক'রে 'মধ্যস্থ' পত্রিকা লেখেন: "…কয়েকজন অভিনেতৃ এরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, যে, তাঁহাদের অঙ্গভঙ্গী ও বাক্যপ্রয়োগকে উচ্চশ্রেণীতে সন্নিবেশ করা যায়। অপর কয়েকজনের অভিনয় মধ্যবিধ। বস্তুতঃ নিতান্ত অপকৃষ্ট কেহই নন। 'এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্।'

"গোলোকচন্দ্র বসু, নীলকুঠির দেওয়ান, উডসাহেব, রোগ সাহেব, আমিন, মোক্তার, কবিরাজ, তোরাপ, রাইচরণ, গোপ, সাবিত্রী, রেবতী, ক্ষেত্রমণি, যাঁহারা এই কয়েকজনের বেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা।

"নবীনমাধব, সাধুচরণ, পণ্ডিত, দারোগা, চারিজন শিশু, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, পদী ময়রানী দ্বিতীয় শ্রেণী।

"অপর সকলে ইহাদের কাছাকাছি। তাঁহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণী বলা যায়।…"

"সবিদ্বান্ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই অভিনয় দর্শন করিয়া এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, অভিনয়ের পূর্বে তিনি মনে মনে অভিনেতৃগণের মধ্যে যাঁহার যেরূপ আকৃতি প্রকৃতির ঔচিত্য কল্পনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে প্রকার গঠনের লোক যেরূপ সজ্জায় যেরূপ ভঙ্গীতে যে সময় যে কথোপকথন করিবে আশা করিয়াছিলেন, অভিনয়কালে দেখিলেন, অবিকল সেইরূপ—ঠিক তাঁহার কল্পনানুরূপ হইয়াছে। এ প্রশংসা সামান্য গৌরবের নহে।…" ( 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ—পৃঃ ৯৩-৯৪ থেকে পুনরুদ্ধৃত )

২৮এ ডিসেম্বর 'সধবার একাদশী' অভিনয় হ'ল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র ( ২রা জানুয়ারি, ১৮৭৩ ) মতে—"অভিনয়টি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।" ( তদেব, পৃঃ ৯৯ থেকে পুনরুদ্ধৃত )

নাট্যশিক্ষাদাতা অর্দ্ধেন্দুশেখরের পরিচয় দিতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে লিখেছিলেন, "প্রথম সধবার একাদশীতে দরোয়ানদ্বয়কে যাহা শিখাইয়াছিলেন, সেরূপ কেহ পারে বলিয়া আমার ধারণা নাই।" ( নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' ) উত্তরকালে দীনবন্ধু-পুত্র ললিতচন্দ্রও এ প্রসঙ্গে লিখে গেছেন : "অর্দ্ধেন্দু যেমন উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন, সেইরূপ উচ্চশ্রেণীর অভিনয়-শিক্ষকও ছিলেন। শুনিয়াছি যখন গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু উভয়ে এক থিয়েটারে থাকিতেন, শিখাইবার ভার গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। তিনি বলিতেন, অর্দ্ধেন্দুর মত শিখাইবার ক্ষমতা আমাদের কাহারও নাই। যখন 'সঙ্গীত সমিতির' সভ্যগণ সধবার একাদশী অভিনয় করেন, সেই সময় আমি অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা দিবার প্রণালী দেখিয়াছিলাম। তিনি কাহাকেও শিখাইবার পূর্বে তাহার উক্তির মর্ম সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। এবং কিরূপ স্বরে ও ভাবে উক্তি আবৃত্তি করিতে হইবে দেখাইয়া দিতেন। আবশ্যক হইলে অপর উদাহরণ দ্বারা কিরূপভাব আনিতে হইবে বুঝাইয়া দিতেন। 'দরোয়ানদ্বয়ের' স্বর কেন ভিন্ন হইবে, তাহাদের মানসিক অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।" ( 'অর্দ্ধেন্দু কথা' : 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক, ১৩২৭ )

এলো নতুন বছর। ১৮৭৩।

দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' দিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের বছর শুরু হ'ল। সেদিন ৪ঠা জানুয়ারি, শনিবার। জলধরের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু। এই একটি পার্ট ক'রেই তিনি খ্যাতির তুঙ্গে উঠলেন। এ পার্টে তাঁর জুড়ি ছিল না। অমৃতলাল বসু বলেছেন—

"নবীন তপস্বিনীর জলধর-ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু শত্রু-মিত্রের হৃদয় জয় করিয়াছিল।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন—

"প্রতি গ্রন্থে অর্দ্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়। তন্মধ্যে নবীন তপস্বিনীর জলধরের অভিনয় অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়। নাটোরাধিপতি উচ্চহৃদয় রাজা চন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে বিভোর হইয়াছিলেন বলিলে ঠিক বলা হয় না।" ( 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' )

নাটকের যে-দৃশ্যে জলধর-রূপী অর্দ্ধেন্দু কবিতা রচনার চেষ্টা করছেন সেই দৃশ্যের অভিনয়ের বর্ণনা গিরিশচন্দ্রের ভাষায়—

"অর্দ্ধেন্দুশেখর গ্রন্থকারের কথায় যোগদান করিয়া নাটকের উৎকর্ষ সাধন করিতেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই—নাটকে জলধর কবিতা রচনা করিয়াছেন,—

'মালতী মালতী মালতী ফুল
মজালে মজালে মজালে কুল।'

জলধর-অর্দ্ধেন্দু কবিতার একছত্র রচনা করিয়াছেন—

মালতী মালতী মালতী ফুল

মিলশুদ্ধ দ্বিতীয়ছত্র আর হইয়া উঠিতেছে না—নানা প্রকারে চেষ্টা হইতেছে, বহু কষ্টে দ্বিতীয় ছত্র রচিত হইল—

বিঁধেছে পাপ্‌ড়িতে বোল্‌তার হুল্‌

কিন্তু ছত্রটি জলধরের মনোনীত হইতেছে না। কারণ 'পাপড়ি' এ কথাটি 'বিঁধেছে'র দিকে দেওয়া যায়, কি বোলতার হুলের দিকে দেওয়া যায়? এই পাপ্‌ড়ি এদিকে কি ওদিকে দেওয়া যাইবে, ইহার আলোচনা পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল। পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে—উঁহু জলধরের মনোনীত হয় না। শেষে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় মনে উঠিল,—

মজালে মজালে মজালে কুল।

যখন পাপড়ি লইয়া ব্যাকুল, তখন দর্শকে হাসিয়া আকুল।" (তদেব)

আমাদের থিয়েটারের আদিযুগের অভিনেত্রীকুলরাণী বিনোদিনীও এই দৃশ্যের অভিনয় সম্বন্ধে লিখেছেন—

"এই জলধর সেজে অর্দ্ধেন্দুবাবু

মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥

এই দুটি চরণ বলতে বলতে স্টেজে এমনি অঙ্গভঙ্গী ক'রে ঘুরে বেড়াতেন যে, সে এক অপরূপ দৃশ্য, সে এক বিচিত্র চিত্র। সে লিখে বোঝাবার নয়, তখনকার জলধর না দেখলে কারুর মুখে বা কারু লেখা পড়ে তা ধারণা করাই অসম্ভব।" ('আমার অভিনেত্রী জীবন')

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'অর্দ্ধেন্দু-জলধর' সম্বন্ধে উত্তরকালে লিখেছেন—

"দৃশ্যকাব্যের বাক্যাবলীর মধ্যে যাহা অনুক্ত থাকিয়া যায়, তাহা ধরিয়া লইয়াই অভিনয় করিতে হয়। জলধর সুপণ্ডিতের ন্যায় অনায়াসে কবিতা রচনা

করিতে পারিলে, কবির চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িত। অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দুশেখর যেভাবে কবিতা রচনার প্রয়াস এবং প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতেন, তাহা কেবল হাস্যোদ্দীপক নয়, প্রত্যুত প্রকৃত . অভিনয়কলার উৎকর্ষ-জ্ঞাপক,— অভিনেতার অসাধারণ প্রতিভাব্যঞ্জক,—কবিবাক্যের বিশদ ভাষ্যরূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। এরূপ অভিনয়কৌশল অর্দ্ধেন্দুশেখরই প্রথমে প্রদর্শিত করিয়া ছিলেন।" ( 'অর্দ্ধেন্দুশেখর' : 'সচিত্র শিশির, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ )

দীনবন্ধু-পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র লিখেছেন : 'নবীন তপস্বিনী'তে জলধরের অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুর ক্ষমতা ষোলকলা পূর্ণ হইয়াছিল। সে-অভিনয় নাট্য-জগতের বিজয়-নিশান। সে অভিনয় যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের একটি অভাব রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার চালচলন, ভাবভঙ্গি, কথা ও স্বর, সকলই যেন পূর্ণ সুষমায় শোভিত হইয়াছিল। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, অর্দ্ধেন্দুবাবুর জলধরের অভিনয়ে মৃত মানুষকেও হাসিতে হয়। সকলেই জানেন, তিনি সুবিধামত নাটকের ভাষা কিছু পরিবর্তন করিতেন। জলধর যেখানে মল্লিকাকে কহিয়াছেন, 'মল্লিকে, তোমার কথাগুলি যেন আকের টিকলি', অর্দ্ধেন্দু বলিতেন, 'মল্লিকে, তোমার কথাগুলি যেন গোলাপি গাণ্ডেরি।' আর একটি পরিবর্তনের কথা বলিব। গুরুপুত্র 'ভূতবাসরঃ যো যো ঘণ্টা কেলিকুঞ্চিকা ভিন্দিপালঃ ব্যাখ্যা করিলেন, 'ভূত বাসর অর্থে বয়ড়া, যো যো ঘণ্টা অর্থে হাতির গলায় ঘণ্টা, কেলিকুঞ্চিকা বলে শ্যালীকে, অর্থাৎ স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী, ভিন্দিপাল অর্থে দেড়হাত খেটে, অর্থাৎ ভিন্দিপাল বল্লেই দেড়হাত লম্বা একটি খেটে বোঝায়, পাঁচ পোয়া সাত পোয়া নয়।' জলধর-রূপী অর্দ্ধেন্দু বলিলেন, 'ইহার আর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।' পণ্ডিতবৃন্দ বলিলেন, 'কি ?' তিনি উত্তর করিলেন, 'ভূতবাসর কিনা—ভূতোর বিয়ে হচ্ছে, বাসরঘরে নিয়ে গেছে, যো যো ঘণ্টা হাতির গলার ঘণ্টাই বটে, কারণ একটি দীর্ঘকায় প্রাচীন পুরুষের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র বালিকার বিয়ে হচ্ছে, কেলিকুঞ্চিকা স্ত্রীর ভগিনীই, তবে কনিষ্ঠা নয় জ্যেষ্ঠা, ভিন্দিপাল কিনা খেটে অর্থাৎ ভূতো বাসরে বয়স্থা শ্যালীগণের সঙ্গে অযথা প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হ'লে তার শ্যালকগণ ভিন্দিপাল নিয়ে অগ্রসর হলেন।' যদিও এসকল অনেকেই অনুমোদন করিতেন, তথাপি কখন কখন মাত্রা ঠিক রাখিতে না পারায় অর্দ্ধেন্দু রসজ্ঞের বিরাগভাজন হইতেন। তাঁহার অভিনয়ে আমিও স্থলবিশেষে এরূপ বিরাগ অনুভব করিয়াছি। সত্যের খাতিরে তাহার উল্লেখ আবশ্যক বোধ করিলাম।" ( 'অর্দ্ধেন্দু-কথা' : 'মানসী ও মর্মবাণী,' কার্তিক, ১৩২৭ )

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন: "নবীন তপস্বিনীর জলধরের ভূমিকাই অর্দ্ধেন্দুকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। যদি অর্দ্ধেন্দু রঙ্গালয়ে এক জলধরের ভূমিকা ব্যতীত অপর কোন ভূমিকা অভিনয় না করিতেন তাহা হইলেও তিনি ঐ এক ভূমিকা অভিনয় করিয়াই নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকিতেন।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর' পুস্তিকা, ১৩২৭)

পরের শনিবার (১১ই জানুয়ারি) 'লীলাবতী' অভিনয় হয়। এতদিন পর্যন্ত সপ্তাহে একদিন মাত্র অর্থাৎ প্রতি শনিবারে অভিনয় হচ্ছিল। 'লীলাবতী' অভিনয়ের পর থেকে সপ্তাহে দু'দিন অর্থাৎ বুধবারে আর শনিবারে অভিনয়ের আসর বসাবার বন্দোবস্ত হয়। প্রম্‌টিং আর প্যাণ্টোমাইম্ দেখানোর রেওয়াজও চালু হয় এই সময় থেকে। এই নতুন বন্দোবস্তে প্রথম বুধবারের অভিনয় হয় ১৫ই জানুয়ারি। সেদিন দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অভিনীত হ'ল। অর্দ্ধেন্দু 'রাজীব' সাজলেন। তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে 'মধ্যস্থ' পত্রিকার মন্তব্য—

"রাজীবের অভিনয় সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ও হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল। গৃহে বসিয়া পাঠ, অতিথির সহিত প্রসঙ্গতঃ আপন বৃদ্ধদশার কথা অর্ধোক্তিতে বলিয়া আপনা আপনি অপ্রস্তুত হওয়া, এবং ঘটকরাজের সহিত কথোপকথন ও তাৎকালিক অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি দেখিয়া আমাদের এমত ভ্রম হইয়াছিল যে, আমরা যেন প্রকৃত ঘটনাস্থলেই উপস্থিত আছি।" ('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ—পৃ ১০৩ থেকে পুনরুদ্ধৃত)

'রাজীব'-এর ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুর চিত্তগ্রাহী অভিনয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা ক'রে 'G' স্বাক্ষরে জনৈক অভিনয়-রসিক দর্শক (গিরিশচন্দ্র?) 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজে একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রটি ২৩ এ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হয়। সেই পত্রের অংশবিশেষ—

"Sir···First of all came in the Bia Pugla Booro Bar. The principal character in the farce, Rajeeb Baboo, was represented by Audhoredro [Ardhendu] Mustuphy. From his first appearance on the stage, the applause was general and uninterrupted. It were endless to describe each particular beauty of the performances of the exquisite actor. The manner in which he rushed in, pursued by a gang of wicked country lads who pelted him with two lines of poetry for which he had a particular aversion, and restored to them

with the full-mouthed asperity of a monomaniac, was admirable. Those to whom it has ever fallen to attempt an imitation of the ways and habits of other, must know how its difficulty increases in proportion to the oddity of those ways, and their dissimilarity to truth and nature, as we find them about us···The eye, the action, the changes of voice and expression, the slow gait, the feeble motion, and the assembled vivacity were exactly what one would expect to find them. But the master was 'in his art' when, lying down alone in his bed, he expatiated in a beautiful and wellpla nned soliloquy on the prospect of the forthcoming nupitals, which opened on him like a new Elysium···Yours truly G. The 16th Jany. 1873. (Quoted in Brajendra Nath Banerjee's 'Bangiya Natyashalar Itihas', 4th edition, p. 106)

ঐ দিনই 'মুস্তফীসাহেব-কা পাক্কা তামাশা' নামক বিখ্যাত পঞ্চরং প্রথম প্রদর্শিত হয়।

সে সময়ে দেবকার্সন নামে এক ইংরেজ কৌতুকাভিনেতা অপেরা হাউসে (এখনকার গ্লোব সিনেমা) প্যান্টোমাইম্ দেখাতেন। সাহেব 'ইংলিশম্যান' কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেন—Dave Carson Sahib Ka Pucka Tamasha। সাহেবের The Bengalee Baboo, Professor, The School Master, Dave Carson in the Police Court প্রভৃতি পঞ্চরং ফিরিঙ্গি মহলে খুবই উপভোগ্য বস্তু ছিল। দেবকার্সন বাঙালীদের বিদ্রূপ করতেন এই গান গেয়ে—

I am a very Bengalee Baboo
I keep my shop at Radha Bazar,
I live in Calcutta, eat my Dal Vat
And smoke my Hooka ইত্যাদি।

স্বাভাবিক অর্দ্ধেন্দুশেখর ইংরেজি-হিন্দী মিশ্রিত ভাষায় একটি গান রচনা ক'রে দেবকার্সনকে পাল্টা জবাব দিলেন। গানটির নাম 'মুস্তফীসাহেবকা পাক্কা তামাশা'। অর্দ্ধেন্দু তিনজন সহ-অভিনেতা নিয়ে কাফ্রি সাহেব সেজে বেহালা বাজাতে বাজাতে উক্ত গানটি গেয়ে ফিরিঙ্গিদের বিদ্রূপ করলেন—

The merry Christmas is at hand
Sherry Champagne let us try
And how 'twill be a jolly land
When pegs begin to fly.

Oh what a cheerful eve
Let us all the high way cry
And how happily we shall live
When pegs begin to fly.

হাম বড়া সাব হ্যায় ডুনিয়ামে
None can be compared হামারা সাট
Mr. Mastafec name হামারা
চাটগাঁও মেরা আছে বিলাট—
Rom-ti-tom-ti-tom etc.

গর্ কি মালেক আদ্‌মি কি মালেক
Lord of all hy—ham—
নেই সক্তা নিগস´বাট্ মেরা tolerate
চণাম গলি মেরা ধাম—
Rom-ti-tom-ti-tom etc.

Dirty Niggers I hate to see
বড়া ময়লা উঃ বাপরে বাপ
Holway pills হাম কায়েঙ্গে রাটকো
Health রাখনে মেরা সাফ্
Rom-ti-tom-ti-tom etc.

Coat পিনি Pantaloon পিনি, 'পিনি মোর trousers
Every two years new suits পিনি
Direct from Chandny Bazar—
Rom-ti-tom-ti-tom etc.

চিংড়ি fish and কাঁচাকেলা the only Hazree once I eat
চারপাই is my palang-posh, Morah is my royal seat
Rom-ti-tom-ti-tom etc.

Chorus—

I am a gentleman.

কথিত আছে, দেবকার্সন এ জবাবে খুবই খুশি হয়েছিলেন। এই রঙ্গাভিনয়ের পর, অর্দ্ধেন্দুশেখরকে লোকে 'সাহেব' বলত। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন,—

"দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা, তাহা নয়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একক, দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে, দৃশ্যপট, অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হয় না। বহুদিন পূর্বে কলিকাতায় দেবকার্সন নামক এক ইংরাজ এই উচ্চশক্তির নিম্নস্তরস্থ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ইংরাজমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দুকে লোকে সাহেব বলে, তাহার কারণ দেবকার্সন যেমন বাঙ্গালীবাবু লইয়া ঠাট্টা করিতেন, অর্দ্ধেন্দুও তেমনি পূর্বোক্ত প্রথম স্থাপিত ন্যাসন্যাল থিয়েটারে 'সাহেব' সাজিয়া বেহালা হাতে গান করিতেন,···Variety Theatre অর্থাৎ যে স্থলে নানাবিধ রসের কৌতুককলাপ হইয়া থাকে, এরূপ থিয়েটারের দর্শক বাঙ্গালায় যথেষ্ট নাই। এরূপ দর্শক থাকিলে, অর্দ্ধেন্দু একক অল্প সাহায্য লইয়া 'দেবকার্সনের' ন্যায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেন।" ( 'নট চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' )

১৮ই জানুয়ারি, শনিবার, নবীনতপস্বিনীর পুনরভিনয়ের পর বিজ্ঞাপনে খবর বেরুল পরের বুধবার ২২এ জানুয়ারি তারিখে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' মঞ্চস্থ হবে। কিন্তু সেদিন মঞ্চের পাদপ্রদীপ জলে নি। কারণ, অর্থঘটিত ব্যাপারে ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিবাদ। সালিশীর জন্যে নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, হেমন্তকুমার ঘোষ, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল পাল আর রাজেন্দ্রনাথ পালকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। উনিশ তারিখে কমিটির বৈঠক বসে। চব্বিশ তারিখের বৈঠকে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনারারি সেক্রেটারির পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে মতিলাল সুরকে উক্ত পদে বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু শেষে একটা বোঝাপড়া হয় এবং সাময়িকভাবে বখেড়া মিটে যায়। নগেন্দ্রনাথ পুনর্বহাল হন।

পঁচিশে জানুয়ারি থেকে পূর্ববৎ অভিনয় শুরু হয়। সেদিন 'নব-নাটক'-এ অর্দ্ধেন্দু সাজলেন গবেশবাবু। এই নাটকের অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুর ভূমিকা সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু বলেছেন,—

"বহুরূপী অর্দ্ধেন্দুশেখর কর্তা সাজিয়া যে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে এখনও আমার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে, আমার দৃঢ় ধারণা, এইটিই অর্দ্ধেন্দুর masterpiece। পূর্বে অক্ষয় মজুমদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে যথেষ্ট বাহাদুরি দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু যেন 'কর্তা'-কে

নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। অর্দ্ধেন্দুর মুখে শুনিয়াছি যে অক্ষয়বাবুর অভিনয় দেখিয়া তাঁহার ঐ ভূমিকায় অভিনয় করিবার সাধ হয়। অক্ষয় মজুমদার তাঁহার আদর্শ ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার আদর্শকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন।" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

'নব-নাটক' অভিনয়ের কয়েকদিন পরে ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টার নিযুক্ত হলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ আর গিরিশচন্দ্র। থিয়েটারের কার্যালয় ভুবননিয়োগীর বৈঠকখানা থেকে স্থানান্তরিত হ'ল বাগবাজারের নেবুবাগানে, ১১নং আনন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে।

১লা ফেব্রুয়ারি 'নীলদর্পণ'-এর তৃতীয় অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের অভিনয়-আসরে অর্দ্ধেন্দুর অনুপস্থিত থাকার কারণ সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু বলেন,—

"অর্দ্ধেন্দুর কিছু টানাটানি ছিল; তাহাকে প্রায়ই টাকা দিতে হইত। নীলদর্পণের তৃতীয় অভিনয়-রজনীতে অর্দ্ধেন্দুর অদর্শনে আমরা অস্থির হইয়া পড়িলাম, কোনও রকম করিয়া যোগেন্দ্রনাথ মিত্রকে দিয়া তাঁহার কাজ চালাইয়া লইলাম। পরদিন প্রাতে অর্দ্ধেন্দুর বাড়ি গিয়া তাঁহার পিতা ৺শ্যামাচরণ মুস্তফী মহাশয়ের হস্তে নগেন বন্দ্যোপাধ্যায় চল্লিশটি টাকা দিয়া আসিলেন।…ইহার জন্য অর্দ্ধেন্দুকে দোষ দিতে পারি না। থিয়েটারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে গিয়া তিনি নিজের সংসারের প্রতি দৃক্‌পাত করিবার অবসর পান নাই। তাঁহারা পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ি হইতে বরাবর মাসে মাসে যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয়ের পর হইতেই তাহা বন্ধ হইয়া গেল। সুতরাং থিয়েটারের জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। যদি আমরা তাঁহার অর্থাভাব মোচনের চেষ্টা না করিতাম তাহা হইলে আমাদের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হইত।" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

পরের শনিবারে ( ৮ই ফেব্রুয়ারি ) 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রোপেয়া' নাটকে 'ছাতুলাল'-এর ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। গিরিশচন্দ্র লিখছেন,—

"ক্রমে ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নয়শো রোপেয়া' অভিনয় হইল। যাঁহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজি থিয়েটারে ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সম্মুখে, অর্দ্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন যে, নয়শো রোপেয়ায় 'ছাতুলালের' ভূমিকায় এই বাবুটির অভিনয়

যাহা দেখিলাম, তাহা-যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।…অর্দ্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন তাহাই অননুকরণীয় হইত। …'নয়শো রোপেয়া'র ছাতুলাল, সধবার একাদশীর নিমচাঁদের অনুকরণ! নিমচাঁদ মূর্খ ও গাঁজাখোর হইলে যেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছাতুলাল তাই। এ গাঁজাখোর নিমচাঁদের ন্যায় হৃদয়বান ও উচিত বক্তা, নিমচাঁদের মদের গ্লাসের ন্যায় গাঁজার হুঁকো হাতে করিয়া অভিনয় করিতে হয়। অর্দ্ধেন্দু-ছাতুলালের গাঁজার কল্কে হইতে হঠাৎ আগুন পড়িয়া গেল। এই—যাহার সহিত অভিনয় হইতেছিল, তাহার প্রতি ছাতুলালের তাড়না :—'হামারা পা পুড়িয়ে যাতা হ্যায়, তোম্ দেখতা নেই ?' তাড়িত অভিনেতা অবাক! তাহার ভূমিকায় (part) তো এরূপ কথা নাই। ছাতুলালের তাড়না বাড়িল, সে পলাইবার চেষ্টা করে, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া অভিনয় চলিল।° ( 'নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী' )

পর-সপ্তাহে ( ১৫ই ফেব্রুয়ারি ) 'জামাই বারিক'-এর দ্বিতীয় অভিনয় ও তারপর কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ভারতমাতা' নামক একটি রূপক-নাট্যের (mask) একটি দৃশ্য অভিনীত হয়। ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাঁরা লেখেন,—

"…গত শনিবার ন্যাশনাল থিয়েটরে জামাই বারিক প্রহসন অভিনয়ের পর 'ভারত-মাতার একটি দৃশ্য' প্রদর্শিত হইয়াছিল। দৃশ্যের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি যে, উহা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছিলেন। কোন অভিনয়ে পঞ্চশতাধিক লোকের ১৫ মিনিট কাল পর্যন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তম্ভিতভাব আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। শ্রোতৃগণের দীর্ঘনিঃশ্বাস ও রোদন ধ্বনিতে কেবল মধ্যে২ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। সেদিন ন্যাশনাল থিয়েটরে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে এমন একটি ভাব অর্জন ও এমন একটি শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন, যাহা কস্মিনকালে বিনষ্ট হইবে না। রঙ্গভূমি যেরূপ সমাজের সংস্কারক, সেইরূপ আবার উহা সমাজের শিক্ষক। আমাদের আশা হইতেছে যে, ন্যাশন্যাল থিয়েটর এই দুইটি মহৎ কার্য সাধনে সক্ষম হইবে।" ( 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ—পৃঃ ১১০ থেকে পুনরুদ্ধৃত )

এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে যা লিখেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য—

"অর্দ্ধেন্দুর স্বদেশ-অনুরাগও বিশেষ পুষ্ট ছিল। 'ভারতমাতা' প্রভৃতি ন্যাসানাল থিয়েটারে যাহা অভিনীত হইয়াছিল, সে সমস্ত অর্দ্ধেন্দুর প্ররোচনায়। যে সকল

পঞ্চরং অভিনীত হইত, তাহাতে বিশেষ রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল এবং তীব্র ব্যঙ্গ-শক্তিতে ঐ সকল পঞ্চরং রচিত না হইলেও অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে সেই শ্লেষের পূর্ণ বিকাশ হইত। অর্দ্ধেন্দুর ধারণা ছিল যে, রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক করা যায়, অনেক কদাচারী দমিত হয়; নীতিশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা, রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া যায়, রঙ্গমঞ্চের কার্য—দেশের কার্য—তাঁহার জ্ঞান ছিল।" ( 'নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' ) ।

১৬ই ফেব্রুয়ারি হিন্দুমেলার সপ্তম অধিবেশনে পাইকপাড়ার উত্তরে নৈনানস্থ হীরালাল শীলের বাগানে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক 'ভারতরাজলক্ষ্মী' ও অন্যান্য নাটকের ( 'নীলদর্পণ' প্রভৃতির ) নির্বাচিত দৃশ্য অভিনীত হয়।

অতঃপর ন্যাশনাল থিয়েটারে মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করা স্থির হয়। কিন্তু কথা উঠলো—ভীমসিংহ সাজবে কে? শেষে স্থির হ'ল গিরিশচন্দ্র সাজবেন কিন্তু বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম থাকবে না। গিরিশচন্দ্র লিখছেন :

"...যখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইয়াছিল, তখন আমায় যোগ দিতে হয়। ভীমসিংহের ভূমিকা আমার উপর অর্পিত হইল। বর্ণিত মতভেদ এই সময় কিছু কিছু বিস্তৃত হইয়া বিচ্ছেদের আকার ধারণ করে। আমি আমার নাম (Amateur) বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় করিতে অসম্মত হই। অর্থলোভী ব্যক্তিরা আমার যোগদানে তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না, এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি করিলেন। অর্দ্ধেন্দুকেও সে আপত্তি বুঝাইতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞাপিত না হইয়া আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে আপত্তি করায় ভীমসিংহ—By a distinguished amateur প্ল্যাকার্ডে প্রকাশিত হয়।" ( 'নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' )

২২এ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হ'ল 'কৃষ্ণকুমারী'। সাধারণ মঞ্চে গিরিশচন্দ্রের সেই প্রথম আবির্ভাব। ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র। অন্যান্য ভূমিকার শিল্পী : ধনদাস—অর্দ্ধেন্দু, সত্যদাস—মতি সুর, বলেন্দ্র সিংহ—নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগৎসিংহ—কিরণ বন্দ্যো, কৃষ্ণকুমারী—ক্ষেত্র গঙ্গো, অহল্যা—মহেন্দ্র বসু, মদনিকা—অমৃত বসু, বিলাসবতী—বেলবাবু।

সে রাত্রে প্রত্যেকটি শিল্পী নিখুঁত অভিনয় করেছিলেন। মাইকেল অসুস্থাবস্থায়ও তাঁর নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। অভিনয়ান্তে তিনি গিরিশ অর্দ্ধেন্দুর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে কোলে তুলে নাচতে নাচতে তিনি বলেছিলেন—Krishnakumary you have done to perfection).

গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব অভিনয়ে প্রস্ফুটিত ভীমসিংহের ভাগ্যহত জীবনের শোচনীয় মর্মান্তিকতা দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়ে অনাস্বাদিতপূর্ব ভয় ও বিস্ময়মিশ্রিত এক গভীর ট্র্যাজিকরসের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। ভীমসিংহের অভিনয়ে 'মানসিংহ মানসিংহ মানসিংহ! হুঁ। তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চললেম'—এই অংশে গিরিশচন্দ্র প্রথম মানসিংহ এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যেন নামটি ক্ষিপ্ত ভীমসিংহের মস্তিষ্কে দুঃস্বপ্নের ছায়ার ন্যায় পড়লো, দ্বিতীয় মানসিংহের উচ্চারণে বোধ হ'ল যেন সেই ছায়া কিঞ্চিৎ দীপ্তি পেয়েছে—যেন কি দুর্ঘটনা মনে পড়ছে; তৃতীয়বারে ক্ষিপ্ত রাজার স্মৃতিপটে শত্রু মানসিংহ সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল, এই শেষের মানসিংহ দেখামাত্র কোষ থেকে অসি উন্মোচন ক'রে ভীমসিংহরূপী গিরিশচন্দ্র তাকে বধ করতে ছুটতেন। তৃতীয়বারের মানসিংহ নাম এমন গম্ভীরনাদে উচ্চারিত হ'ত যে, দর্শকরা ভয়বিহ্বল হয়ে পড়তেন। এই দৃশ্যেই কন্যাশোকাতুরা রানী অহল্যাকে ভীমসিংহ ক্ষিপ্ত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করতেন, 'মহিষী যে! দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছো? কৈ?'—এই অংশে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে ক্রন্দন থাকতো না। কৃষ্ণা যেন কোথায় গেছে—ভীমসিংহ তাঁর প্রিয়তম কন্যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—গিরিশচন্দ্র এই রকম অভিনয় করতেন।

সংস্কৃত নাটকে ও আগেকার যাত্রার পালায় ট্র্যাজেডির অবতারণা নিষিদ্ধ। তাই ট্র্যাডিসনের অভাবে বাঙালীর ভাবালু গীতিপ্রবণ প্রকৃতি তখনও ট্র্যাজিক অভিনয় রীতির সন্ধান পায় নি। কিন্তু কমিক অভিনয়ে বাঙালী অভিনেতারা তখনই যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত কেশবচন্দ্র-অক্ষয়কুমার-অর্দ্ধেন্দুশেখর। গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম আমাদের দেশের নাট্যক্ষেত্রে ট্র্যাজিক অভিনয় রীতির ধারা বহন করে নিয়ে আসেন। 'ভীমসিংহ' সেই ধারার উৎসমুখ খুলে দেয়।

'ধনদাস' অর্দ্ধেন্দুশেখরের একটি অনুপম শিল্প সৃষ্টি। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অর্দ্ধেন্দুর 'ধনদাস' দেখে উত্তরকালে লিখেছিলেন,—

"যে-দৃশ্যে হৃতসর্বস্ব ধনদাস ছিন্নবস্ত্রে মলিনবদনে রাজপথপার্শ্বে উপবিষ্ট, তাহার অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দুশেখর কোনোরূপ বাক্যব্যয় বা অঙ্গচালনা না করিয়া, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া, কেবল সাত্ত্বিকাভিনয়ে দর্শকচিত্ত অশ্রুসিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে মানবপ্রকৃতির কিরূপ অন্তস্তলদর্শী ছিলেন, তাহা তাঁহার অভিনয়ে নিয়ত অভিব্যক্ত হইলেও, এই উপলক্ষে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। সেরূপ অভিনয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকটেও আর কখনও দর্শন করিতে পারি নাই। যাহা কবির প্রাপ্য, কেবল সেইটুকুই ব্যক্ত করিয়াই অভিনেতা প্রশংসা লাভ

করিতে পারেন। যাহা কবি লিখিয়া ব্যক্ত করেন নাই, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলে, অভিনেতার গৌরব কত অধিক হইয়া পড়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর তাহা অনেকবার দেখাইয়া গিয়াছেন।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর': 'সচিত্র শিশির', ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১)

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন:

"'কৃষ্ণকুমারীতে' ধনদাসের অংশে উচ্চহাস্যোদ্দীপক কথা কিছু নাই। অভিনয় করিতে করিতে অর্দ্ধেন্দু কিছু বিরক্ত। রঙ্গমঞ্চে বলেন্দ্র সিংহ আছে, মরুদেশের রাজার দূতের সহিত ধনদাসের বাদানুবাদ চলিতেছে, বলেন্দ্রসিংহ উভয়কে উৎসাহদানে বাদানুবাদ বাড়াইতেছেন। ধনদাস-অর্দ্ধেন্দু দেখিলেন, তেমন হাসিতো হয় না,—আর মরুদেশের দূত কোথায় যাইবে, মাথায় দুই থাপ্পড়। মরুদেশের দূত তো রাগিয়া প্রস্থান করেন, বলেন্দ্র সিংহ অবাক হইয়া দাঁড়ান, জয়লাভ করিয়া ধনদাস কলাপাতার ভেঁপু পোঁ করিয়া ফুঁকিয়া বিজয় ঘোষণাপূর্বক চলিয়া গেলেন। অনেকে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন যে এরূপ ভাল নয়। কিন্তু ধনদাসের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত, যেরূপ তাহাকে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তাহাতে এ বর্বরতায় চরিত্র অনুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ধনদাসের ভূমিকা বটে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু-ধনদাস, ইহা প্রকাশ পাইল। এরূপ করায় কখনও যে ক্ষতি না হইত, তাহা নয়, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু দর্শকের এতদূর প্রিয় ছিলেন, যে ক্ষতি বৃদ্ধি গণ্য হইত না। আমোদের স্থলে আমোদই হইত।" ('নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী')

ইতিমধ্যে বর্ষাসমাগমে সান্যালবাড়ির উঠোনে অভিনয় চালানো অসম্ভব হওয়ায় ২৬এ ফেব্রুয়ারি, বুধবার 'নীলদর্পণ'-এর চতুর্থ অভিনয়ের পর ৮ই মার্চের 'ইংলিশম্যান' কাগজে বিজ্ঞাপন মারফৎ জানানো হ'ল ৮ই মার্চের অভিনয়ই ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় রজনী। সে রাতে অভিনীত হ'ল মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' ও অন্যান্য প্যান্টোমাইম।

যবনিকা-পতনের পূর্বে বিহারীলাল বসু (জ্যাঠা বিহারী) নারীবেশে পাদপ্রদীপের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে দর্শকবৃন্দকে উদ্দেশ ক'রে গিরিশচন্দ্র রচিত একটি মর্মস্পর্শী বিদায়কালীন সঙ্গীত গাইলেন—

কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধিব্রজ ভুলোনা আমায়॥

এ সভা রসিক মিলিত
হেরিয়ে অধীনী চিত
আধ পুলকিত
আধ হুতাশে শুকায়।
অস্তগামী দিনমণি
যেমতি হেরি নলিনী
আধ ধনি বিমলিনী,
আধ হাসি চায়॥
মম প্রতি ঋতুপতি
হয়েছে নিদয় অতি ;
হাসাইছে বসুমতী
আমারে কাঁদায়।
নির্মাইয়ে নাট্যালয়,
আরম্ভিব অভিনয়
পুনঃ যেন দেখা হয়
এ মিনতি পায়॥

অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় এই বিদায়-দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

"গান শেষ হইল। দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হইয়া আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন। মধুচক্রে লোষ্ট্রক্ষেপ করিলে মক্ষিকার দল যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গুণ গুণ করিতে থাকে, তদ্রূপ সেই দর্শকমণ্ডলী অস্ফুট কলরব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন—'কেন তোমরা বন্ধ করবে? কেন তোমরা বিদায় চাও? তোমাদের ভুলব কেন? যেখানে অভিনয় করবে আমরা আস্‌ব বৈকি।'" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে নটলীলা (১৮৭৪-৭৫)

ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। মূলকারণ দুটি—বর্ষা আর টাকাকড়ি। গিরিশচন্দ্র সেই কথাই লিখেছেন—

"বর্ষার আগমনে জোড়াসাঁকোর সান্যাল-বাড়ির প্রাঙ্গণে অভিনয় করা অসম্ভব হওয়ায় ন্যাসান্যাল থিয়েটার বন্ধ হয়। প্রকৃত বিবাদ এই সময়। অর্জিত অর্থ

কোথায় থাকিবে, সাজ-সরঞ্জাম কে রাখিবে?—বিবাদ এই লইয়া।" ('নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী')

অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিবৃতি—

"সান্যাল-বাড়িতে টিকিট বেচে থিয়েটার করবার পর আমরা টাকার মুখ দেখলেম এবং যে-ভাবে উপার্জন করা গেল, তাতে প্রলোভনই জেগে উঠল। তা ছাড়া খরচপত্রেরও প্রয়োজন হ'তে লাগ্‌ল। নগেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন থিয়েটারের আয় থেকে আমাদের খরচপত্র দেওয়া হোক। ক্রমে তাও শুরু হ'ল; কিন্তু তাতে হ'ল না। কারও দু-এক টাকা বেশী হ'লে অপরে বিরক্ত হ'তে লাগ্‌ল। তখন একদিন নগেন্দ্রবাবু, অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুর আর আমি—আমরা চার জনে কর্তব্য বিচার করতে বসলেম। নগেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন—এস, আমরা চার জনে স্বত্বাধিকারী ব'লে প্রচার করি। ধর্মদাসবাবু অস্বীকার করলেন; বল্‌লেন, সকলে মিলে পরিশ্রম ক'রে জিনিসটা করা গেল, একা আমরা তা গ্রাস করি কেন? ক্রমে এই অর্থের কথা নিয়ে অনর্থ বেধে উঠ্‌ল। আমরা দু-দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেম। নগেন্দ্রবাবু, অমৃতবাবু আর আমি এক দলে; ধর্মদাসবাবু, মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু আর এক দলে প্রধান হয়ে পড়লেন। ধর্মদাসবাবু ম্যানেজার ছিলেন, তাঁরই হাতে টাকাকড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল। তিনি সে-সমস্ত নিয়ে গিরিশবাবুর শরণ নিলেন।...মার্চ মাসের শেষ অভিনয়ের পর আমরা বৃষ্টির ভয়ে সান্যালদের বাটী হইতে স্টেজ উঠাইয়া আনিলাম। পথে মুটের মারফৎ স্টেজ চালান দিয়া নগেন্দ্রবাবু ও আমি অন্য কাজে গেলাম। দু-এক ঘণ্টা পরে বাটী আসিয়া দেখিলাম যে, স্টেজ শোভাবাজারের রাজবাড়ির নাট-মন্দিরে চালান হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ধর্মদাসবাবু ও মতিবাবুর নিকট লোক পাঠাইলাম। তাঁহারা কহিলেন, 'আমাদের নিকট স্টেজ থাক, তোমাদের কাছে ড্রেস আছে।' ফলতঃ ইহার পূর্বে পরস্পরে কিছু কিছু মনোমালিন্য হইয়াছিল। সে-সকল বিষয় বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা গেল না।" ('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১১৫ থেকে পুনরুদ্ধৃত)

অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিবৃতির সঙ্গে ধর্মদাস সুরের বিবৃতির আংশিক সাদৃশ্য আছে। তিনি তাঁর 'আত্মজীবনী'-তে ('নাট্য-মন্দির', ভাদ্র, ১৩১৭) এই ব্যাপারে উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—

"...আশার অতিরিক্ত পয়সার আমদানি হইতে লাগিল, অমনি সন্দেহ জন্মিল, কারণ আমার হাতে টাকা, হিসাব সবই ছিল। তৎপরে তিনজন Director নিযুক্ত হইল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও

শিশিরকুমার ঘোষ। ইহার পূর্বে গিরিশবাবু বা অন্য কাহারও কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব ছিল না, দায়িত্ব সবই আমার ছিল। Director নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আর বেশি দিন থিয়েটার রহিল না…ইহার প্রধান কারণ নগেন, অর্দ্ধেন্দু ও অমৃত তিনজন মিলিত হইয়া আমাকেও তাহাদের মধ্যে লইয়া, চারজন Proprietor বলিয়া Declaration দিতে চাহিল। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম, বলিলাম, 'সকলে খাটিয়াছি—অন্য সকলকে চাকর বা আমাদের অধীন করিব—তাহা কখন হইবে না।' থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল। নগেন, অর্দ্ধেন্দু ও অমৃত এক দিকে আর আমি অপর দিকে। অবশিষ্ট যত লোক আমার পক্ষ অবলম্বন করিল। নগেনের বাটীতে পোষাক থাকিত, সে-সমস্ত তাহারই অধিকারে রহিল; স্টেজ আমার অধীনে ছিল—আমারই কাছে রহিল, অবশিষ্ট টাকাও আমার কাছে ছিল। আমি গিরিশবাবুকে কর্তৃত্ব দিয়া টাউন হল ভাড়া লইয়া Native Hospital-এর Benefit দিলাম। National Theatre আমাদের দলের নাম রহিল।"

এ ব্যাপারে অমৃতলাল বসুর বিবৃতি—

" 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করিবার কিছুদিন পরেই আমাদের ন্যাশনাল থিয়েটরের অভিনয় বন্ধ করিতে হইল।…কিসে গোলমাল বাধিল, ঠিক এখন বলিতে পারিব না। টাকা কড়ির খরচপত্র লইয়া মনোমালিন্য দাঁড়াইয়া গেল।" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

* * *

"যখন টাকা-হিসাবে আমাদের দলের মধ্যে কেহই স্বার্থপর ছিলেন না, তখন টাকা লইয়া গোলযোগ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাই হইল। থিয়েটারে আমাদের অভিভাবকস্থানীয়গণ সকলকে সন্তোষজনকরূপে টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না।" ( তদেব )

* * *

"ন্যাশনাল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেল। দলাদলির সূত্রপাত পূর্বেই হইয়াছিল; এবার পাকাপাকি দুইটা দল দাঁড়াইয়া গেল স্টেজের মালপত্তর আমরা কিছুই পাইলাম না। বোধ হয় পাইলাম না বলিলে ঠিক বলা হয় না; আমরা সকলে উপস্থিত থাকিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিলাম যে, ন্যাশনাল থিয়েটারের স্টেজ গিরিশ-বাবুর বাড়িতে রাখা হইবে।" ( তদেব )

সম্প্রদায় দু'টি বিবদমান দলে বিভক্ত হ'ল। একদলে গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর,

গোপাল দাস, শিব ভট্টাচার্য, তিনকড়ি মুখুয্যে ইত্যাদি। অন্য দলে অর্দ্ধেন্দু, নগেন বাঁড়ুয্যে, কিরণ বাঁড়ুয্যে, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখুয্যে (বেলবাবু), ক্ষেত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

স্টেজম্যানেজার হিসেবে ধর্মদাসবাবুর হেফাজতে stage আর scene, scenery ছিল; অবশিষ্ট টাকাকড়িও তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। ধর্মদাসবাবু এইসব সাজ-সরঞ্জাম আর গচ্ছিত টাকাকড়ি নিয়ে গিরিশচন্দ্রের আশ্রয় নিলেন। গিরিশচন্দ্র অবিলম্বে এই ভগ্নাংশটিকে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে রেজেষ্ট্রি ক'রে নিলেন। অর্দ্ধেন্দু ও অমৃতলাল বসু "এই রেজেষ্ট্রি ব্যাপারটা একেবারেই ভাল চোখে দেখেন নি। আজও পর্যন্ত অনেকে মনে করেন এটা গিরিশচন্দ্রেরই অগৌরবের কথা।"* অপর পক্ষ 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গ্রহণ করে।

ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯এ মার্চ মেয়ো হাসপাতালের সাহায্য কল্পে টাউন হলে নিজেদের স্টেজ খাটিয়ে 'নীলদর্পণ' অভিনয় করে। বাংলা থিয়েটারে সাহায্য-রজনীর দৃষ্টান্ত সেই প্রথম। সেদিনের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র ও ডাক্তার আর. জি. কর (রাধামাধব করের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) যথাক্রমে উড সাহেব ও সৈরিন্ধ্রী সেজেছিলেন। পরের মাসে ৫ই এপ্রিল ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্যকল্পে ওই টাউন হলেই এই দল 'সধবার একাদশী' ও 'ভারতমাতা' অভিনয় করে। তারপর টাউন হল থেকে স্টেজ খুলে নিয়ে এসে শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে স্টেজ খাটিয়ে অভিনয় দেখাতে শুরু করে। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১২ই এপ্রিল। সেদিন অভিনীত হয় 'কৃষ্ণকুমারী'। ১৯এ এপ্রিল 'নীলদর্পণ'। ২৬এ এপ্রিল অভিনীত হয় ছ'খানি প্রহসন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' আর মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' দু'খানি পঞ্চরং—'ডিস্‌পেন্সারি' আর 'চ্যারিটেবল্ ডিস্‌পেন্সারি';—রূপকনাট্য 'ভারতসঙ্গীত'। রাজবাড়ির নাটমন্দিরে ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ রজনীর অভিনয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'। অভিনয়ের তারিখ ১০ই মে। 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে পরিবর্তিত করেছিলেন গিরিশচন্দ্র। বাংলা থিয়েটারে উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার প্রথম গৌরব গিরিশচন্দ্রের প্রাপ্য।

এদিকে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' লিণ্ডসে স্ট্রীটে অপেরা হাউস (এখানকার গ্লোব সিনেমা) ভাড়া নিয়ে ৫ই এপ্রিল থেকে অভিনয় দেখাতে আরম্ভ করে।

* নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'বাংলা রঙ্গমঞ্চের উৎপত্তি ও গিরিশচন্দ্র' নামক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

সেদিনের অনুষ্ঠানসূচিতে প্রথমে ছিল চারটি প্রহসনের অভিনয়—'মডেল স্কুল', 'বিলাতী বাবু', 'উপাধি বিতরণ' আর 'মুস্তফী সাহেব-কা পাক্কা তামাশা'; তারপর প্রফেসর অখিলের ব্যায়ামক্রীড়া প্রদর্শনী; অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাট্যাভিনয় দিয়ে। এই নাটকে অর্দ্ধেন্দু বিদূষক মাধব্য সেজেছিলেন। পর-সপ্তাহে (১২ই এপ্রিল, শনিবার) 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়। অর্দ্ধেন্দু 'কর্তা'-র ভূমিকায় অভিনয় করেন। অপেরা হাউসে আরও দু'একটি নাটক অভিনয় করার পর এই দল হাওড়া রেলওয়ে থিয়েটারে ২৬এ এপ্রিল 'নীলদর্পণ' অভিনয় করে। অতঃপর মে-মাসের গোড়ার দিকে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' ঢাকায় অভিনয় করতে চলে যায়।

পরবর্তী ঘটনাসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা এবার অর্দ্ধেন্দুশেখরের ভাষায়:—

"একদিন অন্তর অভিনয় চলতে লাগল। আমাদের বেশ পসার জমে গেল। বিক্রয়ও বেশ হতে লাগল। এমন সময় শুনলেম ন্যাশনাল থিয়েটার ধর্মদাসবাবুর সহিত ঢাকায় এসেছে।[১] এই সময় ডাক্তার আর. জি. কর ও শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। এ সময়ে গিরিশবাবু ন্যাশনালে ছিলেন কিন্তু ঢাকায় যান নি।[২] তাঁরা রাধিকামোহনবাবুর বৈঠকখানায় আশ্রয় নিয়ে জীবনবাবুর চাঁদনীতে অভিনয় আরম্ভ করেন। তাঁদের ৪।৫ রাত্রি অভিনয়েও বড় সুবিধা হল না। তাঁদের অনেকেই পীড়িত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। অবশিষ্ট যাঁরা রইলেন তাঁরা ঋণগ্রস্ত হয়ে আমাদের কাছে স্টেজপোশাক ইত্যাদি রেখে চলে এলেন, আমরাই তাঁদের ঋণ পরিশোধ করে দিলেম। এই সময়ে তাঁদের দুই-একজন অভিনেতা আমাদের সঙ্গে রয়ে গেলেন। তারপরও আমরা ঢাকায় আর কিছুদিন অভিনয় করে কলকেতায় ফিরলেম। ফিরলেম বটে কিন্তু উভয় দল একত্রিত হল না।[৩]

"ন্যাশনাল থিয়েটার[৪] এসে আবার ভুবনবাবুর ঘাটের চাঁদনীতে এসে জমলেন আর আমাদের দলের কখন আমার বাটীতে কখন বা নগেন্দ্রের বাটীতে রিহার্স্যাল হত। এ সকল ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসের ঘটনা।

"একদিন আমরা সকলে মিলে বসে আছি এমন সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের[৫] এক হরকরা গাড়ি নিয়ে আমার নামে এক পত্র নিয়ে উপস্থিত। পত্রে লেখা see me just now, রাজা নিজে লিখেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ সেই গাড়িতে গেলেম। সেখানে দেখি ৺সূর্যকুমার ঠাকুরের[৬] দৌহিত্র শ্রীযুক্তবাবু নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় উপস্থিত। কথাবার্তায় জানলেম যে দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্তমান রাজা প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে

কলিকাতা থেকে থিয়েটার যাবে। রাজা প্রমথনাথ রাজা রাজেন্দ্রলালকে লিখেছেন যে, শুনিয়াছি ন্যাশনাল থিয়েটার দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে পার্টিতে অর্দ্ধেন্দুবাবু আছেন, সেই পার্টি যাইবেন, রাজা আমার পার্টি নিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন, আমিও স্বীকৃত হলেম। কথাবার্তাও স্থির হয়ে গেল। আমি রাজা রাজেন্দ্রলালের নিকট হতে রাজা প্রমথনাথের পত্রখানি নিয়ে বাড়ি এলেম। পরদিন প্রাতে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার আর ন্যাশনাল থিয়েটার একত্র হবার জন্য অনুরোধ কল্লেম। হিন্দু ন্যাশনাল স্বীকৃত হল কিন্তু ন্যাশনালের কয়েকজন সম্মত হল না। তারপর রাজার চিঠি দেখালেম। ন্যাশনালের গিরিশবাবু ধর্মদাসবাবু ব্যতীত আর সকলেই সম্মত হলেন। পরদিন প্রাতে বেলবাবু আর আমি গিয়ে রাজা রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে লেখাপড়া করে বায়না নিয়ে ফিরে এলেম। সকলেই যেতে প্রস্তুত হলেন। ধর্মদাসবাবু, গিরিশবাবু, দেবেন্দ্রবাবু[৭], অমৃতলাল বাবু আর মহেন্দ্রবাবু তখন আপিসে চাকরি কত্তেন বলে আমাদের সঙ্গে গেলেন না।[৮] আমরা সদলে যথাসময়ে দীঘাপতিয়ায় রওনা হলেম। সেখানে চাররাত্রি অভিনয় হয়।[৯] বায়না নিয়ে বিদেশ যাওয়া এই প্রথম। এই সময় ঘোর বর্ষা। আমরা এসে রামপুর বোয়ালিয়ার ডুরীচাঁদ কণ্ডেলীমলের গোমস্তা দেবিদাসবাবুর কুঠিতে যেখানে People's Association ছিল সেইখানে এসে দিনকয়েক অভিনয় করি। তারপর আমরা বহরমপুরে এসে অভিনয় করি। এই সময়ে মহেন্দ্রবাবু কলিকাতা থেকে এসে যোগ দিলেন, তাঁর চাকরি ব্যাধি তখন সেরে গিয়েছিল। এই বহরমপুরে আমাদের সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর[১০] বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, তিনি আমাদের অভিনয় প্রত্যহ দেখতে আসতেন। এই সময়ে আমরা শুনতে পেলেম ধর্মদাসবাবু আর নগেন্দ্রবাবুর উদ্যোগে ভুবনবাবুর সাহায্যে বিডন ষ্ট্রীটে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে একটা প্যাভিলিয়নের ভিত্তিস্থাপন হয়েছে।[১১] কিরূপে ভিত্তিস্থাপন হয় তার বিষয় পরে ধর্মদাসবাবুর মুখে যেরূপ শুনেছিলেম তা আপনাদের বলছি। আমরা যখন রামপুর বোয়ালিয়ায় তখন বেঙ্গল থিয়েটারে[১২] 'উঃ মোহান্তের এই কি কাজ' [১৩] নামে নাটক খুব জোরে চলছিল। একদিন রাত্রিতে ধর্মদাসবাবু আর ভুবনবাবু এই নাটক দেখতে আসেন। সেদিন এত বিক্রি হয়েছিল যে ৪৲ টাকার টিকিট ৮৲ টাকা দিয়ে কিনতে গিয়েও তাঁরা পাননি। পথে এঁদের সঙ্গে নগেন্দ্রবাবুও মিলিত হন। সেই বিক্রয়ের অবস্থা দেখে বেঙ্গল থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনজনে একটা থিয়েটার হাউস করবার পরামর্শ করেন।[১৪] ভুবনবাবু তখন নাবালক[১৫], তবুও তিনিই অর্থসাহায্য করতে প্রস্তুত হন। তারপর ধর্মদাসবাবু একটা ছোট দল গড়ে নিয়ে চুঁচুড়ার ব্যারাকে

গিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে মোহান্ত নাটক অভিনয় করেন।[১৬] সেখানে তাঁদের ৭।৮ শত টাকা আয় হয়। এই দলে নগেন্দ্রবাবু, অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্র বাবু, যোগেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি পুরাতন অভিনেতারা ছিলেন। তারপর ধর্মদাসবাবু দল নিয়ে বর্দ্ধমান যান। সেখানে লক্ষ্মীবাড়ীতে ৩টা অভিনয় করেন, যথেষ্ট আয় হয়। বর্দ্ধমানে ধর্মদাসবাবু স্টেজপোশাক নিয়ে থাকতেন অন্য সকলে ডেলি-প্যাসেঞ্জার হয়ে যাতায়াত করতেন। এই অবস্থায় নগেন্দ্রবাবুর সাহায্যে ভুবনবাবু ৫হাজার টাকা সংগ্রহ ক'রে গ্রেট ন্যাশনালের স্টেজ তৈয়ারীর জন্য দেন। ধর্মদাসবাবু তখন সদলে কলিকাতায় ফিরে এসে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার পত্তন করেন। যেদিন ভিত্তি স্থাপন হয়[১৭] সেদিন ন্যাশনাল নবগোপাল ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। আমরা যখন ফিরে এলেম তখন দেখি ধর্মদাসবাবুর স্টেজ আর বিল্‌ডিং অর্দ্ধসমাপ্ত হয়ে এসেছে তখন নবেম্বর মাস যায়।[১৮] আমরা আসতেই ভুবনবাবু আমাদের একত্র হতে অনুরোধ কল্লেন, আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেম কিন্তু আর কেহ হলেন না। তার কয়েকদিন পরেই ৭ই ডিসেম্বর। ধর্মদাস আর আমি উভয়ে মিলে প্রথম সাম্বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন কল্লেম।[১৯] রাজা কালীকৃষ্ণ দেববাহাদুর[২০] সভাপতি হয়েছিলেন, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু[২১] আর আমি সেদিন বক্তৃতা করি। সেইদিন আমি এসে প্রকৃত প্রস্তাবে যোগ দিলেম।

"তারপর নগেন্দ্রবাবুর 'কাম্যকানন'[২২] রিহার্স্যাল দেওয়া আরম্ভ হয়। এই বই নিয়েই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খোলা হয়। ১৮৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শনিবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খোলা হল।[২৩] প্রথম রাত্রিতে প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ হতে না হতে দোতলার সিঁড়ির মুখে বক্সের প্রবেশের দরজায় কি জানি কেমন করে আগুন লাগে।[২৪] বহু কষ্টে ও বহু যত্নে আহিরীটোলার প্রসিদ্ধ জিমন্যাষ্টিক মাস্টার অখিলচন্দ্র সে আগুন নিবিয়ে দেন। পরদিন ১৮৭৪।১লা জানুয়ারি ফ্যান্সী ফেয়ার উপলক্ষে আমরা বেলভিড্রিয়রে অভিনয় করতে যাই। সেখানে অনেক ইংরাজী থিয়েটার আর তামাশা গিয়েছিল, দেশীয়ের মধ্যে আমরাই কিন্তু একা ছিলেম। এদিকে মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু, বেলবাবু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাধামাধববাবুকে নেতা করে ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে আবার সান্যালদের বাড়িতে অভিনয় আরম্ভ করে দিলেন।[২৫] বেঙ্গল থিয়েটারের স্ত্রী অভিনেত্রীর আকর্ষণ আর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতি সাধারণের প্রীতিবশে ওঁরা বড় সুবিধে করে উঠতে পারলেন না। ৬।৭ রাত্রি অভিনয়ের পর এক রাধামাধববাবু ব্যতীত আর সকলে এসে আমাদের গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিলেন।[২৬]

গ্রেট ন্যাশনালের দল পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে উঠল। অদম্য প্রভাবে অভিনয় চলতে লাগল। ১৮৭৪ মার্চ মাসের শেষে গিরিশবাবুও এসে যোগ দিলেন,[২৭] তখন তাঁর আর পেশাদারী থিয়েটার বলে আপত্তি ছিল না। তাঁর আগমনে আমরা আরও একটি সুদক্ষ অভিনেতা পেলেম।

"এই সময়ে সাধারণে দিন দিন বেঙ্গল থিয়েটারের পক্ষপাতী হয়ে উঠতে লাগল। বেঙ্গল থিয়েটার এ সময় মোহান্ত ছেড়ে 'পুরুবিক্রমের' অভিনয় কচ্ছিলেন।[২৮] দর্শকেরা স্ত্রীকণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণে বড়ই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লেন। আমাদের প্রতিপত্তি, আমাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা যদিও বিন্দুমাত্র কমে নি, তবুও প্রলোভন বেঙ্গলে বেশী হওয়ায় আমরা একটু ভবিষ্যচ্চিন্তায় মন দিলেম। তখনকার সমাজে ও সংবাদপত্রে বেশ্যা নিয়ে অভিনয়ের সপক্ষেবিপক্ষে বিস্তর আন্দোলন চলছিল। আমাদের দলের মধ্যেও দুমতের পোষক দুদল হয়ে বেশ্যা অভিনেত্রী লওয়ার কল্পনা চলতে লাগল। এই সূত্রে নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে ধর্মদাসবাবু আর আমার মতভেদ হওয়ায় আমি ও ৺মতিলাল সুর উভয়ে একটি কোম্পানী নিয়ে ঢাকায় গেলেম; সেখানে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে কিছুদিন অভিনয় করে বগুলা কৃষ্ণনগরে এসে কিছুদিন অভিনয় করলেম, সেখান হতে রাণাঘাটে এসে ৺গোপাললাল চৌধুরীর বাড়িতে টিকিট বিক্রয় ক'রে অভিনয় করি। এই সময় কলিকাতা হতে আমার নিকট সংবাদ যায় যে, আমার মাঠাকরুণ মৃত্যুশয্যায়। অগত্যা আমাকে মতিবাবুর হস্তে দল রেখে কলিকাতায় আসতে হল। মতিবাবু দল নিয়ে শান্তিপুর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করতে লাগলেন। আমি বাড়ি আসার কয়েকদিন পরে মাঠাকরুণের ৺গঙ্গালাভ হল। এই সময়ে ভুবনবাবু আর আমাকে বিদেশে যেতে দিলেন না। তিনি আমার মাতৃশ্রাদ্ধের বিশেষ সাহায্য করায় আমি তাঁর গুণে আবদ্ধ হয়ে অশৌচান্তে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেই যোগ দিলেম। (অর্দ্ধেন্দুবাবু এই কথা বলিবামাত্র শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন 'thank you অর্দ্ধেন্দু', অমনি শ্রোতৃবর্গের মধ্যেও thanks thanks শব্দ উঠিল। পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি বলিলেন, ও সকল ব্যক্তিগত কথা ইতিহাসের মধ্যে কেন? অর্দ্ধেন্দুবাবু বলেন— থিয়েটারের ইতিহাসের প্রত্যেক পরিবর্তন, আমার জীবনের প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে এমন বিজড়িত যে, আমি সেগুলার উল্লেখ না করে থাকতে পারি নে, বা তা করে থিয়েটারের ইতিহাস বলা যায় না, বিশেষত ভুবনবাবু সে সময়ে আমায় যে ভাবে উপকার করেছিলেন বলেছি তার প্রতি বর্ণ যখন সত্য সে কথা বলতে আমার কোন লজ্জা নাই বা আমি দোষ বোধ করি নে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে

তখন অনেকে করতালি দিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুর কৃতজ্ঞহৃদয়ের সম্বর্দ্ধনা করিল।) তারপর অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিতে লাগিলেন, তারপর যখন যোগ দিলেম তখন ন্যাশনালে[২৯] বেশ্যা অভিনেত্রী লওয়া হয়েছে আর 'সতী কি কলঙ্কিনী' নামে একখানি গীতিনাট্যের রিহার্স্যাল চলছে, শেষে জুলাই মাসে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেও বেশ্যা অভিনেত্রী লওয়া হয়। যাদুমণি, রাজকুমারী, বড়হরি[৩০], কাদম্বিনী, লক্ষ্মীমণি, ও ক্ষেত্রমণি এই ছয়জনকে প্রথমে লওয়া হয়।[৩১] তখন নগেন্দ্রবাবু ম্যানেজার। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠকে দিয়ে 'সতী কি কলঙ্কিনী' নামে গীতিনাট্যখানি লিখিয়েছিলেন।[৩২] ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ 'সতী কি কলঙ্কিনী' খোলা হয়। বইখানাও ছাপান হয় এবং অভিনয়ের রাত্রিতে টিকিট ঘর হতে বেচাও হয়। ৺মদনমোহন বর্মা তখন আমাদের দলে সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন। কান্তাপ্রসাদ নামে সুবিখ্যাত নাচের ওস্তাদকে এনে নাচ শেখান হয়। বাঙ্গালা থিয়েটারে অপেরার এই প্রথম অভিনয়। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়ের লিখিত পুস্তকের অভিনয় এই প্রথম।

"এই সময়ে আমাদের প্যাভিলিয়ন্ ছিল বটে কিন্তু তখনও এখনকার মত রিহার্স্যাল স্টেজেতে হত না, ভুবনবাবুর চাঁদনীর বৈঠকখানাতেই হত। 'সতী কি কলঙ্কিনী'র শিক্ষাও সেইখানেই হয়েছিল। অভিনেত্রীদিগকে সেইখানেই নিয়ে যাওয়া হইত।

"৩রা অক্টোবর আমরা 'পুরু-বিক্রম' অভিনয় করি। এই দিন বেঙ্গল থিয়েটার 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় ক'রে আমাদের ঠাট্টা ক'রে একটা after-piece অভিনয় করেন, তার নাম দেন 'opera troubles'। ১০ই অক্টোবর আমাদের 'ভারতে যবন'[৩৩] ও বেঙ্গল থিয়েটারে 'কেরানী দর্পণ' অভিনয় হয়। ৩১শে অক্টোবর পূজার পর আমরা বাঙ্গালা ম্যাক্‌বেথ বা হরলাল রায়ের 'রুদ্রপাল' অভিনয় করি। এই দিন লকের অনুকরণে ম্যাকবেথের ইংরাজী গান গাওয়া হইয়াছিল। সে কথা হ্যাণ্ডবিলে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল—'Macbeth! Macbeth! with an original in imitation of Lockes.' এই দিন কর্ণেল হাইড্ আমাদের দর্শক ছিলেন। ইহার পর ২১শে নবেম্বর 'আনন্দ কানন' আর 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' অভিনীত হয়।[৩৪]

"এই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারের দল কাল্‌নায় গিয়েছিলেন আর বর্দ্ধমানের মহারাজা তাঁদের পেট্রন হবেন স্বীকার করেন। ১২ই অক্টোবর শনিবার সেজন্য বেঙ্গল থিয়েটারে খুব ধুমধাম হয়।[৩৫]

"তারপর আমরা ১১শে ডিসেম্বর হরলালবাবুর 'শত্রুসংহার' (বেণীসংহার)

অভিনয় করি।৩৬ এর পরসপ্তাহে ২৬শে ডিসেম্বর বেঙ্গল থিয়েটার 'মণিমালিনী' অভিনয় ক'রে কিছুদিনের জন্য অভিনয় বন্ধ দেন।৩৭

"তারপর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি ২রা তারিখে বেথিয়ার মহারাজ আমাদের থিয়েটারে আসেন। সেদিন 'শরৎ-সরোজিনী' অভিনয় হয়—ধর্মদাসবাবুর চেষ্টায়। তিনি এই সময়ে দলে যোগ দেন।

"এই সময় ৮॥ টার সময় অভিনয় আরম্ভ হত।

"এর পরসপ্তাহে আমাদের মধ্যে গোলমাল বাধে। নগেন্দ্রবাবু রয়াল থিয়েটার ভাড়া নিয়ে, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী বলে নাম দিয়ে অভিনয় আরম্ভ করেন। ৯ই জানুয়ারি রয়াল থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী' হয়। সেদিন যোধপুরের মহারাজা যশোবন্তরাও উপস্থিত ছিলেন। মদনমোহন বর্মার কনসার্ট ছিল। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসন হয়। তার পরের সপ্তাহে নগেন্দ্রবাবুর দল হাবড়া রেলওয়ে স্টেজে অভিনয় করেন। নগেন্দ্রবাবুরা ছেড়ে গেলে ধর্মদাসবাবু ম্যানেজার হন। এই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটার 'আলালের ঘরের দুলাল' অভিনয় করেন। তারপর আমরা প্রথম প্যাণ্টোমাইম অভিনয় করি। তখনও আমাদের প্যাণ্টোমাইমের অভিনয়ের কথাবার্তা ছিল না। আমরা Dumb show এর মত কোন একটা বিষয় আপনাআপনি গড়ে স্টেজে গিয়ে অভিনয় করতেম।" ('পঞ্চপুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৭)

অর্দ্ধেন্দুশেখরের মুখে-মুখে, গড়া এইরকম একটি প্রহসনের অভিনয় সম্বন্ধে অভিনেত্রী বিনোদিনী লিখে গেছেন—

"একদিন বড়-বর্ষা। অভিনয় শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি আর থামে না। দর্শকবৃন্দ ভারি চঞ্চল হয়ে উঠল। আমরাও যে কি করি বসে বসে তাই ভাবছি, এমন সময় অর্দ্ধেন্দুবাবু বললেন, 'র'স, একটা কাজ করা যাক, ধর্মদাস, তুমি বাইরে বেরিয়ে বল, মশায়রা ব্যস্ত হবেন না, একখানি ছোট প্রহসন দেখুন; আপনাদের শুধু শুধু বসে থাকতে হবে না; আর তার মধ্যে বৃষ্টিও ধরে যেতে পারে।

"প্রহসনের নাম হ'ল 'মুস্তফী সাহেব-কা পাক্কা তামাশা'। অর্দ্ধেন্দুবাবু হলেন মুস্তফী সাহেব, ক্ষেতুদিদি* হ'ল তার মা, আর লালপেড়ে শাড়ী পরে আমি হলাম তার বৌ। রিহার্সাল মুখে মুখে চলল।

"সঙ্গে সঙ্গে সিন সাজান হ'তে লাগল। একখানি ভাঙা একতলা ঘরের সিন দেওয়া হ'ল। ইঁট সাজিয়ে পায়া ক'রে তার ওপর তক্তা পেতে টেবিল করা হয়ে

*অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি।

গেল, সাদা ছেঁড়া থানের খানিকটা সেই টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে চাদরের অভাব পূরণ করা হ'ল।

"এদিকে দশ মিনিট বিশ্রামের পর কনসার্ট বাজতে লাগল। অর্দ্ধেন্দুবাবু সাজঘরে গিয়ে অনেকদিনের একটা পুরানো ইজের আর একটা ছেঁড়া কোট পরে হাতে মুখে কালি মেখে ত বেরিয়ে পড়লেন। আমাকে সেই ভাঙা সিনের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে বলে গেলেন, 'তুই একবাব একবার উঁকি মেরে দেখবি, আর ভয়ে মুখ সরিয়ে নিবি।' ক্ষেতুদিদিকে বড় কিছু বলতে হ'ত না, একটু আভাস দিলেই সে সব ঠিক ক'রে নিতে পারত।

"মুস্তফী সাহেব ত বেরিয়ে সেই ভাঙা টেবিলের ওপর সাহেবী ধরনে বসে এক হাতে কুশী আর এক হাতে-গুণ ছুঁচ না নিয়ে শুক্‌নো পাঁউরুটি খেতে লাগলেন, আর সাহেবের মত ঘাড় বেঁকিয়ে দর্শকদের দিকে চাইতে লাগলেন। তাঁর কিছু বলবার আগেই তাঁর সেই মিটির মিটির চাউনি আর সাহেবী ভাবভঙ্গী দেখে দর্শকরা ত হেসেই অস্থির। এর ওপর মুস্তফী সাহেবের কথা। যাক!

"সাহেব ছেলে, শুধু শুক্‌নো পাঁউরুটি দাঁত দিয়ে টেনে টেনে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খাচ্ছে দেখে মা বধূকে বল্লেন, 'আমাদের ছোলার ডাল আর একটু মোচার ঘণ্ট এনে দাওত মা।' বালিকা-বধূ তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর থেকে একটা বাটিতে ছোলার ডাল ও একখানি রেকাবিতে একটু মোচার ঘণ্ট এনে মা'র হাতে দিলেন। মা ভয়ে ভয়ে টেবিলের কাছে অতি আস্তে আস্তে বললেন, 'বাবা শুধু রুটি খাচ্ছিস, একটু ডাল আর এই তরকারিটকু দিয়ে খা।' এই আর কোথা আছে! সাহেবকে বাঙালীর তরকারি খেতে বলা। সাহেব ত লাফিয়ে উঠে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, 'কা! হামি বাঙ্গালা তরকারি খাতা?' রকম দেখে ভয়ে হাত পা কেঁপে মা'র হাত থেকে ডালের বাটি আর মোচার ঘণ্ট মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ে গেল। কিন্তু সেই শুক্‌নো 'ভেবাসটে' রুটিত আর গেলা যায় না। তাই এদিক ওদিক চেয়ে ছড়ান ডাল আর একটু মোচার ঘণ্ট মেঝের ওপর থেকে তুলে নিয়ে খেয়ে সাহেব এমনই মুখভঙ্গী করলেন যে তাতে বেশ বোঝা গেল, তরকারিটুকু তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

"সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দরজার দিকে তাকিয়ে 'এমা, এমা, আম্‌মা' বলে ডেকে চারিদিকে চাওয়া; ছেলের গলা পেয়ে মার 'কি বাবা কি বাবা' বল্‌তে বল্‌তে ব্যস্তভাবে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ান, সাহেবের সেই ছোলার ডাল দেখিয়ে বলা, 'এমা, এ-মাফিক কেয়া লে আয়া? দেও ত হামাকে,'—আর অমনি ব্যস্তসমস্ত ভাবে 'খাবে বাবা, আনব বাবা' বলে চলে যাওয়া—সে সব দৃশ্য যে না দেখেছে

সে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। ক্ষেতুদিদির তখনকার কি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, কি তদগত ভাব দৃষ্টি !

"এমন সময় মিউনিসিপালিটির একজন চাপরাশি একখানা নোটিশ হাতে করে সেখানে এসে উপস্থিত। রাস্তায় একমুঠো জঞ্জাল ফেলা হয়েছে এ তারই নোটিশ। সে এসে যেমন বলা, 'সাপো নটিশ অছি:' অমনি সাহেব তাকে তেড়ে গিয়ে বললেন, 'এই কালা বাঙ্গালী নীচু যা আবি।' উড়ে ত তার রকম দেখে, দু'পা সরে গিয়ে বললে, 'ও বাবা, নীচু যাব কোথা, পাতকোয়াব ভেতর না কি ?' এই বলে ত সে চলে গেল। তারপর মুস্তফী সাহেবের পা তুলে তুলে কি পলকা নাচ ; সে লম্বা-লম্বা ঠ্যাং*উঁচু ক'রে কি লাফান, আর তার সঙ্গে সঙ্গে গান ; গানের ত মাথা মুণ্ডু নেই—

'হাম বড়া সাব হায় দুনিয়ামে, তোম্ ছোটা সাব হায় দুনিয়ামে।
তোম খাতা চিংড়ি মাছ, হাম খাতা হায় পেঁয়াজ।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দর্শকের দিকে সভঙ্গী অঙ্গুলি নির্দেশ। দর্শকদেব মধ্যে যে কি রকম হাসিব বোল পড়ে গেল, তা সবাই বুঝতে পারচেন, আমার না বললেও হয়।

"এইভাবে তিনি দু'ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন। বৃষ্টিও ধরে গেল, দর্শকরা আনন্দ করতে করতে যে যার বাড়ি চলে গেলেন। আমরাও হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে বাড়ি ফিরলাম।" ( 'আমাব অভিনেত্রী জীবন' : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত শ্রীমতী বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা'— পৃ. ৮৭-৮৯ থেকে উদ্ধৃত )

আবার মূল কাহিনী অনুসরণ করা যাক। এবাব আমাদের জবানিতে পাঠককে শুনতে হবে।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মদনমোহন বর্মণ, কিরণ বাঁড়ুয্যে, অমৃতলাল বসু, যাদুমণি ও কাদম্বিনী প্রমুখ একদল নট-নটী গ্রেট ন্যাশনাল ত্যাগ ক'রে 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নাম নিয়ে চুঁচড়ো, কলকাতা, হাওড়া ইত্যাদি স্থানে অভিনয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এই দলত্যাগীরা বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ৬ই ফেব্রুয়ারি 'সতা কি কলঙ্কিনী ?'-র অভিনয় করে। এই সম্মিলিত দল ১৩ই, ২০এ ও ২৭এ ফেব্রুয়ারি আর ৬ই মার্চ যথাক্রমে 'কপালকুণ্ডলা', 'অপূর্ব কারাবাস', 'ভীমসিংহ' আর 'মেঘনাদ বধ' অভিনয় করে।

*বিনোদিনী উক্ত স্মৃতিকথায় একস্থলে লিখেছেন, অর্দ্ধেন্দুশেখর 'আড়ে বহরে লম্বায় চওড়ায় দশাসই চেহারা'র মানুষ ছিলেন।

এদিকে গ্রেট ন্যাশনালে ১০ই ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয় 'শত্রু-সংহার'। সেদিন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা বিশিষ্ট দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। ২০এ আর ২৭এ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে 'নগ-নলিনী' আর 'শরৎ-সরোজিনী' মঞ্চস্থ হয়। শেষোক্ত দিনে গায়কোয়াড়ের আগমন হয়। ৮ই মার্চ 'হেমলতা' অভিনীত হয়।

গ্রেট ন্যাশনালে ১৮৭৪-এর ১লা জানুয়ারি থেকে ১৮৭৫-এর মার্চ পর্যন্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর অন্যান্য নাটকে যে সব ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, আমরা তার একটা তালিকা দিচ্ছি। বলা বাহুল্য, এ তালিকা অসম্পূর্ণ।

বিধবা-বিবাহ নাটকে কর্তা (১০।১।১৮৭৪), প্রণয়-পরীক্ষা নাটকে নটবর (১৭।১।১৮৭৪), কৃষ্ণকুমারী নাটকে ধনদাস (২৪।১।১৮৭৪), মৃণালিনীতে হৃষীকেশ (২১।২।১৮৭৪), 'মাউসি' নামক পঞ্চরং-এ একটি হাস্যরসাত্মক ভূমিকা, কমলে-কামিনীতে বক্কেশ্বর, হেমলতায় সত্যসখা, সতী কি কলঙ্কিনীতে জটিলা, আনন্দ-কাননে অবিবেক (১৪।১১।১৮৭৪) এবং বঙ্গের সুখাবসানে রাজা লক্ষ্মণ সেন (২৬।১২।১৮৭৪)।

'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকে গুলিখোর জামাই নটবরের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় সম্পর্কে 'ভারত-সংস্কারক' (২৩ জানুয়ারি, ১৮৭৪) নামক সাপ্তাহিক পত্রের মন্তব্য—

"…নটবরের কালীমন্দিরের দৃশ্যাভিনয়টি আমরা শীঘ্র ভুলিব না। ইহার স্বাভাবিক অভিনয় আমরা এখনও প্রত্যক্ষ করিতেছি।…" ('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ—পৃ. ১৪৮ থেকে পুনরুদ্ধৃত)

'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এ ধনদাসের ভূমিকাভিনয় সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সাপ্তাহিক পত্রের (৩০ জানুয়ারি, ১৮৭৪) মন্তব্য—

"…ধনদাস জয়পুর রাজসভার দৌত্যকার্যে এবং দরিদ্রবেশে চমৎকার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্রবেশী ধনদাস যে প্রকারে রঙ্গভূমিতে দেখা দিয়াছিল, তাহাতে সে সকলেরই অনুকম্পার পাত্র হইয়াছিল সন্দেহ নাই।…" (তদেব)

দীনবন্ধুর 'কমলে কামিনী' নাটকের প্রকাশকাল ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩। দীনবন্ধুর মৃত্যুর (১লা নবেম্বর, ১৮৭৩) পর সান্যাল বাড়িতে রাধামাধব কর পরিচালিত ন্যাশনাল থিয়েটার (২য় পর্যায়) কর্তৃক নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয়ের তারিখ ২০এ ডিসেম্বর, ১৮৭৩। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'কমলে কামিনী'-র প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৪ই মার্চ ১৮৭৪; প্রথম অভিনয় রজনীতে অমৃতলাল বসু 'বক্কেশ্বর' সেজেছিলেন; পরে অর্দ্ধেন্দু উক্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দীনবন্ধু-পুত্র ললিতচন্দ্র এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন:

"মুস্তফী মহাশয় আমার পিতার শেষ পীড়ার সময় তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। সেই সময়ে 'কমলে কামিনী' প্রকাশিত হয়। একদিন মুস্তফী মহাশয় আসিলে পিতৃদেব তাঁহার হস্তে একখানি পুস্তক দিয়া তাঁহাকে পড়িতে বলেন। তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন, যখন গান্ধারীর অনুতাপ পড়িতে লাগিলেন, পিতৃদেব ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; অর্দ্ধেন্দুবাবু তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন; তিনি জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, 'আমার এ নাটকখানি তোমরা অভিনয় করবে?' বলিয়া আবার কাঁদিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু উত্তর করিলেন, 'আপনার নাটক নিয়েই সাধারণ রঙ্গভূমি স্থাপিত হয়েছে, আপনার নাটক অভিনয় করবার জন্যে কি অনুরোধের আবশ্যক?' পিতৃদেব কহিলেন, 'অনুরোধ করছি না; তোমরা অভিনয় করবে জানি, কিন্তু তুমি সাজবে, আমি দেখতে পাব না' বলিয়া আবার ক্রন্দন করিলেন। সে দিনের পাঠ সেইখানে সমাপ্ত হইল। বলা বাহুল্য পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের কিছু পরে 'কমলে কামিনী' অতি সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। মুস্তফী মহাশয় তখন কলিকাতায় ছিলেন না, সেই নিমিত্ত সে অভিনয়ে কোন অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি 'বকেশ্বরের' ভূমিকা লইয়া দর্শকবৃন্দকে মোহিত করিয়াছিলেন। প্রথম অভিনয়ে, নট ও নাট্যকার শ্রদ্ধাস্পদ অমৃতলাল বসু মহাশয় এই ভূমিকা গ্রহণ করেন।" ('অর্দ্ধেন্দু কথা': 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক ১৩২১)

১৮৭৫-এর মার্চ মাসের শেষাশেষি ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানীর একটি অংশ উত্তর ভারতে অভিনয় সফরে বহির্গত হয়। দলে ছিলেন অর্দ্ধেন্দু, অবিনাশ কর, মতিলাল সুর, নীলমাধব চক্রবর্তী, কার্তিক পাল, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, লক্ষ্মী, নারায়ণী, বিনোদিনী প্রমুখ অভিনেতৃবৃন্দ। অর্দ্ধেন্দু মাঝখানে একবার কলকাতায় ফিরে এসে ১০ই এপ্রিল 'নয়শো রোপেয়া'-য় ছাতুলালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর অর্দ্ধেন্দু আবার ভ্রাম্যমান্‌ নাটুকে দলের সঙ্গে উত্তর ভারতে মিলিত হন।

মে-মাসের মাঝামাঝি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার দিল্লী, লাহোর, মিরাট, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সতী কি কলঙ্কিনী?', 'লীলাবতী', 'নীলদর্পণ' ইত্যাদি নাটকের অভিনয় ক'রে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা লাহোরেই দল বেশি দিন অবস্থান করেছিল। কারণ, অর্দ্ধেন্দু সেখানে আসর জমিয়ে নিয়েছিলেন, প্রায়ই বড় বড় লোকদের বাড়ি তাঁর নিমন্ত্রণ হ'ত। তাঁরই জন্যে দলকে সেখানে অত

বেশিদিন থাকতে হয়েছিল। উত্তর ভারত সফরে কোম্পানী আশাতিরিক্ত অর্থ আমানত করেছিল, বিশেষতঃ লাহোরে কাশ্মীরের মহারাজার সামনে অভিনয় ক'রে এই নাটুকে দল পেয়েছিল প্রচুর অর্থ আর শাল জামিয়ার প্রভৃতি বহুবিধ মূল্যবান সামগ্রী। কলকাতায় ফিরে এঁরা থিয়েটারের মালিক ভুবনবাবুকে দিলেন যৎসামান্য অর্থ ও কাশ্মীরমহারাজ-প্রদত্ত নানাবিধ উপহারের মধ্যে একটা সামান্য রুমাল আর একটি ছোট পাথরের রেকাবি। কিছুদিন পরে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়। ভুবনবাবু বিলক্ষণ অসন্তুষ্ট হন। তাছাড়া থিয়েটারের আয়ব্যয়ের হিসেবেও গোলমাল ধরা পড়ে। ভুবন নিয়োগী ধর্মদাসবাবুকে ম্যানেজারের পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে শ্যামপুকুরের কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ইজারা দিলেন। ধর্মদাসবাবু কয়েকজন অভিনেতৃকে সঙ্গে নিয়ে দলত্যাগ করেন। কৃষ্ণধনবাবুর আমলে গ্রেট ন্যাশনালের নাম হয় 'দি ইণ্ডিয়ান (লেট গ্রেট) ন্যাশনাল থিয়েটার'। কিন্তু কৃষ্ণধনবাবু মাস তিনেক যেতে না যেতেই লিজ ছেড়ে দেন। বাধ্য হয়ে ভুবনবাবু ডিসেম্বর মাস থেকে 'গ্রেট ন্যাশনাল'-এর কর্তৃত্বভার আবার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর নাম আবার 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' হয়। ডিরেক্টার আর ম্যানেজার রূপে নিযুক্ত হন যথাক্রমে উপেন্দ্রনাথ দাস আর অমৃতলাল বসু।

২৫এ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনালে অমৃতলাল বসুর লেখা প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ' মঞ্চস্থ হয়। নাটকের বিষয়বস্তু গায়কোয়াড়ের সিংহাসন-চ্যুতি। এ প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু 'অমৃত-মদিরা'-য় লিখেছেন—

"নাট্যকার পরিচয় প্রথমে আমার হয়,
লিখিয়া 'হীরকচূর্ণ' গলি করুণায়।
সাজিয়া বরোদা রায়, নির্বাসনে যবে যায়,
চাহনিতে অশ্রুবিন্দু অর্দ্ধেন্দু ঝরায়।"

মলহার রাও সেজেছিলেন অর্দ্ধেন্দু। নির্বাসনে যাবার সময়ে গায়কোয়াড়-অর্দ্ধেন্দু একবার আপন দেশের পানে চাইতেন। সে করুণ চাউনি ছিল অপূর্ব।

বছরের শেষ দিনে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' আর পরবর্তী সনের (১৮৭৬ খ্রীঃ) ১৯এ ফেব্রুয়ারি 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামক প্রহসন গ্রেট ন্যাশনালে মঞ্চস্থ হয়। এই দুটি নাট্যাভিনয়কে উপলক্ষ ক'রে ইংরেজ সরকার ১৮৭৬-এর ডিসেম্বর মাসে এদেশে কুখ্যাত Dramatic Performance Act (1876) চালু করে। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে গ্রেট ন্যাশনালের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। বিপুল পরিমাণ ঋণ, যৎসামান্য

আয়। বিপন্ন ভুবনমোহন গিরিশচন্দ্রকে গ্রেট ন্যাশনাল ইজারা দেন। ইজারা নিয়ে গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের নতুন নামকরণ করলেন—সেই সাবেক নাম—ন্যাশনাল থিয়েটার (জুলাই, ১৮৭৭ খ্রীঃ)। 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' নামের বিলুপ্তি ঘটে। দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অর্দ্ধেন্দু পশ্চিম ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

"এই সময়ে তিনি যেখানেই গিয়াছিলেন সেইখানেই হয় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা নয় অভিনয়ের সূচনা করিয়া যান। এইজন্যই অমৃতবাবু বলেন, অর্দ্ধেন্দু ছিল থিয়েটারের মিশনারি। * তিনি কাশ্মীর হইয়া কাবুল পর্যন্ত গিয়াছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজ তাঁহার অভিনয় দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের ইচ্ছা করেন। কোনও কারণে সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় নাই। যখন তিনি লক্ষ্ণৌয়ে গিয়া উপস্থিত হন, তখন সেখানে বাঙ্গালীদের অনুরোধে তিনি রেলে চাকুরী করেন। ভাষা ও ভাবানুকরণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ, কলিকাতাবাসিগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এখন লক্ষ্ণৌয়ে তাহা কাজে লাগিয়া গেল। তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া কেহই ধরিতে পারিল না। তিনি রেলওয়ে গার্ড হইলেন। পরে সকলে জানিয়াছিলেন তিনি বাঙ্গালী। তৎকালে এ পদ এদেশীয়ের বিশেষতঃ বাঙ্গালীর প্রাপ্য ছিল না। এখানে চাকরী উপলক্ষমাত্র। আসল কার্য ছিল অভিনেতৃ-সম্প্রদায় গঠন ও অভিনয়কার্যে শিক্ষাদান। কিছুদিন রেলের কাজ করিয়াই অর্দ্ধেন্দু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এ কাজে মন উঠিল না। যে কাজের জন্য ভগবান তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন এ ত সে কাজ নয়। তিনি ভুবনবাবুর বিশেষ অনুরোধে পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। এখানে আসিয়াও যে তিনি বরাবরই অভিনয়ে

* অমৃতলাল বসু বলেছেন, "অর্দ্ধেন্দু তখন কলিকাতায় ছিলেন না, নানা দেশবিদেশে মিশনরির মত ঘুরিতেছিলেন। একথা আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে চাই যে, থিয়েটরের যদি কেহ কখনও মিশনরি হইয়া থাকেন তাহা হইলে একমাত্র অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ভিন্ন আর কাহারও নাম করা যায় না। কলিকাতায় বসিয়া আমরা যখন তখন ষ্টেজ করিবার পরিকল্পনা করিতেছিলাম, অর্দ্ধেন্দু তখন বঙ্গের বাহিরে অভিনয়-কলাকে জনসাধারণের আদরের সামগ্রী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, "গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের পর অর্দ্ধেন্দু বহুস্থান ভ্রমণ করেন। এই সময়ে বহু নাট্যসম্প্রদায় তাঁহার দ্বারা দীক্ষিত হয়। নড়ালের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত নাট্যসম্প্রদায় গঠন অর্দ্ধেন্দুর এরূপ কার্যের শেষ।...অর্দ্ধেন্দুর যশ যে কেবল বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত, এরূপ নহে। ভারতবর্ষে যে স্থানে দশজন বাঙ্গালী বসিয়া নাটকের কথা কয়, সেইখানেই অর্দ্ধেন্দুর নাম প্রচার; সকলেই অদ্বিতীয় অভিনেতা বলিয়া জানেন।" ('নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী')

লিপ্ত ছিলেন, তাহা নয়, মাঝে মাঝে থিয়েটার ছাড়িয়া দিতেন।" ('বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট: নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী)

অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিবৃতি (পৃঃ ৯৭ থেকে পৃঃ ১০২ পর্যন্ত) প্রসঙ্গে অতিরিক্ত টীকা ও তথ্য।

১। অমৃতলাল বসু ঢাকা সফরের কাহিনী তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "এমন সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার প্রস্তাব হইল। আমাদের সকলেরই খুব উৎসাহ। অর্দ্ধেন্দু, আমি, নগেন, কিরণ, ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, বেলবাবু, বিহারী বসু প্রভৃতি সকলেই বিদেশে যাইতে প্রস্তুত। মেয়ে সাজিবার জন্য মহেন্দ্র সিং নামে একটি সুন্দর ছেলে পাওয়া গেল। ঢাকায় মোহিনীমোহন দাসের নামে একখানি পত্র বলাই সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।...মোহিনীবাবুর হাতে চিঠি দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি একটি প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন; সেই বাগানবাড়িটি ঠিক বুড়ীগঙ্গার তীরে অবস্থিত।...

"ঢাকা শহরে একটি বাঁধা স্টেজ ছিল। বেশি কাল-বিলম্ব না করিয়া আমরা সেই স্টেজে 'নীলদর্পণ' লইয়া অবতীর্ণ হইলাম; নবাববাড়ির ব্যাণ্ড ও মোহিনীবাবুর কনসার্ট আমাদিগকে সাহায্য করিল।...প্রায় একমাস আমরা ঢাকায় রহিলাম। অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া সমস্ত শহর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আমাদের দেশের থিয়েটারের জন্য কোন অভিনেতাকে অমন করিয়া আর কেহ lionise করিয়াছে কিনা জানি না।

"আমাদের দলের খ্যাতির কথা শুনিয়া অপর দলের আমাদের পুরাতন বন্ধুরা ঢাকায় গেলেন। তাঁহারা মোহিনীবাবুর মেজো ভাইয়ের (রাধিকাবাবুর) আশ্রয় লইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আগে আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা আসর জমাইতে পারিলেন না। আমাদেরই বাগানবাড়ির সন্নিকটে লক্ষ্মীবাড়িতে তাঁহাদের আড্ডা হইল। তাঁহারা জীবনবাবুর বাড়িতে থিয়েটর করিলেন।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

২. গিরিশচন্দ্র সেই সময়ে আপিস থেকে সম্ভবত ছুটি পাননি ব'লে দলের সঙ্গে ঢাকা যেতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন: "একদলে অর্দ্ধেন্দু আর এক দলে আমার থাকা না থাকা সমান, কারণ নানা স্থানে বেড়াই-

বার আমার শক্তি, সুযোগ ও ইচ্ছা ছিল না।" ( নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' )

৩. "প্রতিদ্বন্দ্বীদলের সকলেই এক একজন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কেহ কেহ পীড়িত হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদিগকে লইয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। উভয় দলের যে ঠিক মিলন হইল, এমন কথা বলা যায় না।" ( 'অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা' : 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায় )

৪. হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার।

৫. রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১): প্রখ্যাত বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য পাশ্চাত্যের বহু বিদ্বজ্জন-সভা কর্তৃক সম্মানিত হয়েছিলেন। ১২৮ খানি গ্রন্থের রচয়িতা। বুদ্ধগয়া ও উড়িষ্যার প্রাচীনতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থদ্বয় এঁর অক্ষয়কীর্তি। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এল. ( ডক্টর-অব-ল), ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রায়বাহাদুর, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সি. আই. ই. ও ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা উপাধি লাভ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৩ খ্রীঃ পর্যন্ত কলকাতায় Wards Institution নামক নাবালক জমিদারদের আবাস এঁর তত্ত্বাবধানে ছিল।

৬. প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

৭. নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

৮. অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "কিছুদিন পরে দীঘাপতিয়ার রাজকুমারের ( এখন রাজা প্রমদানাথ রায় ) অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ন্যাশনাল থিয়েটারের নিমন্ত্রণ হয়। দুই দলের অধিকাংশ লোকই একত্র হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি গেলাম না। নগেন, কিরণ ও আরও কয়েকজন গেলেন না।" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

৯. দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর অভিনয় দেখে পরম সন্তুষ্ট হন এবং অর্দ্ধেন্দুশেখরকে অদ্বিতীয় Comic Muse উপাধি প্রদান করেন। ( দ্রঃ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত 'শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নটজীবন' শীর্ষক প্রবন্ধ: 'রূপ ও রঙ্গ', ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ )

১০. সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৮৯৪ )।

এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বহরমপুর থেকে

কলকাতায় ফিরে এসে হিন্দু ন্যাশনাল আর ন্যাশনালের দল আর একবার সম্মিলিতভাবে ১৮৭৩-এর ১৬ই জুলাই তারিখে অপেরা হাউসে মাইকেলের অপোগণ্ড সন্তানদের সাহায্যকল্পে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করে। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর যথাক্রমে 'ভীমসিংহ' ও 'ধনদাস'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মাইকেলের তিরোভাব দিবস ২৯এ জুন, ১৮৭৩।

১১. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ২৯এ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩।

১২. আজ যেখানে বিডন স্ট্রীট ডাকঘর অবস্থিত, সেখানে মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' দিয়ে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট বাঙলা দেশের দ্বিতীয় সাধারণ রঙ্গালয় 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর উদ্বোধন হয়। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সেকালের বিখ্যাত ধনী ছাতুবাবুর ( আশুতোষ দেব ) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ। এই প্রথম স্থায়ী রঙ্গালয় আর এখানেই প্রথম বেশ্যা-অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয়। প্রথম যে-চারজন বারাঙ্গনাকে অভিনয়-কার্যে নির্বাচিত করা হয় তাঁদের নাম শ্যামা, গোলাপ ( সুকুমারী দত্ত ), এলোকেশী ও জগত্তারিণী।

১৩. 'মোহান্তের এই কি কাজ' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩। নাটকটির রচয়িতা লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় চলছে, কিন্তু জমছে না, শেষে বাবা তারকনাথ মুখ তুলে চাইলেন; মোহান্ত মহারাজ এক ষোড়শী এলোকেশী যাত্রীর রূপে মোহিত হলেন, এলোকেশীর স্বামী পত্নী বধ করলেন, কে একজন বাঙ্গালী ( ক্রশ্চান বোধ হয় ) 'মোহান্তের এই কি কাজ' বলে নাটক লিখলেন, সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সারা বেঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল, আমি আর নগেন উপরি-উপরি দু'রাত্রি টিকিট কিনতে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। মাইকেলের পরামর্শে নারী একট্রেস নিয়েও যে-বেঙ্গল থিয়েটার খালি বেঞ্চির সামনে প্লে কচ্ছিল, মোহান্ত-মাহাত্ম্য কীর্তনে সেই বেঙ্গলের দরজা থেকে রাত্রির পর রাত্রি শত শত লোক ফিরে যেতে লাগল।" ( 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় )

১৪. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে অভিনেত্রী বিনোদিনীর সাক্ষ্য ভিন্ন। তিনি লিখেছেন: "একদিন ভুবনবাবু ও ধর্মদাসবাবু বেঙ্গল থিয়েটার দেখতে যান; বোধ হয় 'পাশ' নিয়েই যান, কিম্বা এইরকম একটা কিছু, জানাশুনা ছিল, বন্ধুভাবেই গিয়ে থাকবেন, ভেতরে গ্রীণ রুমের মধ্যেও যান। বেঙ্গল থিয়েটারের তখনকার কর্তৃপক্ষগণ কিন্তু, কি কারণে ঠিক

জানি না, ওঁদের ভিতরে যাওয়াটা পছন্দ করেন না। একটু বচসাও হয়। এই মনোমালিন্য হতেই গ্রেট ন্যাশনালের উৎপত্তি। ভুবনবাবু ধনবান ছিলেন; তিনি নীরবে এ অপমান সহ্য করতে পাল্লেন না। ধর্মদাসবাবুর সাহায্যে তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে থিয়েটার ক'রলেন। তাঁর সেই থিয়েটারই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, আর তার প্রথম ম্যানেজার আমার যতদূর মনে হয়, স্বর্গীয় ধর্মদাস স্থর। তিনিই বাঙ্গালার প্রথম ও প্রধান স্টেজ ম্যানেজার।" ('আমার অভিনেত্রী জীবন')

১৫. ভুবনমোহন নিয়োগীর বয়স তখন মাত্র ষোল। ১৯২৭-এর ৮ই মে সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৬. হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার চুঁচুড়ায় ১৮৭৩-এর ১৩ই সেপ্টেম্বর 'মোহান্তের এই কি কাজ' অভিনয় করেন। এই প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "ইতিমধ্যে আমরা একবার চুঁচুড়ায় গিয়া 'মোহান্তের এই কি কাজ' অভিনয় করিয়া আসিলাম। এলোকেশী সাজিলেন ক্ষেত্র গাঙ্গুলী; নগেন, নবীন সাজিলেন; আমি হইলাম এলোকেশীর বাবা।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

১৭. ২৯এ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩।

১৮. অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করছেন: "...মহেন্দ্রনাথ দাসের নিকট জমি ভাড়া লইয়া (৬নং বিডন স্ট্রীট; বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটার যেখানে অবস্থিত; মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় পাঁচ বৎসরের লিজে—শ. ভ) আমরা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়া লিউইস্ থিয়েটারের অনুকরণে একখানি কাঠের বাড়ি তৈরী করিলাম।...আমরা তখন ছন্নছাড়া হইয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি। লিউইস্ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষেরা পুরাতন স্থলতানার বাড়িটি ভাঙ্গিয়া অন্যত্র নূতন থিয়েটার স্থাপিত করিলেন। ধর্মদাস, নগেন ও আমি স্থলতানার বাড়ির মডেল দেখিয়া আসিলাম। ধর্মদাস ঐ মডেলের অনুকরণে নূতন থিয়েটারের বাড়ি নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে কখনও কোথাও engineering শেখে নাই। আমি দিনরাত তাহার সঙ্গে থাকিতাম। আমরা 'পিট'-এর টিকিট কিনিয়া লিউইস থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে গেলাম। অতদূরে বসিয়াও ধর্মদাস curtain-এ কয়-পর্দা কাপড় লাগে তাহা ঠিক করিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে বাজারে কাপড়ের দোকানে গিয়া কাপড়ের বহর দেখিয়া সমস্ত নিজে যোগাড় করিয়া লইল। এইজন্যই আমি বলি যে, ধর্মদাস বাঙালীকে স্টেজ নির্মাণ করিতে শিখাইয়াছেন, অর্দ্ধেন্দু ও গিরিশবাবু বাঙ্গালীকে অভিনয় করিতে শিখাইয়াছেন।

এই স্টেজ নির্মাণ করাইতে ভুবন নিয়োগীর ত্রয়োদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ২য় পর্যায়)

এই প্রসঙ্গে ধর্মদাস সুরও তাঁর 'আত্মজীবনী'-তে লিখেছেন: "আমার চেষ্টায় ও ভুবনমোহন নিয়োগীর পয়সায় বিডন স্ট্রীটে মহেন্দ্রনাথ দাসের জমি ভাড়া লইয়া (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার) এক কাষ্ঠের ঘর নির্মাণ করি ও উহার নাম দেওয়া হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। এই বাটী নির্মাণ করিবার জন্য আমি ইংরাজ বা ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য লই নাই; তবে ড্রপসিন ও আর দু-চার খানি সিন মিঃ গ্যারিককে দিয়া আঁকান হয়।" ('নাট্যমন্দির', ভাদ্র ১৩১৭)

১৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উৎসব প্রসঙ্গে লিখেছেন: "মূল ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২। পর-বৎসর এই তারিখে মূল দল হইতে বিভক্ত দুই সম্প্রদায়ই, অর্থাৎ 'ন্যাশনাল' আর 'গ্রেট ন্যাশনাল' উভয়েই, ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উৎসব করেন। ১৮৭৩, ১০ই ডিসেম্বর তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় আমরা পাই,—

The Great National and National Theatres.—On Sunday, the 7th instant, the first anniversaries of both the Hindu Theatres were held with mueh eclat and enthusiasm. The venerable Raja Kalikrishna Deva Bahadur, K. G. S., presided. At the former he delivered a Sanskrit benediction, and at the latter suitable songs in the Sanskrit language were harmoniously sung by amateur performers.

গ্রেট ন্যাশনালের সাম্বৎসরিক উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ আমি পাই নাই। কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটারের সভা চিৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে হয়। বিখ্যাত নাট্যকার মনোমোহন বসু এই সভায় একটি বক্তৃতা করেন।" ('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৩৬)

২০. কালীকৃষ্ণ দেব (১৮০৮-১৮৭৪): কলকাতার শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ দেবের (১৭৩২-১৭৯৭) পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র কালীকৃষ্ণ। ইনি ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। Rasselas, Gay's Fables প্রভৃতি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ক'রে যশস্বী হয়েছিলেন। এই বংশেরই অপর শাখাস্থ রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের (১৭৮৪-১৮৬৭) মৃত্যুর পর কালীকৃষ্ণই হিন্দু সমাজের নেতা রূপে গণ্য হতেন।

২১. মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২): জন্ম চব্বিশ পরগণার ছোটজাগুলিয়া

গ্রামে। বাল্যে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (বর্তমান হেয়ার) ডেভিড হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৪২) কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিউশনে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বাংলায় প্রবন্ধ রচনা ক'রে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। ইনি ছিলেন কবি ঈশ্বরগুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) শিষ্য। ছাত্রাবস্থা থেকেই 'প্রভাকর' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন, পরে নিজেই 'বিভাকর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'মধ্যস্থ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, পরে এটি পাক্ষিক ও শেষে মাসিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ ক'রে তিনি 'দুলীন' নামে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক 'পদ্যমালা' সেকালে অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছিল। তিনি যাত্রা, হাফ আকড়াই, পাঁচালী, সংকীর্তন, বাউল প্রভৃতি নানাবিষয়ক সঙ্গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর রামাভিষেক নাটক, সতী নাটক ও হরিশ্চন্দ্র নাটক বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত হয়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

২২. অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "আমি ও দেবেন্দ্র নামক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আমরা কয়জন মিলিয়া 'কাম্যকানন' নামে একটা নাটকই বলুন আর Fairy Talesই বলুন, রচনা করিয়া ফেলিলাম।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়)

২৩. প্রথম অভিনয় রজনীতে অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রেক্ষাগৃহে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন, অভিনয়ে অংশে গ্রহণ করেন নি।

২৪. পাঁচটি মাত্র দৃশ্য অভিনীত হ'তে না হ'তেই ঐ অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়।

২৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিশ্বকোষ'-এর 'রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)' প্রবন্ধের (পৃ. ১৯৬) নজির দেখিয়ে লিখেছেন: "রাজেন্দ্রনাথ পাল এই দলের কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সাম্বৎসরিক উৎসবের পর এখানে তাঁহাদের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৩ সনের ১৩ই ডিসেম্বর।" ('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৪১)

২৬. সান্যাল বাড়িতে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর এই শাখার শেষ অভিনয় ২৮এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪। এঁরা এখানে মোট তেরো রাত্রি অভিনয় করেছিলেন। ১৮ই এপ্রিল তারিখে এই দল 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে

হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার হরলাল রায়ের 'হেমলতা' নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে। ( দ্রঃ 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৭৮-১৭৯)

২৭. গিরিশচন্দ্র তৎপূর্বেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। কারণ, ১৮৭৪-এর ২১এ ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশনালে অনুষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' ( গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্তিত ) নাট্যাভিনয়ে গিরিশচন্দ্র 'পশুপতি' আর অর্দ্ধেন্দুশেখর 'হৃষীকেশ' সেজেছিলেন। 'হেমলতা' অভিনয়ের সময় (১৮ই এপ্রিল, ১৮৭৪) গিরিশচন্দ্র ছিলেন গ্রেট ন্যাশনালের অবৈতনিক পরিচালক। তারপর তিনি বেশ কিছুকাল থিয়েটারের সংস্পর্শে ছিলেন না। যখন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে স্ত্রী-অভিনেত্রী নিয়ে 'সতী কি কলঙ্কিনী?' মঞ্চস্থ হয় ( ১৯এ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ ) তখনও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে থিয়েটারের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

২৮. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯২৫) প্রথম নাটক—'পুরুবিক্রম', প্রকাশকাল ৯ই জুলাই, ১৮৭৪। বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২২এ আগস্ট, ১৮৭৪ আর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথন অভিনয়ের তারিখ ৩রা অক্টোবর, ১৮৭৪।

২৯. 'ন্যাশনালে' অর্থাৎ গ্রেট ন্যাশনালে।

৩০. 'বড়হরি' অর্থাৎ হরিদাসী।

৩১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "এতদিন পর্যন্ত গ্রেট ন্যাশনালে পুরুষদের দ্বারাই স্ত্রী-চরিত্র অভিনীত হইত। এই সময়ে কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী নামে পাঁচটি অভিনেত্রী সংগৃহীত হইল।" ( 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৫৭)

৩২. অমৃতলাল বসু ও হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতে 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্য নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথের রচনা। রাধামাধব করও তাই লিখে গেছেন ( দ্রঃ 'বঙ্গীয় নাট্যশালার আর এক জনক': 'রঙ্গমঞ্চ', আশ্বিন ১৩১৭ )। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে নগেন্দ্রনাথই রচয়িতা।

৩৩. 'ভারতে যবন' নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণচন্দ্রের রচনা।

৩৪. লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর 'আনন্দ-কানন' ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' অভিনয়ের তারিখ যথাক্রমে ১৪ই ও ২১এ নভেম্বর, ১৮৭৪। অর্দ্ধেন্দুশেখর ভুল ক'রে ২৯এ নভেম্বর উল্লেখ করেছেন। 'আনন্দ-কানন'-এ অর্দ্ধেন্দু 'অবিবেক' সেজেছিলেন।

৩৫. অর্দ্ধেন্দুশেখর এখানেও তারিখ ভুল করেছেন। সঠিক তারিখ ১২ই ডিসেম্বর। ঐদিন বেঙ্গল থিয়েটারে 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনীত হয়।

৩৬. 'শত্রু-সংহার'-এর তৃতীয় অভিনয় রজনীর তারিখ ১৯এ ডিসেম্বর, ১৮৭৪। প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয় রজনীর তারিখ যথাক্রমে ২রা ডিসেম্বর ও ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭৪। এই নাটকেই একটি ছোট্ট পার্ট নিয়ে ( 'দ্রৌপদীর সখী' ) স্বনামধন্যা অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী (১৮৬৩-১৯৪১) রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হন।

৩৭. ১৮৭৪-এর ২৬এ ডিসেম্বর বেঙ্গল থিয়েটার হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'মণিমালিনী' অভিনয় করে আর ঐ একই দিনে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' মঞ্চস্থ করে। শেষোক্ত নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর 'রাজা লক্ষ্মণ সেন' সেজেছিলেন।

এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। এই সময়েই অর্থাৎ ১৮৭৪-এর শেষের দিকে সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী গোলাপ ( সুকুমারী দত্ত ) বেঙ্গল থিয়েটার ত্যাগ করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেন। বেঙ্গল থিয়েটারে গোলাপ শরৎচন্দ্র ঘোষের শিক্ষায় গঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রেট ন্যাশনালে অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার স্পর্শে গোলাপের সৃজনীশক্তি পূর্ণতা লাভ করে। 'বিশেষজ্ঞ' ( কিরণচন্দ্র দত্ত ) লিখেছেন: "এখানে ( গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে—শ.ভ. ) শিক্ষক ছিলেন নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর। গোলাপ বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়-রীতি ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে ফুটিয়া উঠিল, তাহার প্রশংসার মাত্রা দশগুণ বাড়িয়া গেল। অর্দ্ধেন্দুবাবুর হাতে সুকুমারীর অনেক সুপ্তশক্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং সুকুমারীও নাট্যকলার রহস্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া তাহা উপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করিতে শিখিল। বিনোদিনীও প্রথম হইতেই অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষালাভে ভাগ্যবতী হওয়ায় তাহার অভিনয়ের ঔজ্জ্বল্য সর্বাপেক্ষা মনোহর হইয়াছিল।" ( 'অভিনেতৃ-কাহিনী' : দ্রঃ 'নাট্যমন্দির' পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩২০—আষাঢ় ১৩২১ )

## নবম পরিচ্ছেদ

### পরবর্তী নাট্যপ্রবাহ

গিরিশ-পরিচালিত ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৭-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২৯এ সেপ্টেম্বর ও ৩রা অক্টোবর যথাক্রমে 'কমলে কামিনী', 'আগমনী ও 'অকালবোধন' মঞ্চস্থ হ'ল। এদের মধ্যে শেষোক্ত গীতিনাট্যদ্বয় গিরিশচন্দ্রেরই রচনা।

অল্পদিনের মধ্যেই ন্যাশনাল থিয়েটার জ'মে উঠলো। কিন্তু এই জমে ওঠার মুখেই সাংসারিক অশান্তি এড়াবার উদ্দেশ্যে গিরিশচন্দ্র তাঁর শ্যালক দ্বারকানাথ দেবকে ন্যাশনাল থিয়েটারের লিজের স্বত্ব হস্তান্তরিত করেন।

দ্বারকানাথের আমলে ১লা ডিসেম্বর 'মেঘনাদ বধ' মঞ্চস্থ হয়। ১৮৭৮-এর গোড়ায় ন্যাশন্যাল থিয়েটারের লিজ হস্তান্তরিত হয় কেদারনাথ চৌধুরীর কাছে। কেদারনাথের আমলে মঞ্চস্থ হয় নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' ( ৫ই জানুয়ারি ), কুঞ্জ বসুর 'আনন্দমিলন' ( ২৬এ জানুয়ারি ), গিরিশচন্দ্রের 'দোললীলা' ( ৪ঠা মার্চ ), বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ( ৯ই মার্চ ), 'মৃণালিনী' ( ১৬ই মার্চ ) ও 'দুর্গেশনন্দিনী' ( ২২ এ জুন )।

একদিন 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়কালে মঞ্চের ওপর প'ড়ে-থাকা বিদ্যা-দিগ্‌গজের ভুক্তাবশিষ্ট ফুটির খোসায় পা প'ড়ে জগৎসিংহরূপী গিরিশচন্দ্র প'ড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পান। তাঁর বাঁ হাতের কব্জী ভেঙে যায়। তিনি মঞ্চ থেকে সাময়িক অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে দর্শক স্রোতে ভাটা পড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গে দলেও নানারকম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ১৮৭৯-র গোড়ার দিকে কেদার চৌধুরী ন্যাশনাল থিয়েটারের সাব-লিজ গোপীচাঁদ কৈঁইয়া ( শেঠী ) নামে এক মারোয়াড়িকে হস্তান্তরিত করেন। এর পরের ইতিহাস ন্যাশনাল থিয়েটারে ক্রমাগত লেসী বদল। অবশেষে ভুবনমোহন নিয়োগীর ঋণের দায়ে ন্যাশনাল থিয়েটার নিলামে উঠলে প্রতাপচাঁদ জহুরী নামে জনৈক ধনী মারোয়াড়ি ব্যবসাদার পঁচিশ হাজার টাকায় ন্যাশনাল থিয়েটার ( অর্থাৎ সাবেক গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ) কিনে নিলেন।

জহুরী জাত ব্যবসাদার। তিনি বুঝেছিলেন সুপরিচালিত হ'লে থিয়েটার লাভের ব্যবসা হতে পারে। আর এও বুঝেছিলেন যে, থিয়েটার ভালভাবে চালাতে হ'লে গিরিশচন্দ্রের মতো একজন পাকা লোক দরকার। তাই প্রথমেই তিনি গিরিশবাবুর কাছে গেলেন। গিরিশচন্দ্র তখন ছত্রিশ বৎসরের যুবক, পার্কার

কোম্পানির দেড়শো টাকার মাইনের বুক-কিপার। প্রতাপচাঁদ গিরিশচন্দ্রকে ন্যাশনাল থিয়েটারের বেতনভোগী ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করবার জন্যে আহ্বান করলেন। গিরিশচন্দ্রও বুঝলেন, এক ব্যবসাদারের হাতে প'ড়ে দেশে থিয়েটার যখন ব্যবসা হিসেবে স্থায়ী রূপ নিতে যাচ্ছে তখন তিনি আর দ্বিধা না করে নটের বৃত্তি গ্রহণ করলেন। গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানির চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে একশো টাকা বেতনে নাট্যশালার শুভসাধনের ভার নিলেন। এ ঘটনা ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের শেষাশেষি। এই সময়েও অর্দ্ধেন্দুশেখর বিদেশে।

প্রতাপ জহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র একে একে মঞ্চস্থ করলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'হামির' (১।১।১৮৮১), স্বরচিত রাসলীলা' (১২।১।১৮৮১), 'শিবের বিবাহ' ( ১৫।১।১৮৮১ ), 'মায়াতরু' ( ২২।১।১৮৮১ ), 'মোহিনী প্রতিমা' ও 'আলাদিন' ( ৯।৪।১৮৮১ ), 'আনন্দ রহো' ( ২১।৫।১৮৮১ ), 'রাবণ-বধ' ( ৩০।৭।১৮৮১ ), 'সীতার বনবাস' ( ১৭।৯।১৮৮১ ), 'অভিমন্যু-বধ' ( ২৬।৯।১৮-৮১ ), 'লক্ষ্মণ-বর্জন ( ৩০।১২।১৮৮১১, ) 'সীতার বিবাহ' ( ১১।৩।১৮৮২ ), 'ব্রজ-বিহার' ( ১।৪।১৮৮২ ), 'রামের বনবাস' ( ১৫।৪।১৮৮২ ), 'সীতাহরণ' ( ২২।৭ ১৮৮২ ), 'ভোটমঙ্গল' ( ৭।১০।১৮৮২ ), 'মলিন মালা' ( ২৮।১০।১৮৮২ ) ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' ( ১৩।১।১৮৮৩ )।

অভিনয় জমাবার জন্যে গিরিশচন্দ্র তাঁর শিষ্যদের অভিনয়সৌকর্যার্থ পৌরাণিক নাটকগুলো ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে (acting verse) লিখলেন। এই 'জলবৎতরল' ছন্দে অভিনয় হ'ল সহজসাধ্য ও সুরপ্রধান। প্রতাপ-গিরিশ যোগাযোগে দেশে থিয়েটার ব্যবসা হিসেবে ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

ন্যাশনাল থিয়েটার যখন সুপ্রতিষ্ঠিত তখনই তার ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হ'ল। গিরিশচন্দ্রের দৌলতে প্রতাপচাঁদের দিব্বি মুনাফা হচ্ছে অথচ অভিনেতৃদের বেতনবৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি বদ্ধমুষ্টি। গিরিশচন্দ্রের পুনঃপুনঃ তাগাদা সত্ত্বেও ফলোদয় হয় না। বিরক্ত হয়ে গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাঁদের থিয়েটার ছাড়লেন। তাঁর অনুবর্তী হলেন অমৃতলাল মিত্র, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, নীলমাধব চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, বিনোদিনী প্রভৃতি অভিনেতৃবৃন্দ। এঁরা সেই বছরেই বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারের পত্তন করেন (২১এ জুলাই, ১৮৮৩)।

গিরিশচন্দ্রের শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন কেদারনাথ চৌধুরী। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, বহুকাল পরে কলকাতার দর্শকবৃন্দ অর্দ্ধেন্দুকে আবার রঙ্গমঞ্চে দেখতে পেলেন।

কেদারনাথের আমলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' ( কেদারনাথ কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্তিত ) মঞ্চস্থ হ'ল ( ৭ই মে, ১৮৮৩ )। অর্দ্ধেন্দু 'মহাপুরুষ'-রূপে মঞ্চে

আবির্ভূত হলেন। ললিতচন্দ্র মিত্র 'অর্দ্ধেন্দু কথা'-য় লিখেছেন: "আনন্দমঠে তিনি যখন মহাপুরুষ সাজিয়া সত্যানন্দকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন, সে গুরু-গম্ভীর স্বর এখনও আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে।" ('মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক ১৩২৭) কিন্তু প্রতাপচাঁদ ভাগুনধরা রঙ্গালয় থেকে সরে দাঁড়ালেন। পুনরাগমন হ'ল ভুবনমোহন নিয়োগীর (১৮৮৫ খ্রীঃ)। তিনি এবার লেসী। রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানীর হাট'-এর নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়' (কেদারনাথ কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্তিত) মঞ্চস্থ হ'ল (৩রা জুলাই, ১৮৮৬)। অর্দ্ধেন্দু 'রমাই ভাঁড়' সাজলেন। অতঃপর প্রতাপচাঁদ বনাম ভুবনমোহনের মকদ্দমা শুরু হয়। পরিণামে ন্যাশনাল থিয়েটারের বাড়ি নিলামে ওঠে। হাতিবাগানের স্টার আড়াই হাজার টাকায় কিনে নিয়ে বাড়ি ভেঙ্গে ফেলে (১৮৮৬ খ্রীঃ)। ন্যাশনাল থিয়েটার নিশ্চিহ্ন হ'ল। পরবর্তী কালে এই জমিতেই মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়।

মারোয়াড়ি সম্প্রদায়ের ধনাঢ্য যুবক গুর্মুখ রায়ের অর্থে বিডন স্ট্রীটে বাগবাজারের কীর্তিচন্দ্র মিত্রের জমি লিজ নিয়ে সেখানে যে-নাট্যশালাটি নির্মিত হয়েছিল তারই নাম স্টার থিয়েটার।

গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে স্টারের দ্বারোদঘাটন করা হয় (২১এ জুলাই, ১৮৮৩)। তারপর মঞ্চস্থ হয় গিরিশচন্দ্রের 'ধ্রুবচরিত্র' (১১।৮।১৮৮৩) আর 'নলদময়ন্তী' (২২।১২।১৮৮৩)। এই সময়ে গুর্মুখ রায় ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে মাত্র এগারো হাজার টাকার বিনিময়ে স্টারের স্বত্ব অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী আর হরিপ্রসাদ বসুকে বিক্রি করে দিলেন। এ ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র ছিলেন মধ্যস্থ।

অতঃপর এখানে একে একে মঞ্চস্থ হয় গিরিশচন্দ্রের 'কমলে কামিনী' (২৯।৩।১৮৮৪), 'বৃষকেতু' ও 'হীরার ফুল' (১৬।৪।১৮৮৪), 'শ্রীবৎসচিন্তা' (৭।৬।১৮৮৪), 'চৈতন্যলীলা' (২।৮।১৮৮৪), 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (২২।১১।১৮৮৪), 'নিমাই সন্ন্যাস' (২৮।১।১৮৮৫), 'প্রভাস যজ্ঞ' (৩।৫।১৮৮৫), 'বুদ্ধদেব চরিত' (১৯।৯।১৮৮৫), 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' (৩।৭।১৮৮৬), 'বেল্লিকবাজার' (২৪।১২।১৮৮৬) ও 'রূপ-সনাতন' (২১।৫।১৮৮৭)।

স্টারের তখন প্রবল প্রতিপত্তি! কিন্তু এই প্রতিপত্তিই তার বিপত্তির কারণ হ'ল। 'বেল্লিকবাজার'-এর অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা দেখে কলুটোলার প্রসিদ্ধ ধনকুবের মতিলাল শীলের (১৭৯১-১৮৫৪) নাতি গোপাললালের থিয়েটার

খোলবার শখ হয়। গোপাললাল সুকৌশলে স্টারের বাড়ির জমি কিনে নিয়ে স্বত্বাধিকারীদের প্রতি উচ্ছেদের নোটিশ জারি করলেন। তাঁরা তিরিশ হাজার টাকার বিনিময়ে গোপালবাবুকে বাড়ি ছেড়ে দিলেন কিন্তু স্টারের নাম (গুড্‌উইল) হাতছাড়া করলেন না। ঐ টাকায় তাঁরা হাতিবাগানে জমি কিনে আবার স্টারের ভিতপত্তন করলেন।

গোপালবাবু তাঁর থিয়েটারের নাম রাখলেন 'এমারেল্ড'। দল গড়লেন অর্দ্ধেন্দু, ধর্মদাস, রাধামাধব কর, মতি সুর, মহেন্দ্র বোস, সুকুমারী দত্ত, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিনী(ভুনী), কিরণশশী (ছোটরানী) প্রভৃতি অভিনেতৃদের নিয়ে। ম্যানেজার করলেন কেদার চৌধুরীকে।

মহা ধুমধাম ক'রে কেদার চৌধুরীর 'পাণ্ডব নির্বাসন' দিয়ে এমারেল্ড থিয়েটার খোলা হ'ল (৮ই অক্টোবর, ১৮৮৭)। অর্দ্ধেন্দুশেখর ধৃতরাষ্ট্র, মহেন্দ্র বোস দুর্যোধন, মতিসুর যুধিষ্ঠির, রাধামাধব কর শকুনি, কিরণশশী ভানুমতী আর বনবিহারিনী দ্রৌপদী সাজলেন। কিন্তু অভিনয় জমলো না। অধিকাংশ আসন শূন্য পড়ে থাকতে লাগল। পালা বদল করা হ'ল। ১৩ই নভেম্বর খোলা হ'ল পুরাতন নাটক 'আনন্দ-কানন'। অর্দ্ধেন্দু 'অবিবেক' সাজলেন। এ নাটকও জমলো না।

গোপালবাবু দেখলেন, থিয়েটার খোলা হয়েছে বটে কিন্তু স্টারের মত জমজমাট হচ্ছে না। গিরিশচন্দ্রের অভাবে কেমন যেন শিবহীন যজ্ঞ হচ্ছে। তিনি তখন স্টার থেকে গিরিশচন্দ্রকে ভাঙাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র অসহায় শিষ্যদের ছেড়ে আসতে চাইলেন না। এদিকে গোপাললালের জেদ যেমন ক'রেই হোক গিরিশবাবুকে আনতে হবে। আগাম বিশ হাজার টাকা আর মাসিক সাড়ে তিনশো টাকা মাইনেতে পাঁচ বছরের কড়ারে এমারেল্ডের ম্যানেজারি নেবার জন্যে গোপালবাবু গিরিশবাবুর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন; অন্যথা গুণ্ডা ও আগুনের সাহায্যে তিনি স্টার নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবেন। গিরিশচন্দ্র পড়লেন উভয়সঙ্কটে।

গিরিশচন্দ্র তাঁর শিষ্যদের বললেন—'লোকটা অপরিমিত ধনী, গোঁয়ার ও খেয়ালী, থিয়েটারের খেয়াল তার বছরখানেকের বেশি টিকবে না, তাকে চটিয়ে থিয়েটারের ক্ষতি করার চাইতে তার মতে মত দেওয়াই ভালো। বৎসরান্তে গোপাললালের থিয়েটারের নেশা কেটে গেলে আমি আবার ফিরে আসবো।'

গিরিশচন্দ্র গোপাল-প্রদত্ত বোনাসের বিশ হাজার টাকা স্নেহের দান হিসেবে শিষ্যদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এই টাকা দিয়ে তোমরা হাতিবাগানে নিজস্ব

থিয়েটার বাড়ি বানাও। তোমাদের প্রয়াস ব্যর্থ হবে না, যদি তোমরা নাট্য-শিল্পের ও নাট্যশিল্পীদের মর্যাদা রক্ষা ক'রে চল।'

এতগুলো টাকা এইভাবে হাতছাড়া হ'ল দেখে গিরিশবাবুর ভাই অতুলকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। এতে স্টারের স্বত্বাধিকারীরা মাত্র চার হাজার টাকা অতুলবাবুকে ফেরত দেন।

এমারেল্ডে গিরিশের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই কেদার-অর্দ্ধেন্দু-রাধামাধবের প্রস্থান হ'ল। ১৮৮৭-র ৩রা ডিসেম্বর থেকে হ্যাণ্ড্‌বিলে এমারেল্ডের ম্যানেজার হিসেবে গিরিশচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হ'তে থাকল। কিন্তু পাঁচ বছর তাঁকে এমারেল্ডে থাকতে হয় নি। খেয়ালী বড়লোকের শখের থিয়েটার। গোপাললালের শখ মিটে গেল। তিনি এমারেল্ড থিয়েটার ইজারা দিয়ে দিলেন। স্বত্বাধিকারী বদলের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের চুক্তিও বাতিল হয়ে গেল। ১৮৮৮-র অক্টোবরে গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড ছাড়লেন।

এদিকে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ৩৮ নম্বর মেছুয়াবাজার রোডে কবি রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯—১৮৯৪) শুধু পুরুষ অভিনেতা নিয়ে 'বীণা থিয়েটার' খুললেন। এর ফল ফলতে বেশি দেরি হ'ল না। দর্শকাভাবে রঙ্গালয়ের নাভিশ্বাস উঠলো। ব্যয়ের সীমা আয়কে লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করার ফলে বিপুল পরিমাণ ঋণ দাঁড়িয়ে গেল। ঋণ পরিশোধের আশায় ১৮৮৮-র মে মাসে রাজকৃষ্ণ 'বীণা থিয়েটার' আর্য-নাট্য-সমাজকে ভাড়া দিলেন। আর্য-নাট্য-সমাজেও স্ত্রী-ভূমিকায় বালক-অভিনেত্রী নামে। বলাবাহুল্য, প্রেক্ষাগৃহের আসনগুলো শূন্য পড়ে থাকে। নভেম্বর মাসে আর্য-নাট্য-সমাজও পাততাড়ি গুটিয়ে নেয়। শেষের দিকে অর্দ্ধেন্দুশেখর এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' পত্রে (৯ই নভেম্বর, ১৮৮৮) সেই খবরটি পাওয়া যায়—

"বিখ্যাত অভিনেতা বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী আর্য-নাট্য-সমাজে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় নীলদর্পণের অভিনয় যে বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'রাজকৃষ্ণ রায়': 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫০'; পৃঃ ২০ থেকে পুনরুদ্ধৃত)

আর্য-নাট্য-সমাজ থেকে অর্দ্ধেন্দু আবার এমারেল্ডে যোগদান করলেন (মার্চ, ১৮৮৯ খ্রীঃ)। ১৩ই জুলাই তারিখে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'বক্কেশ্বর' প্রহসনে তাঁকে নাম-ভূমিকায় দেখা গেল। তারপর এমারেল্ড থিয়েটার সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২৫এ মে, শুক্রবার, ফুলদোলের দিন হাতিবাগানে নব-নির্মিত নিজস্ব সুরম্য ভবনে সমারোহসহকারে স্টারের উদ্বোধন হয় গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটক দিয়ে।

'নসীরাম' দর্শকের কাছে আদৃত না হওয়ায় অমৃতলাল বসু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত পারিবারিক উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'-কে নাটকাকারে পরিবর্তিত করলেন। সরলার মৃত্যুতে নাটকের সমাপ্তি তাই নাম রাখলেন 'সরলা'। ২২এ সেপ্টেম্বর 'সরলা' মঞ্চস্থ হ'ল। এ নাটক জন-সংবর্ধনা লাভ করল। আর্থিক দিক দিয়ে স্টার দাঁড়িয়ে গেল।

অক্টোবর মাসে গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড থেকে স্টারে এসে অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। একে একে মঞ্চস্থ হ'ল তাঁর 'প্রফুল্ল' (২৭।৪।১৮৮৯), 'হারানিধি' (৭।৯।১৮৮৯), 'চণ্ড' (২৬।৭।১৮৯০), 'মলিনাবিকাশ' (১৩।৯।১৮৯০), 'মহাপূজা' (২৪।১২।১৮৯০)। কিন্তু নানা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ ঘটতে থাকে। তার ফলে স্টার থেকে গিরিশচন্দ্র বরখাস্ত হয়ে গেলেন।*

স্টারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের চুক্তি ছিল, যদি গিরিশচন্দ্র স্বেচ্ছায় স্টারের চাকরি ছাড়েন তাহ'লে তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা খেসারত দিতে হবে আর স্টার যদি তাঁকে বরখাস্ত করে তা'হলে স্টারের পক্ষ থেকে তাঁকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ মাসিক একশো টাকা ক'রে দেওয়া হবে। মাসে মাত্র একশোটি টাকা নিয়ে বাড়ি বসে থাকা গিরিশচন্দ্রের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল। সুতরাং তিনি একটি নতুন থিয়েটার গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। তারই ফলে মিনার্ভা থিয়েটারের সৃষ্টি হয়।

*'রোজ রোজ সেই বোলো হাজার টাকা দেবার কথা বলতেন, তাই তাড়িয়ে দিলে।'—নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী (দ্রঃ রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু প্রণীত 'শিশির সান্নিধ্যে'—পৃ. ৩৬)

## দশম পরিচ্ছেদ

### মিনার্ভা থিয়েটারে নটলীলা ( ১৮৯৩-৯৪ )

বিডন স্ট্রীটে যেখানে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খোলা হয়েছিল সেইখানেই মিনার্ভা থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। স্বত্বাধিকারী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র। অর্দ্ধেন্দু ভ্রমণের পালা সাঙ্গ ক'রে ফিরে এসেছেন, মিনার্ভায় যোগ দিলেন। বহুকাল পরে দুই প্রতিভাধরের মিলন হ'ল।

গিরিশচন্দ্র শেক্‌স্‌পীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক অনুবাদ ক'রে অভিনয় করতে উদ্‌যোগী হলেন। দীর্ঘ ন'-মাস ধ'রে নাটকটির মহলা চললো।

সেকালের নামজাদা অভিনেত্রী প্রমদাসুন্দরীকে প্রথম লেডি ম্যাকবেথের পার্ট দেওয়া হয়। কিন্তু প্রমদাসুন্দরী facial expression আনতে অসমর্থ হওয়ায় নবাগতা অভিনেত্রী তিনকড়িকে গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু এই পার্টে মনোনীত করেন। কিভাবে অশিক্ষিতা তিনকড়িকে অভিনয় শিক্ষা দিয়ে তৈরি করা হয় সে সম্বন্ধে দীনবন্ধু-পুত্র ললিতচন্দ্র লিখে গেছেন—

"পরলোকগতা অভিনেত্রী তিনকড়ির লেডি ম্যাকবেথ ভূমিকার যে অতুলনীয় অভিনয়, তাহাও মুস্তফী মহাশয়ের শিক্ষার ফল। এ বিষয় তিনি নিজে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে যখন ম্যাকবেথ অভিনয়ের আয়োজন হয়, গিরিশচন্দ্র একজন পুরাতন অভিনেত্রীকে লেডি ম্যাকবেথ সাজাইবার জন্য ঠিক করেন। অর্দ্ধেন্দু ইহার অনুমোদন না করিয়া তিনকড়িকে লেডি ম্যাকবেথ সাজাইবার জন্য অনুরোধ করেন। পরে ঠিক হইল, মুস্তফী মহাশয় তিনকড়িকে শিখাইবেন এবং গিরিশচন্দ্র অপর অভিনেত্রীকে শিখাইবেন। কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র মুস্তফী মহাশয়কে বলেন যে তিনি যাহাকে শিখাইতেছেন, তাহা কর্ত্তৃক অভিনয় সম্ভব নহে, কারণ সে facial expression আনিতে অসমর্থা; তাহার আশা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। গিরিশবাবু অর্দ্ধেন্দুবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কতদুর সফল হইয়াছেন; অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন, পরীক্ষা গ্রহণ করুন। তখন রঙ্গমঞ্চ হইতে সকলকে বিদায় করিয়া তাঁহারা দুইজন এবং অভিনেত্রী তিনকড়ি মাত্র রহিলেন। গিরিশচন্দ্র তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তিনকড়ির অভিনয় দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথম অঙ্ক শেষ হইলে, তাকিয়া ছাড়িয়া উপবেশন করিলেন। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইলে বলিলেন, 'এবার যেখানে মাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ উভয়ের একসঙ্গে অভিনয় আছে আমরা দুজনে

অভিনয় করি।' তৃতীয় অঙ্ক শেষ হইলে, অভিনেত্রীকে বিদায় দিয়া দুইজনে কথা আরম্ভ করিলেন। গিরিশবাবু বলিলেন, 'লেডি ম্যাকবেথ ম্যাকবেথকে উচিয়ে গেছে, আমি ও পর্দায় উঠতে পারব না।' পূর্বেই বলিয়াছি, অর্দ্ধেন্দু গম্ভীর অভিনয়েও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, 'আচ্ছা' আমি ম্যাকবেথ সাজব।' গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 'তা অসম্ভব, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল ভূমিকা তোমার উপরে ভার দেওয়া হয়েছে, তা আর কেউ সুন্দরভাবে অভিনয় করতে সমর্থ হবে না। আর তোমাকে শেখাতে হবে না, আমি এখন আমার মনের মতন করে নেবো।' অতঃপর গিরিশচন্দ্র অভিনেত্রীকে শিখাইবার ভার লইলেন। যেদিন ম্যাকবেথ অভিনয় দেখি, লেডি ম্যাকবেথের অভিনয় দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম, বঙ্গরমণীর দ্বারা এরূপ অভিনয় হইতে পারে তাহা কল্পনার অতীত ছিল। ধন্য শিক্ষার প্রভাব! অর্দ্ধেন্দুবাবু, Witch, Old Man, Porter, Physician সাজিয়াছিলেন।* প্রত্যেক অভিনয়েই তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্বরে অভিনয় করিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী গিরিশচন্দ্র যে বলিয়াছিলেন ঐ সকল ভূমিকা অপর কাহারও দ্বারা সুন্দররূপে অভিনীত হওয়া সম্ভব নহে তাহা যথার্থই অনুমান করিয়াছিলেন।" ('অর্দ্ধেন্দু কথা' : 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক ১৩২৭)

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ম্যাকবেথ অভিনয়ের নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—

OPENING NIGHT
THE
MINERVA THEATRE
6, BEADON STREET
Saturday, the 28th January at 9 P.M.
*Shakespeare in Bengali*
MACBETH

*গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন অর্দ্ধেন্দুশেখর উক্ত চারটি পার্ট ছাড়াও First Murderer-এর পার্ট করেছিলেন। (দ্রঃ 'গিরিশচন্দ্র', পৃ. ৩৮৫) কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ চারটি পার্টের কথাই উল্লেখ ক'রে গেছেন। (দ্রঃ 'নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' ও 'অর্দ্ধেন্দুশেখরের নটজীবন')। হেমেন্দ্রকুমার রায় 'যাঁদের দেখেছি'-তে (পৃ. ৮৩) পাঁচটি পার্টের কথা লিখে গেছেন।

I have got the piece mounted
by European Artists and Dressed
it under European Supervision
and "make up" by Mr. J. Pimm.
For particulars see play-bills.
Next Day Sunday at candle light

MACBETH

G. C. GHOSH
Manager.

উদ্বোধন রজনীর অভিনয় সম্বন্ধে 'অমৃতবাজার-পত্রিকা' (৩০এ জানুয়ারি, ১৮৯৩) লেখেন—

SHAKESPEARE ON BENGALI STAGE

The Minerva Theatre Company, under the management of Babu G. C. Ghosh, gave their first performance on Saturday. As announced, the tragedy of Macbeth was the entertainment of the night, and the house was literally full, many having had to go away disappointed. Shakespeare's matter and manner are all singularly his own; yet it must be said that Babu G. C. Ghosh's translation of the immortal tragedy has been a rich contribution to Bengali Dramatic Literature. Indeed many among the audience were atonce put in mind of several well-known passages in Shakespeare's Macbeth while listening to their Bengali versions. There were flashes of histrionic talent in the display of Macbeth's character; while Lady Macbeth must have made an impression on the assembly. The stage-effect of the play was heightened by the grandeur of paintings and dresses."

দৃশ্যপটের অভিনবত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ—

"মিনার্ভা থিয়েটার সৃষ্টির সময়ে 'ম্যাকবেথ' নাটকে যে ভোজনগৃহের দৃশ্য (Banquet Hall) আঁকা হইয়াছিল, তাহাতে চিত্রকর উইলার্ড ঘরের একটা কোণ এমন কৌশলে আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন এবং তাহার পার্শ্বপট কয়খানি এমন কৌশলে মূলপটের সহিত মিলাইয়া আঁকিয়াছিলেন যে ভোজনের টেবিল ও চেয়ারগুলির সহিত দৃশ্যটি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘগৃহ অঙ্কনে এইরূপ কৃতিত্ব আমরা বঙ্গীয় নাট্যশালায় আর কোথাও দেখি নাই।" ['ধনঞ্জয়

মুখোপাধ্যায়' ছদ্মনামে ব্যোমকেশ মুস্তফী রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' ( ১লা শ্রাবণ, ১৩১৬) পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত ]

ম্যাকবেথের দ্বিতীয় অভিনয় সম্বন্ধে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার ( ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩) প্রশংসা—

MINERVA THEATRE—On Sunday night the second performance of "Macbeth" in Bengali was given at the above theatre before a large audience, including several European Gentlemen. Babu Girish Chunder Ghose, the manager, played the part of Macbeth, and the play as a whole was well rendered. A Bengali Thane of Cawdor is a lively suggestion of incongruity, but the reality is an astonishing reproduction of the standard convention of the English Stage.

'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার ( ২০এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩) মন্তব্যের কিয়দংশ—

···It is impossible to say of a Shakesperian Play that it has been acted to perfection, but we can say of this play that it was acted very well at the Minerva. The parts that were especially welldone were those of Macbeth, of Lady Macbeth who had a Mrs. Siddons-like appearance, and of the Porter.

গিরিশচন্দ্রের 'মুকুল-মুঞ্জরা' খোলা হ'ল ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩। মুকুল, মুঞ্জরা, চামেলী, তারা আর বরুণচাঁদ সাজলেন যথাক্রমে দানীবাবু, কুসুমকুমারী, বিড়ালহরি, তিনকড়ি আর অর্দ্ধেন্দু। অভিনয়ের প্রশংসা ক'রে 'ইণ্ডিয়ান নেশন' ( ১৩ই মার্চ, ১৮৯৩) লেখেন—

···The acting was worthy of the play. She is a magnificent actress who appeared as Tara. The heroine of the play, Munjara, did her part well, but seemed to be a little nervous. Her maid and confidante is a particularly sweet singer. Varunchand was not only witty himself but the cause of wit in others. An actor such as that is of invaluable service in the representation of a comedy···

এদিকে 'ম্যাকবেথ' দু'চার রাত অভিনয়ের পরই প্রেক্ষাগৃহ প্রায় দর্শকশূন্য হয়। শিক্ষিত সমাজ খুব তারিফ জানালেন বটে কিন্তু গ্যালারির দর্শকরা এ নাটকে মোটেই আকৃষ্ট হ'ল না। ম্যাকবেথের অভিনয়ে অর্থাগম না হওয়ায় গিরিশচন্দ্র এবার খুললেন নাচ-গানের বই—'আবু হোসেন'। হুলস্থূল পড়ে গেল দর্শকমহলে। মিনার্ভার তহবিল স্ফীত হয়ে উঠল।

'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় (২২এ মার্চ, ১৮৯৩) নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল—

EXTRAORDINARY ATTRACTION

A NOVEL TREAT

MINERVA THEATRE

6, BEADON STREET

Saturday, the 25th March, 1893 at 9 p.m.

COMIC OPERA

ABU HOSSAIN

OR THE MUSHROOM EMPEROR

NEXT DAY SUNDAY, AT CANDLE LIGHT

MUKUL MUNJARA

G. C. GHOSH, MANAGER.

প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি : আবুহোসেন—অর্দ্ধেন্দুশেখর, আবুর মা—গুলফমহরি, রোসেনা—বিড়ালহরি, দাই—তিনকড়ি, মশুর—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( রাঙ্গুবাবু ) ইত্যাদি।

অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন—

"গিরিশচন্দ্র যখন আবুহোসেন গীতিনাট্যের মহালা দিতে আরম্ভ করেন তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর ইচ্ছা করিয়াই আবুর ভূমিকা গ্রহণ করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর যখন ভূমিকাটি স্বয়ং চাহিয়া লইতেছেন তখন তাঁহাকে না বলা যায় না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র, যখন অর্দ্ধেন্দু একরকম জোর করিয়া এই ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, তখন মনে মনে এই ভূমিকাটির জন্য বেশ একটু হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল অর্দ্ধেন্দুশেখরের দ্বারা এই ভূমিকাটি কিছুতেই উত্তম অভিনয় হইতে পারে না। কিন্তু প্রথম রাত্রে যখন অর্দ্ধেন্দুশেখর এই আবুর ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন এবং কৌতুকঅভিনয়ের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দর্শকগণকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিলেন তখন গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছিল, অর্দ্ধেন্দু তোমার জুড়ি নাই, তোমার তুলনা কেবল তুমিই।" ( 'অর্দ্ধেন্দুশেখর' পুস্তিকা, ১৩২৭)

হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন—

"অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'আবুহোসেন' যিনি দেখেন নি, তাঁর নিতান্ত দুর্ভাগ্য। এই যুবকের ভূমিকায় বৃদ্ধ বয়সেও তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন কৌতুকরসের পরাকাষ্ঠা। তেমন 'আবুহোসেন' আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারলে না।" ('যাঁদের দেখেছি')

'আবুহোসেন' গীতি-নাট্যের সমালোচনা ক'রে 'অনুসন্ধান' (১৫ই বৈশাখ, ১৩০০ সাল: এপ্রিল, ১৮৯৩) লেখেন—

"মিনার্ভা থিয়েটার।—উক্ত রঙ্গমঞ্চে 'আবুহোসেন' নামক এক গীতিনাট্যের অভিনয় হইতেছে।

"উহা 'আরব্য উপন্যাসের' একটি গল্প। গল্পটি পুরাতন হউক, কিন্তু রঙদার।

"আবু হোসেন একজন গরীব গৃহস্থ সন্তান। ঘুম ভাঙিয়াই দেখে—সে বাদশাহ হইয়াছে। সাজ-সরঞ্জাম, আসবাব-পোশাক সবই বাদশাই; পার্শ্বে সুন্দরীগণ নৃত্য করিতেছে—সুন্দরী রোশেনারা প্রেম বিলাইতে অগ্রসর।

"আবু তো চমকাইবেই—এ বাদশাই ভোগে কার না চমক হয়।

"জহরী গিরিশবাবু, ঠিক জহরই সমুখে ধরিয়াছেন। যেমন দেশ, যেমন রুচি, যেমন দর্শক, তেমনই তো তার আয়োজন চাই?

"তা ভাল! বুঝিলাম, দেশকাল পাত্র বুঝিয়া, সঙ্‌ নাচ দিয়া, কাজ হাসিল হইল। লোকেও হাসিল-মজ্‌লিস-আমোদ পাইল।

"কিন্তু, প্রবীণ গিরিশবাবুর নিকট হইতে আমরা তো এরূপ সঙ্‌ নাচ দেখিবার আশা করি না? উদ্দেশ্যহীন সঙ্‌-রঙ্‌—এতো সকলেই দেখাইবার অধিকারী। যাঁহার হস্ত হইতে বিল্বমঙ্গল, পূর্ণচন্দ্র, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি ধর্মচ্ছবি প্রকটিত হইয়াছে—লোক ভুলাইবার জন্য—এ নাচ্‌-সঙ্‌ দেওয়া, তাঁহার মত নাট্যকারের পক্ষে এখন আর শোভা পায় না।

"একে ত এই উচ্ছৃঙ্খল সমাজের বিকৃত রুচি—কোথায় গিরিশবাবুর সে রুচি ফিরাইবার চেষ্টা করা উচিত, তা'না' তৎপক্ষেই সহায়তা করিলেন কেন? ইহা বাস্তবিকই ক্ষোভের বিষয়।

"নচেৎ, আবুহোসেনে দ্রষ্টব্য বিষয় বা কৃতিত্ব যে নাই, এমন কথা আমরা অবশ্য বলি না। অন্য কাহারও হাত দিয়া ইহা বাহির হইলে, আমরা ইহার প্রশংসাই করিতাম। চুটকির উপর একটা চটক—অবশ্য অল্প মুন্সি-আনার কথা নহে। আর, সে পক্ষে গিরিশবাবুর যে সম্মান রক্ষিত না হইয়াছে, এমনও নহে।

"তাঁহার পাগলা-গারদে—কেমন সুন্দর অভিনবত্ব আছে। কবি পাগল, বৈজ্ঞানিক পাগল, ঐতিহাসিক পাগল—কেমন নির্মল ভাবুকতার পরিচয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে একজন ধর্ম-প্রচারক ও একজন দার্শনিক পাগল থাকিলে, দৃশ্যটির যেন ষোলকলাই পূর্ণ হইত।

"তারপর, গানের সুরগুলি বেশ সুসঙ্গত ও সুনির্বাচিত। ইহাতে মিনার্ভা রঙ্গভূমির সঙ্গীত-অধ্যাপক বেশ কারিগরীর হাত দেখাইয়াছেন।

"সর্বোপরি বক্তব্য, অভিনেয় বিষয় অপেক্ষাও অভিনেতৃদিগের বাহাদুরীর কথা। বিশেষতঃ আবুর অঙ্গভঙ্গী, হাবভাব বড়ই স্বাভাবিক—বড়ই মধুর। আবুই যেন বইখানাকে জীবন দিয়াছে। হারুন-আল্-রসিদের অংশও বেশ দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছে।

"এইরূপ, দৃশ্যপটে রাজপথ প্রভৃতি, আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে।

"কিন্তু যাউক সে সব কথা—আমরা তো পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমরা এরূপ সকল সঙ্-নাচের পক্ষপাতী নহি। ইহাতে দর্শক ভুলাইতে পারা যায় সত্য, পয়সাও উপার্জন হইতে পারে, কিন্তু ইহা যেন জীবনী-শক্তিহীন—শিক্ষা উপদেশ ইহাতে যেন অতি ক্ষীণ। আমাদের অনুরোধ, এরূপ লোকের রুচিতে গা-ভাসান না দিয়া, গিরিশবাবু দেশের একটা স্রোত ফিরাইবার চেষ্টা করুন—দেশে দুই-চারি খানা ভাল নাটক যাহাতে সৃষ্টি হয় এবং অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তৎপক্ষে এখন তাঁহার মনোযোগী হওয়াই কর্তব্য। এক্ষেত্রে তাঁহার নিকট দুই একখানি শিক্ষাপ্রদ ধর্মমূলক ও সামাজিক নাটকের অবতারণা দেখিতে আমরা অভিলাষী।"

১১ই অক্টোবর (২২এ আশ্বিন, ১৩০০) নতুন বই খোলা হ'ল—গিরিশচন্দ্রের 'সপ্তমীতে বিসর্জন'। অর্দ্ধেন্দুশেখর 'মামা'-র ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

২৩এ ডিসেম্বর (৯ই পৌষ, ১৩০০) তারিখে গিরিশচন্দ্রের 'জনা' মঞ্চস্থ হয়। সেদিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—

MINERVA THEATRE
6, BEADON STREET, CALCUTTA
Sunday, the 23rd December, 1893, at 9 p.m.
*The first performance of New Mythological Drama*
*by G. C. Ghosh (by humble self)*

NEW DRAMA JANA NEW DRAMA

PLEASE

| | |
|---|---|
| JOIN | JUBILATION |
| ARTISTIC | ARRANGEMENT |
| NOVEL | NICETIES |
| ATTRACTIVE | ARTICULATIONS |

JANA— *the story taken from Ashamedh purva of the immortal epic the Mahabharat.*

Next day, Sunday, X' mas Eve day
At Candle light sharp
NALA DAMAYANTI
AND
X' MAS PANTOMIME
PARADISE OF FOOLS
COME ONE AND COME ALL

*G. C. Ghosh.*
Manager.

পাঠকের অবগতির জন্যে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'Paradise of Fools'-এরই বাংলা নাম 'বেকুবের একজাই'।

'জনা'-র প্রথম অভিনয়-রজনীর পরিচয়লিপি :—জনা—তিনকড়ি, বিদূষক—অর্দ্ধেন্দুশেখর, প্রবীর—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), নীলধ্বজ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রামুবাবু), অর্জুন—কুমুদ সরকার, ব্রাহ্মণ—গুলকমহরি, নায়িকা—ভবতারিণী, মদনমঞ্জরী—কুসুমকুমারী ইত্যাদি।

২৫এ ডিসেম্বর, বড়দিন। সেদিন অভিনীত হয় 'আবু হোসেন' এবং গিরিশ-চন্দ্রের আর একটি নতুন বই 'বড়দিনের বখশিস'। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় (২৫এ ডিসেম্বর ১৮৯৩) প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য :—

MERRY X'MAS DAY, GALA DAY
THE
MINERVA THEATRE
6, Beadon Street, Calcutta.
Monday, the 25th December, Just at Candle light

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | MONDAY | Abu Hossain | CANDLE LIGHT |
| 2. | MONDAY | Abu Hossain | CANDLE LIGHT |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | MONDAY | Abu Hossain | CANDLE LIGHT |
| 4. | MONDAY | Abu Hossain | CANDLE LIGHT |

*AND*

X'MAS PRESENTS
X'MAS PRESENTS
X'MAS PRESENTS
X'MAS PRESENTS
OR
BARADINAR BAKSIS

G. C. GHOSE
MANAGER.

'বড়দিনের বখশিস্'-এর ভূমিকালিপি :—থিয়েটারের ম্যানেজার—অর্দ্ধেন্দু-শেখর, মিঃডস্—দানীবাবু, গয়ারাম—অঘোর পাঠক, গুলজার—তিনকড়ি ইত্যাদি।

২৬এ ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, ২৭এ ডিসেম্বর বুধবার 'কমলে কামিনী' অভিনীত হয়।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারি তারিখে দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'বেজায় আওয়াজ'-এ (Royal Salute) অর্দ্ধেন্দুশেখর 'লবধন' সেজেছিলেন (দ্রঃ হেমেন্দ্র-নাথ দাসগুপ্ত প্রণীত 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ'—পৃ. ৪৮)।

প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রায় দেশভ্রমণে নিযুক্ত থাকতেন। মাঝে মাঝে তিনি কলকাতায় আসতেন, সাজতেন, শিক্ষা দিতেন, আবার অদৃশ্য হতেন। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি নাট্য-জগৎ থেকে তিনি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ফলে দর্শকসাধারণের হৃদয় থেকেও অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি যোগাভ্যাসে রত ছিলেন। এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন :

"শুনিয়াছি, তিনি বারো বৎসর যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ রকম আসন করিতে পারিতেন। যোগ করিলে কি খাইতে হয়, শস্যের জিনিস অল্প খাইতে হয়, নুন একেবারে খাইতে নাই। এই প্রকার কঠোর সংযম করিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। কতদূর জানি না, পূরকে কুম্ভকে কতদূর সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন জানি না, সমাধিতে কতদূর একাগ্রতা জন্মিয়াছিল জানি না, তাঁর যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, ক্ষয়যোগ কি লয়যোগ ছিল, জানি না। তবে

তিনি হঠে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি আবার নূতন রকমের যোগে আসিয়া পড়িলেন, সেটা নটযোগ। চিত্তের একাগ্রতা হইলেই তাহাকে যোগ বলে, নটের কার্যে তাঁহার চিত্তের একাগ্রতা হইয়াছিল, সেই তাঁহার যোগ। অন্যান্য অনেক প্রতিভাশালী লোকের মত তিনিও বলিতেন, যে কোন বিষয়ে চিত্তকে লীন করিতে পারিলে তাহাতে মুক্তি হয়। যদি সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে তফাৎ হইয়া খানিকটা এমন অবস্থায় থাকিতে পার, যাহাতে আমি-তুমি জ্ঞান থাকে না, শত্রু-মিত্র জ্ঞান থাকে না, আপনাতে আপনি মজে, তার সকল জ্ঞান সরিয়া যায়, সেইটাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম সিঁড়ি। অনেক প্রতিভাশালী লোক বলিয়া থাকেন যে, যেমন যোগের দ্বারা আত্মা, মন, বিষয় ও ইন্দ্রিয় এক হইয়া যায়, তেমনি নাচ দেখিয়াও হয়, গান শুনিয়াও হয়, নাটক দেখিয়া ছবি আঁকিয়া হয়, ৫১৮ কলার অনেক অনেক কলাতেই হয়। যাঁরা ধর্মচর্চা করেন, তাঁরা মনে করেন, আমরা পরম সুখে আছি। যেহেতু, মন্দ জিনিস আমাদের কাছে আসিতে পারে না। আমরা অনেক তপস্যা করিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছি। অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিতেন, তা নহে—তা নহে। খানিকটা তন্ময় হইলে, খানিকটা একাগ্র হইলে, খানিকটা ভুলিয়া থাকিলে, সকল কলাতেই পরম সুখের আস্বাদ পাওয়া যায়। তাঁর চেলা অমৃতবাবু বলেন, Highest art আর Highest morality একই জিনিস, morality কুৎসিত জিনিসকে ত্যাগ করে, Art কুৎসিত জিনিসকে ত্যাগ করে। Artও চায় যাহা সর্বাঙ্গসুন্দর, moralityও চায় যাহা সর্বাঙ্গসুন্দর। আমিও এই দুই নটরাজের গলায় গলা মিলাইয়া বড় গলায় বলি 'তথাস্তু'। কলা সাধিবার সময় কলার দিকেই দেখিবে, যাহাতে তোমার কলাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। তখন ধর্মপ্রচার করিতে যাইও না। তাহা হইলে কলাটিও সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে না, ধর্মপ্রচারও হইবে না। কলাতেই ধর্ম-প্রচারের সুবিধা হয়, ধর্মপ্রচারে কলার সুবিধা হয় না।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর': 'নাচঘর', ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১)

নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফীও লিখেছেন:

"কর্ণেল অলকট যখন কলিকাতায় আসেন* তখন তিনি তাঁহার শিষ্য হন ও তাঁহার মিসমেরিজম্ বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তাহাতে যথেষ্ট শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। একবার তাঁহার যোগশিক্ষার বাসনা হইল, তখন তাঁহার অবসর ছিল। শিক্ষা হইত স্বনামখ্যাত এটর্নি বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা

*কর্ণেল অলকট ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কির সাহচর্যে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে Theosophical Society প্রতিষ্ঠা করেন।

ললিতবাবুর নিকট। অতি অল্পদিনেই অর্দ্ধেন্দু ধৌতি পর্যন্ত আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে অভিনয়ক্ষেত্রে তাঁহার প্রয়োজন পড়িল, যোগ সেইখানেই শেষ হইল।" ('বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট,' ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

অতঃপর অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দিলেন এবং দর্শক-হৃদয়ে আবার পূর্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন:

"মিনার্ভার প্রথম অভিনয় ম্যাকবেথ—Porter, Witch, Oldman ও Doctor এই চারিটি অংশ গ্রহণ করেন। এই অভিনয়ে তাঁহার পূর্ব প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। পরে আবুহোসেনে 'আবুহোসেন', মুকুল মুঞ্জরায় 'বরুণচাঁদ', জনায় 'বিদূষক' দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর তিনি স্বয়ং স্বত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটার চালাইবেন—এই অভিপ্রায়ে এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইলেন।"

অর্দ্ধেন্দু চলে যাওয়ার পর গিরিশচন্দ্র 'বিদূষক' সাজতে লাগলেন।

'পুরোহিত' (বৈশাখ, ১৩০১ : এপ্রিল-মে, ১৮৯৪) লেখেন—

"মিনার্ভা থিয়েটার।—'জনার' অভিনয় এ থিয়েটারে উত্তম হইতেছে। প্রথম বিদূষক বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর ও বর্তমান বিদূষক বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের অভিনয়ের উপমাই হয় না। জনা উত্তম অভিনেত্রী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই কিন্তু যাঁহারা ম্যাকবেথ-পত্নীর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন বিবি ম্যাকবেথেরই পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া এ ক্ষেত্রে আসিয়াছেন। 'জনা' পুস্তকে জনার গঙ্গার প্রতি অচলা ভক্তি প্রদর্শিত। আর আর দেবতার প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবে জনার ব্যবহার অসমীচীন। অধিক কি, গঙ্গা-পতি স্বয়ং মহাদেবও জনার নিকট নগণ্যেরই মধ্যে। আর আদ্যাশক্তি পার্বতীর কথা কি বলিব! তিনি তো গঙ্গার সপত্নী বলিয়াই উপেক্ষিতা। অহিন্দু মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্যে জনার যে বীররসাশ্রিত লিপির নমুনা আছে, তদবলম্বনে জনাকে অতিরিক্ত তেজস্বিনী করা হইয়াছে। এতটা দেবদ্বেষ হিন্দুত্বে বাধা দেয়। আর বিদূষক। চিত্রটি বাবু মনোমোহন বসুর 'সতীনাটকের' 'শাস্তে পাগলারই' যেন সুসংস্কৃত দ্বিতীয় সংস্করণ। পুত্রবিরহকাতরা জনা ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন নূতন নূতন বেশে কেন রণপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হন? কথায় কথায় তাঁহার 'রণ' চাই। পুস্তকের এই সকল দোষসত্ত্বেও ইহার সুচারু অভিনয় হইতেছে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকি।"

মিনার্ভার এই পর্বের পালা সাঙ্গ করবার আগে পর-বৎসরে (১৮৯৫ খ্রীঃ) অনুষ্ঠিত একটি মধুর অভিনয়ের বিবরণ এই অধ্যায়ে সংযোজন করা নিতান্ত

আবশ্যক। সেটি 'প্রফুল্ল' অভিনয়-উপলক্ষে মিনার্ভা ও স্টারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে এই ঘটনা একটি অতীব উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে।

'প্রফুল্ল' নাটকের 'যোগেশ' চরিত্র অভিনেতার অভিনয়ের কষ্টিপাথর। বঙ্গরঙ্গালয়ে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন যেসব অভিনেতা এই চরিত্রে অভিনয় ক'রে তাঁদের শক্তির পরীক্ষা দিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল মিত্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দানীবাবু ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী দীপ্তিমান ছিলেন।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২৭এ এপ্রিল হাতিবাগানের স্টারে 'প্রফুল্ল' প্রথম অভিনীত হয়। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখে গেছেন—

"স্টারে যোগেশ সাজিতেন স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র। অমৃতলালের কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট ছিল। করুণ ও বীররসের অভিনয়ে তাঁহার সমান পটুতা ছিল; তিনি কথা কহিলে লোকের কর্ণে অমৃতবর্ষণ করিত। 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—করুণ মর্মভেদীকণ্ঠে যখন অমৃতলাল ইহা বলিতেন তখন দর্শক শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িত। অমৃতলালের যোগেশের অভিনয় দেখিয়া লোকে মনে করিত এমন যোগেশ অমৃতবাবু ভিন্ন আর কাহারো করিবার সাধ্য নাই। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় স্টারে প্রফুল্ল গঠিত হয়।...এই 'প্রফুল্ল' খোলার প্রায় ছয় বৎসর পরে মিনার্ভা থিয়েটার সম্প্রদায় 'প্রফুল্ল' খুলিবার আয়োজন করেন।... মিনার্ভা বিপুল উদ্যমে অভিনয়ের প্রতিযোগিতায় আসরে নামিল। যোগেশের ভূমিকা দেওয়া হইল স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসুকে। স্বর্গীয় মহেন্দ্রলালও সুকণ্ঠ ছিলেন এবং করুণরসের অভিনয়ে তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি ছিল অপরিসীম। এই কারণে তাঁহাকে তখন 'ট্রেজিডিয়ান মহেন্দ্র বোস' বলা হইত। স্টারও তাহার পূর্বগৌরব স্মরণ করিয়া উপেক্ষার ভাবেই এই সময়ে 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। জোর কলমেই গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া স্টারের হ্যাণ্ডবিলে লেখা হইল 'তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়।' মিনার্ভার অধ্যক্ষ তখন গিরিশচন্দ্র। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় 'প্রফুল্ল'র রিহার্স্যাল চলিতেছিল। শিক্ষাকালে মহেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রের মুখে যোগেশের ভূমিকার আবৃত্তি শুনিয়া গিরিশচন্দ্রকে বলেন, 'দেখুন এই যোগেশের পার্টে সব দৃশ্যেই আপনি যেমন দেখাইতেছেন তেমনই অভিনয় করিতে পারি, কিন্তু 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' আপনার মুখে যেমন শুনছি তেমনটি বা তার কাছাকাছিও আমি চেষ্টা করেও পেরে উঠবো না। প্রতিযোগিতায় শেষকালে বুড়ো বয়সে কি অমৃতের কাছে হেরে যাবো। এ পার্টে তার খুব সুনাম।

"...মহেন্দ্রলালের যুক্তিপূর্ণ কথার উত্তরে বলিবারও কিছু নাই। কাজেই সম্প্রদায়স্থ সকলের অনুরোধে এবং নিতান্ত নিরুপায়ে স্বয়ং গিরিশচন্দ্রকেই যোগেশের ভূমিকা লইতে হইল। অমৃতলালও বলিলেন, 'যদি হারি গুরুর কাছেই ত হারবো, তাতে গৌরবই অধিক।'

"এই দুই সম্প্রদায়ের অভিনয় লইয়া শহরে, বিশেষতঃ নাট্যামোদীগণের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন চলিয়াছিল। গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ, কে হারে, কে জিনে?" ('রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর,' ১৩৪০; পৃ. ১১৩-১১৫)

অভিনয়ের তারিখ নির্দ্ধারিত হ'ল ১৩ই জুলাই, ১৮৯৫। সেদিন 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনদ্বয় উভয় সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল :—

A sensational Revival !
PRAFULLA ! ! !
A sensational Revival ! !
STAR THEATRE
TELEPHONE NO. 364
SATURDAY, the 13th July, at 9 P.M.
The Domestic Tragedy
PRAFULLA
One of the master-pieces of that great master
of the Bengali Drama
Babu Girish Chandra Ghosh
PRAFULLA
PRAFULLA
PRAFULLA
To wake the soul by tender strokes of art,
To raise the genius, and to mend the heart.

*"GRAND SATURDAY PERFORMANCE OF PRAFULLA"*

Thou freely judge the scenes that shall ensue ;
But as with freedom judge with candour too.
We would not loose through prejudice this cause,
Nor would obtain precariously applause ;

Impartial censure we request from all
Prepared by just decrees to stand or fall.
Next day, Sunday at Candle light
*ANNADA MANGAL*
AND
*BABU*

AMRITALALL BOSE
Manager

* * *

THE MINERVA THEATRE
6, BEADON STREET, CALCUTTA
SATURDAY, 13th July at 9 P. M.
A new sensational Domestic tragedy
A new sensational Terrible Tragedy ! ! !
PRAFULLA !
PRAFULLA ! !
PRAFULLA ! ! !
Vibrates innermost chord of human heart.
JOGESH—G. C. GHOSH (My humble self)
NEXTDAY SUNDAY, at 7-30 P.M.
*KARAMETI BAI*
*KARAMETI BAI*
*KARAMETI BAI*
Please remember—Sunday performance
KARAMETI BAI

G. C. GHOSE
MANAGER.

'ইণ্ডিয়ান মিরার'-এর (১লা আগষ্ট, ১৮৯৫) নাট্য-সমালোচক দুই যোগেশের অভিনয়ের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করলেন—

Now comes the question of the claims of the two Jogeshes to superiority. The character of Jogesh is the pivot on which the whole mechanism of the play moves and the weight of its correct impersonation calculated to turn the scales one way or the other. Here is a case of Greek meeting Greek. It would however be no discredit to the original Jogesh if he

owes his inferiority to the new, nor would we believe, the latter take it as anything but a matter of self-gratulation if he is beaten by the former whom he trained to the part some years ago. The former has the gift of a clear incisive voice and a roundness of delivery while the latter has the advantage of being the author of the piece (not necessarily an advantage in the case of all authors) and of being possessed with the intuitive skill of probing into the depths of human thought and giving it feeling expression. The former voices the thunder, while the latter emits the lightning of the gloomy atmosphere of the character's life.

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### এমারেল্ড থিয়েটারের অধ্যক্ষতা গ্রহণ ও ভাগ্যবিপর্যয় (১৮৯৪-৯৫)

অর্দ্ধেন্দুশেখর এমারেল্ডের লিজ গ্রহণ ক'রে এমারেল্ড থিয়েটারের পরিচালনে প্রবৃত্ত হলেন। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'মা' নিয়ে ২২এ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এমারেল্ডের পুনরুদ্বোধন করলেন।

'অনুশীলন' পত্রে ( ১৩০১, কার্তিক : অক্টোবর-নভেম্বর, ১৮৯৪ ) শাস্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন—

"এমারেল্ড থিয়েটারের পুনরভিনয়।—ঘটনাচক্রের আবর্তনের সহিত স্পন্দহীন 'এমারেল্ড' পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। বিগত ৭ই আশ্বিন, ২২এ সেপ্টেম্বর শনিবার ইহার নবজীবনের প্রথমাভিনয় হইয়া গিয়াছে। বর্তমান অভিনয় পূর্বতন প্রায় সমুদয় অভিনয়কে সৌন্দর্যে ও মনোহারিত্বে অতিক্রম করিয়াছে।

"অভিনীত পুস্তকখানি বঙ্গের সুপরিচিত 'কবিকঙ্কণের' অমৃতনিষ্যন্দিনী লেখনী-প্রসূত চণ্ডী গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত। চণ্ডী, বঙ্গের প্রতি গৃহে অধীত হইয়া থাকে। সমগ্র পুস্তকখানি যেন সুন্দর ও ললিত পদাবলীশোভিত একখানি চিত্র। কবি এই প্রতিমাতে 'জীবনী-শক্তি' সঞ্চার করিতে পারেন নাই। কিন্তু 'এমারেল্ডের' অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের গুণে আজ প্রতিমা সঞ্জীবিত হইয়া কবিত্বের অবিনশ্বরত্ব ঘোষণা করিতেছে।..."

প্রবন্ধটির শেষে 'অনুশীলন' সম্পাদক নিম্নোক্ত টীকা সন্নিবিষ্ট করেন—

"বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর প্রশংসা এই, তিনি প্রায় এই নূতন সম্প্রদায়কে এমন সুশিক্ষিত করিয়াছেন যে, কার সাধ্য নব-শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিয়া কল্পনাতেও আনিতে পারে।"

পরবর্তী পালা বৈকুণ্ঠনাথ বসুর 'মান'। অভিনয়ের তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৪। অভিনয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে 'অনুশীলন' ( অগ্রহায়ণ, ১৩০১ : নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮৯৪) লেখেন—

"এমারেল্ড থিয়েটার।—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু রায়বাহাদুরের সঙ্কলিত 'মান' এই নাট্যভূমিতে অত্যুৎকৃষ্টরূপে অভিনীত হইতেছে। 'মান' আদ্যোপান্ত মধুর। জানি না, কতগুলি লোকে নিরবচ্ছিন্ন মধুর মধুর বিপক্ষে আছেন কিনা। জানি না, অম্লমধুর মধুর কয়জন প্রত্যাশী। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ প্রভৃতি মহাজনগণের মনোহর পদাবলী তানলয়-সংযোগে প্রগীত হইয়া শত শত ভক্ত-সাধুর চিত্তক্ষেত্র দ্রবীভূত করিয়া দিতেছে। নবনৃত্য, নবীন অভিনেতা, নবীনা অভিনেত্রী, নূতন সাজ-সজ্জা, সুষমাধার বেশভূষা, সদ্ভাবপূর্ণ হাবভাব ইত্যাদির সুশিক্ষা-প্রদানে মুস্তফী মহাশয়, আমাদের অশেষ ধন্যবাদের ও শ্লাঘার পাত্র। অভিনেতা, অভিনেত্রীরা নূতন কার্যে ব্রতী হইলেও, শিক্ষায় প্রবীণ ও প্রবীণা। প্রথমে নারদের গান হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে সখীগণের গীতিকা পর্যন্ত সমস্তই মধুর। আহা! 'মান' কি মাধুরীময় মধুর!"

অতঃপর এমারেল্ডে 'রাজা বসন্ত রায়' পুনরভিনীত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ। বহুপূর্বে কেদারনাথ চৌধুরী উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়ে প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটারে তা প্রথম মঞ্চস্থ করেছিলেন ( ৩রা জুলাই, ১৮৮৬)। অর্দ্ধেন্দু সেবার রমাই ভাঁড় সেজেছিলেন, এবার সাজলেন প্রতাপ।

অভিনয়টি সম্বন্ধে 'অনুসন্ধান' ( ২৭এ পৌষ, ১৩০১, বৃহস্পতিবার/জানুয়ারি, ১৮৯৫) লেখেন—

"এমারেল্ড থিয়েটার।—বহুল পরিবর্তন-পরিশোধনের পর, 'এমারেল্ড থিয়েটার' এবার কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। স্বনাম-প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তৌফি এবার উক্ত রঙ্গভূমি-পরিচালনার ভার লইয়াছেন। দেখিয়া সুখী হইলাম, এবার যেন এমারেল্ডের সম্পূর্ণ সংস্কার হইয়াছে। গত বুধবার এই রঙ্গালয়ে 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বুধবারের অভিনয়, প্রধানতঃ কোন রঙ্গালয়েই ততদূর সন্তোষপ্রদ হয় না। কিন্তু আমরা দেখিয়া আশাতীত আনন্দিত হইলাম যে, সেই বহুবার দেখা পুরাতন পুস্তকের

অভিনয়—এই বুধবারের অভিনয়ের দিনেও—আমাদের নিকট অভিনব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অভিনয়ে আরও একটি অভিনব বিষয় দেখিলাম। মুস্তৌফি মহাশয়কে আমরা এতদিন হাস্যরসের অবতার বলিয়াই জানিতাম; কিন্তু সেদিন প্রতাপাদিত্যের অংশাভিনয়ে তাঁহার বীর-রৌদ্র রসের চূড়ান্ত অভিনয় দেখিয়া, তাঁহাকে সর্বরসের অবতার বলিয়া ধারণা হইল। তদ্ভিন্ন, রাজা বসন্ত রায়—অতুলনীয়; উদয়াদিত্য, মোহন প্রভৃতিও প্রশংসনীয়। ফলতঃ, কিরূপভাবে সম্প্রদায় গঠিত করা আবশ্যক, দেখিয়া বুঝা গেল, মুস্তৌফি মহাশয় এক্ষেত্রে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। এই রঙ্গালয়ে 'মান' নামক একখানি সুন্দর গীতিনাট্যের অভিনয় হইতেছে।..."

এমারেল্ডে অভিনীত 'রাজা বসন্ত রায়' ও 'আবু হোসেন'-এর অভিনয় সম্বন্ধে 'অনুশীলন ও পুরোহিত' পত্রের (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২/মে-জুন, ১৮৯৫) মন্তব্য—

"এমারেল্ডে 'রাজা বসন্ত রায়' ও 'আবুহোসেন' বহুবার অভিনীত হইয়াছে। এখানে 'রাজা বসন্ত রায়ের' অভিনয় বরাবর উত্তমই হইয়া থাকে। বসন্ত রায়, উদয়, সুরমা, বিভা ইত্যাদি প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অংশ সুচারুরূপে সমাহিত হইয়া থাকে। বসন্ত রায়ের অভিনয় সর্বোত্তম। তাঁহার অভিনয়কৌশল যেমন মনোহর, তাঁহার তেমনই পরিপাটি সুর-শক্তি। বসন্ত রায় সাজিয়াছিলেন বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (থিয়েটার মহলে তিনি পুনি ঘোষ বলিয়া পরিচিত।) বহু পূর্বের অভিনেতা বাবু রাধামাধব করের (রাধামাধববাবু মাধু কর বলিয়া খ্যাত) অভিনয় যাঁহারা অবলোকন করিয়াছেন, তাঁহাদের ইহা তেমন ভাল লাগে না। একটি ঘটনাতেই তাহা ব্যক্ত হইবে। ঘটনা এই,—একবার প্রসিদ্ধ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই পূর্ণচন্দ্রবাবুর কৃত 'বসন্ত রায়ের' অভিনয় দেখিয়া স্বীয় সঙ্গী বন্ধুকে বলেন, 'ও রঘু! এ যে জাল প্রতাপচাঁদ! আমি আসল প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিয়াছিলাম।' এই বলিয়া গাত্রোত্থান করেন।

"আমরা সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা রাধামাধববাবুর বসন্তরায়ের অভিনয়-দর্শনে বঞ্চিত। সুতরাং আমরা ইঁহার কৃত অভিনয় দেখিয়াই সুখ পাইয়াছি।

"প্রতাপের বেশে বাবু মতিলাল সুর, দর্শকের সমক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকেই পূর্বে ঐ অংশ সমাধা করিতে দেখিয়াছেন, বর্তমান কোন অভিনয়ে মতিলালবাবু তাঁহাদিগকে পূর্ববৎতুল্য তৃপ্ত করিতে পারেন নাই। অভিনয়মত্ততা তেমন ছিল না বলিয়াই হউক, অথবা দেহের কোন অসুস্থতা ছিল বলিয়াই হউক, তাঁহার কার্য অনুত্তম হইয়াছিল। তাঁহারই পূর্বাবস্থার সঙ্গে

এই উপমা করা গেল। উত্তম দেখিয়াছি। তাই অত্যুত্তম দেখিতে চাই—অন্ততঃ উত্তম তো প্রত্যাশা করিতে পারি।

"আবু হোসেনে আবুর অংশ, স্বয়ং বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী সুন্দররূপে নির্বাহ করিতেছেন। মুস্তফী, স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয়, প্রায় প্রতি রজনীতে দিতেছেন।...আমরা যে দিন অভিনয় দেখি, সেদিনের কথা বলিয়াও বলিতে পারি, কোন কোন বিষয়ে 'মিনার্ভা অপেক্ষা এমারেল্ডে' ভাল হইতেছে।..."

কিন্তু শুদ্ধমাত্র অভিনেতার ভাল অভিনয়ের উপর নির্ভর ক'রে রঙ্গালয় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রখর ব্যবসায়-বুদ্ধির উপরই রঙ্গালয়ের দীর্ঘস্থায়িত্ব নির্ভর করে। আয়-ব্যয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখলে রঙ্গালয়ের ধ্বংস অনিবার্য। এমারেল্ডও ঠিক এই কারণে গ্রেট ন্যাশনালের মতো ধ্বংস হলো।

পাঠকের স্মরণার্থে পুনরায় উল্লেখ করি, অর্দ্ধেন্দুশেখরকে অভিনয়-শিক্ষক ক'রে আর কেদার চৌধুরীকে অধ্যক্ষ ক'রে কাপ্তেন গোপাললাল খুব ঘটা ক'রেই এমারেল্ড থিয়েটার খুলেছিলেন। কেদারনাথের 'পাণ্ডব-নির্বাসন' একা অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষায় গঠিত হয়েছিল। কিন্তু গোপাললাল যেমনটি আশা করেছিলেন তেমনটি হলো না। স্টারের মতো তাঁর থিয়েটার জমে উঠল না দেখে অনতিবিলম্বে তিনি গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে আসেন। গিরিশচন্দ্রের আমলে থিয়েটার ভালোভাবেই চলে। কিন্তু কাপ্তেনের যতদিন শখ ততদিনই থিয়েটার। গোপাললালের শখ মিটে যাওয়ায় এমারেল্ড ভাড়াটে বাড়িতে পরিণত হলো। গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড ছেড়ে স্টারে চলে গেলেন। এইখান থেকেই এমারেল্ডের পতনের সূচনা। তারপর ক্রমাগত ভাড়াটে বদলে তার 'গঙ্গাযাত্রার অবস্থা' হয়। প্রথমে মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, হরিভূষণ ভট্টাচার্য ও ব্রজলাল মিত্র এজমালে ভাড়া নেন। এঁদের পর মহেন্দ্রলাল বসু ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র যৌথভাবে; এই দুজনের পর মহেন্দ্রলাল বসু একা; এঁর পর অর্দ্ধেন্দুশেখর।

জাতশিল্পীরা সচরাচর বেহিসেবি বিষয়বুদ্ধিহীন হয়ে থাকেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। টাকা কেমন করে রাখতে হয়, বুঝে সুঝে কেমন ক'রে খরচ করতে হয় এ বিদ্যে তাঁর তিলমাত্র ছিল না। এই খেয়ালী অব্যবসায়ী মানুষটি হঠাৎ ঝোঁকের বশে থিয়েটার-ব্যবসাতে নামলেন। এই ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিতে তাঁর হিতৈষীরা বারংবার নিষেধ করেছিলেন কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করেন নি। পতনোন্মুখ এমারেল্ডের তিনি পাট্টা গ্রহণ করলেন। ফল ফলতে দেরি হলো না। দেনায় ডুবতে লাগলেন। যখন একেবারে সম্পূর্ণ

ভরাডুবি হ'ল তখনই তিনি ব্যবসা গুটোলেন। দেনার দায়ে বিষয়-আশয় যায় পৈতৃক বসতবাড়িটি পর্যন্ত তাঁকে বেচতে হ'ল। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

"তিনি অভিনেতা ছিলেন, বিষয়ী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা দিতে জানিতেন, কিন্তু কিরূপে সকল দিক সামঞ্জস্য রাখিয়া থিয়েটার চালাইতে হয়, তাহা জানিতেন না। যথা নূতন নাটকের অভিনয়ের তারিখ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সকলকে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন, বড় বড় অংশ, যাহাতে সর্বাঙ্গীণ পুষ্ট হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কোন এক ক্ষুদ্র অংশ ভাল হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্পূর্ণ হইবে, তাহারই জন্য বিব্রত, ক্ষুদ্র অভিনেতা কোনওরূপে শিখিতেছে না, অর্দ্ধেন্দু তাহাকে কোনওরূপে শিখাইবেনই। যদি কোনও অভিনয়-শিক্ষালয় থাকিত, যথায় ছাত্রেরা শিক্ষিত হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবে, তাঁহার এরূপ শিক্ষাদান প্রশংসার হইত, কিন্তু রঙ্গালয়,—কার্য চালাইতে হইবে, অভিনয় রাত্রি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এখন আর সময় অপব্যয় করিবার নয়, ইহা তিনি শিখাইবার জেদে অল্প বুঝিতেন। তাঁহার কার্যে কেহ বাধা দিলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন, নিখুঁত না হইলে সে অভিনেতার নিস্তার নাই। এরূপ কার্যের ফলাফল তিনি স্বয়ং থিয়েটার করিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন। এই প্রকার নানা বিষয়ে কার্যের উপযোগিতা তিনি বুঝিতেন না, এ নিমিত্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া তিনি থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না।"

গিরিশচন্দ্র আরও লিখেছেন :

"কবি, নট, চিত্রকর প্রভৃতির প্রায়ই বিষয়বুদ্ধি কম হইয়া থাকে। চিন্তার পাছে বিঘ্ন হয়, এ নিমিত্ত বিষয়ীর সংঘর্ষ প্রায়ই তাঁহারা পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা বিষয়ী. তাঁহারা হিসাবের এক পয়সার জন্য বাদানুবাদ করিতে, এক পয়সার জন্য মাসাবধি পাতা উল্টাইয়া রেওয়া মিলাইবার নিমিত্ত বিব্রত থাকিতে, এক পয়সা খরচ কমাইবার জন্য তিনদিন মস্তিষ্ক ঘামাইতে কিছুমাত্র ক্লেশ বিবেচনা করে না; কিন্তু নট প্রভৃতি যাঁহারা কল্পনার পথে দিবারাত্র বিচরণ করেন, তাঁহাদের বিষয়কর্মের ভিতর একবার আহারের চেষ্টা থাকে, তাহা ফুরাইলে আবার কল্পনায় বিভোর হইয়া পড়েন, বৈষয়িক সংসর্গ তাঁহাদের একেবারেই বিরক্তি-কর। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনী ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, প্রভাবশালী আত্মীয়ের বিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াছেন, বাড়িঘর পুত্র-কলত্র কিছুরই তোয়াক্কা করিতেন না। আহার চলিলেই হইল, তাহার পর যাহা হউক না কেন, থিয়েটার লইয়াই আছেন।"

অতঃপর তিনি লিখেছেন :

"কখনও বা যত্নপূর্বক কোনও শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেছেন, কখনও বা নাটকের অংশ লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন, কখনও বা কোনও চরিত্রের উপযোগী পরিচ্ছদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতেছেন, কখনও বা কোন নাটককার, রচিত নাটক লইয়া আসিয়াছে শুনিতেছেন, শ্রোতারা সকলে ধৈর্যচ্যুত হইয়া চলিয়া গেল, অর্দ্ধেন্দু অটলভাবে বসিয়া আছেন, হয়তো গ্রন্থকার পড়িতে ক্লান্ত কিন্তু অক্লান্ত অর্দ্ধেন্দু 'পড়ে যাও ভাই!' বলিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে. রঙ্গালয়ে আর কেহ কোথাও নাই, এক চেয়ারে গ্রন্থকার অন্য চেয়ারে অচল অটল অর্দ্ধেন্দু, বিরক্তির চিহ্ন লেশমাত্র মুখে অঙ্কিত নাই। উপর্যুপরি সাতদিন গ্রন্থ পাঠ করিয়াও অর্দ্ধেন্দুর ধৈর্যচ্যুতি করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। গ্রন্থকারের পাঠ করা শেষ হইয়াছে, এইবার তাঁর বড় বিপদ। অর্দ্ধেন্দু তাহার প্রতি চরিত্র সম্বন্ধে উপদেশ আরম্ভ করিয়াছেন, সে নিজ রচিত চরিত্র সম্বন্ধে বুঝুক না বুঝুক. অর্দ্ধেন্দু পুঙ্খানুপুঙ্খ তাহার নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতেছেন। যদি কোন গ্রন্থকার দুর্দৈববশতঃ বলিত যে আমার তো এরূপ লেখা নাই, অর্দ্ধেন্দু বলিত, 'খোলো ভাই তোমার খাতা খোলো।' গ্রন্থকারকে খাতা খুলিতেই হইবে, এবার তাহার আরও বিপদ, তাহার আশঙ্কা আবার অন্যান্য স্থান খুলিতে বলিবেন, তাহা হইলে আজ আর তাহার বাড়ি ফেরা হইবে না। যদি কেহ অর্দ্ধেন্দুকে বলিত, 'মশায়, ওসব কি শোনেন?' অর্দ্ধেন্দু গম্ভীর হইয়া বলিতেন, 'আমরা না শুনিলে উহারা শিক্ষা পাইবে কোথায়?' কোন রং-ঢংয়ের কথা যে কেহ সে সময় শুনিতে চাহিত, অর্দ্ধেন্দু তখনই শুনাইতে প্রস্তুত, দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিতে হইত না; রঙ্গরস অর্দ্ধেন্দুর জীবন ছিল। অর্দ্ধেন্দু সমাজে সর্বজনপ্রিয় ছিলেন, যথায় বসিতেন, আনন্দের স্রোত চলিত, কিন্তু রিহারস্তালে বসিলে অভিনেতা অভিনেত্রীর সর্বনাশ। কাহাকে শিক্ষা দিতেছেন, এমন সময় এক কোণে কেহ কাহারও নিকট একটি পান চাহিয়াছে, অর্দ্ধেন্দু অমনি সেইদিকে ব্যাঘ্রের ন্যায় চাহিলেন, যাহাকে শিক্ষা দিতেছিলেন, তাহাকে বলিলেন, 'থাম বাবুদের কি কথাবার্তা হইতেছে, তাহা শেষ হোক, তাহার পর কার্য হইবে।' কেহ উঠিয়া গেল, পায়ের শব্দ হইয়াছে, অমনি ছাত্রকে বলিলেন, 'স্থির হও, আর কে কে উঠিয়া যাইবেন যান, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে কার্য আরম্ভ করি।' তাঁহার শিক্ষা প্রদানে এরূপ আগ্রহ ছিল যে সামান্য বাধাবিঘ্নে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, কিন্তু যখন রিহারস্তাল ফুরাইল, অতি ক্ষুদ্র অভিনেতাও তাঁহার বন্ধু। বন্ধুভাবে একত্রে কথাবার্তা, ভোজনের আয়োজন,

রন্ধনে উপদেশ প্রদান,—এইরূপে বারো মাসের মধ্যে এগারো মাস কাটিয়া যাইত।.........

"অভিনেতৃগণের প্রতি অর্দ্ধেন্দুর অশেষ দয়া ছিল, প্রয়োজন হইলে যেস্থলে আমরা দুই টাকা যথেষ্ট মনে করিতাম, অর্দ্ধেন্দু পাঁচ টাকা দিতেন। কেহ খাইতে চাহিলে যেরূপে পারেন তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া খাওয়াইতেন। সামাজিকতায় অর্দ্ধেন্দু আমীর অপেক্ষা আমীর ছিলেন।" ('নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী')

নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

"পুত্রজনপরিবেষ্টিত সংসারী হইয়াও তিনি নাট্যশিল্পমন্দিরে, ভাবময়ী প্রতিমার সম্মুখে সংসার মায়াকে অনায়াসে বলি প্রদান করিয়াছিলেন। থিয়েটার করা ভিন্ন তাঁহার জীবনে যে অন্য কোন কার্য আছে, পুত্র পরিবার আত্মীয়স্বজনের নিকট যে কোন দায়িত্ব থাকিতে পারে, সমাজের প্রতি তাঁহার যে কোন কর্তব্য থাকা উচিত এ ধারণা তাঁহার আদৌ ছিল না। আমরা দেখিয়াছি, কোনস্থানে চাকরি নাই, কি খাইবেন তাহার কোন সংস্থান নাই, পিতৃবৎসল পুত্র পায়ে ধরিয়া সাধিতেছেন 'বাবা বাড়ি চলুন, কেন অকারণ কষ্ট পাইতেছেন' সে কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই—দু'পয়সার কচুরি খাইয়া, শ্রাবণ ভাদ্রের দারুণ গ্রীষ্মে গলদ্ঘর্ম অর্দ্ধেন্দুশেখর, নাট্যৈকব্রত অর্দ্ধেন্দুশেখর হাঁফানীর অসহ্য যন্ত্রণা হইতে ক্ষণিক নিষ্কৃতি লাভের জন্য কোলরাফরম্ শুঁকিতে শুঁকিতে, কোনস্থানে বসিয়া অক্লান্তভাবে, পূর্ণ উৎসাহে, হৃষ্টান্তঃকরণে কোন ব্যক্তিবিশেষকে, কোন নাটকের কোন ভূমিকা শিখাইতেছেন।...বেলা দশটা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অর্দ্ধেন্দুবাবু সমানভাবে দশজনকে দশটা বিভিন্ন চরিত্রের আভিনয়িক কৌশল শিখাইতেছেন। এরূপ প্রাণপণ সাধনা, এরূপ কঠোর পরিশ্রম, এরূপ একাগ্রতা, এরূপ ঐকান্তিকতা, এরূপ দৃঢ় সংকল্প এবং এরূপ ত্যাগ-স্বীকারে,—এই বিপুলা পৃথিবীর কোন্ বন্ধুর-পথশেষে, কোন্ দুরালঙ্ঘ্য পর্বতের নিভৃত গুহায়, মানবের আকাঙ্ক্ষিত কোন্ মূর্তিময়ী যশোপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছেন যাঁহাকে আত্মকরায়ত্ত করিতে পারা যায় না—তাহা জানি না।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখরের নটজীবন': 'এক্ষণ', ১৩৭৩-এর ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত)

অপরেশচন্দ্র অন্যত্র লিখেছেন:

"আত্মতৃপ্তি বা আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য অর্দ্ধেন্দুশেখর থিয়েটার করেন নাই; থিয়েটার করিবার জন্যই তিনি থিয়েটার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং কখনও এই লক্ষ্য পরিভ্রষ্ট হন নাই বলিয়াই আজ অর্দ্ধেন্দুশেখর 'অর্দ্ধেন্দুশেখর'। অর্থলালসা

ছিল না, ভোগতৃষ্ণা ছিল না, বিলাসবিভ্রম ছিল না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-দৌহিত্র-পৌত্র পরিবেষ্টিত সাজান সংসার থাকিতেও তিনি সংসারী ছিলেন না. তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, ধারণা, সিদ্ধি ছিল রঙ্গভূমি। তিনি সাজিতে ভালবাসিতেন, সাজাইতে ভালবাসিতেন, শিখিতে ভালবাসিতেন, শিখাইতে ভালবাসিতেন। সাধক যেমন তাহার সিদ্ধির জন্য ধন, জন, পরিবার, যশ, খ্যাতি প্রতিপত্তি তাহার সর্বস্ব ইষ্টদেবতার চরণে সমর্পণ করে, তিনিও তেমনি নাট্যবাণীর চরণে তাঁহার আপনার বলিয়া যাহা কিছু ছিল সমস্তই অঞ্জলি দিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। নামের জন্য তিনি কখনই লালায়িত ছিলেন না, আপনার গুণগরিমা প্রকাশ করিয়া নিজের ঢাক নিজে পিটিয়া আত্ম-মহিমা প্রচার করিতে তিনি কখন পারেন নাই, —শিখেন নাই,—চেষ্টাও করেন নাই। যশঃপ্রার্থী হইয়া তিনি কখন দ্বারে দ্বারে যশ ভিক্ষা করেন নাই, খ্যাতি আসিয়া উল্লাসে তাঁহাকে আপনি বরণ করিয়াছিল। …এক গিরিশচন্দ্র ভিন্ন অর্দ্ধেন্দুশেখরের ন্যায় এমন রঙ্গভূমির একনিষ্ঠ সাধক আর কাহাকেও আমি দেখি নাই।…

"শিক্ষকতায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। শিক্ষাদানে তিনি যেমনই অকৃপণ ছিলেন, তেমনই পরিশ্রম করিতেও ক্লান্তি বোধ করিতেন না, সন্ধ্যা হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়াছেন, কখনও বিরক্ত হন নাই কিম্বা বলেন নাই যে, আর পারিতেছি না। তিনি কেবল সুপাঠক ছিলেন না, সুঅভিনেতাও ছিলেন। কতকটা মুখস্ত করিয়া আভিনয়িক ভঙ্গীতে গলা পাকাইয়া উচ্চ চীৎকারে আসর জমাইবার মত অভিনয় তিনি কখন করেন নাই, কিম্বা সেরূপ শিক্ষা কাহাকেও দেন নাই। ভাবসূত্রেগ্রথিত বাক্যসমষ্টিকে তিনি আকার প্রদান করিতে পারিতেন, এবং সেই আকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার মন্ত্র তাঁহার জানা ছিল বলিয়াই তিনি কখন বাছিয়া, দেখিয়া শুনিয়া কোন নাটকের কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই।…অনেক অভিনেতা 'সিম্প্যাথি'র পার্ট লইবার জন্য ব্যস্ত হয়েন অর্থাৎ কারুণ্য, দারিদ্র্য, মহত্ব প্রভৃতির গুণে যে-সকল ভূমিকার প্রতি দর্শক সহজেই আকৃষ্ট হইবেন, সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন, এরূপ কোন ভূমিকা লইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা চাহেন ভূমিকা তাঁহাদিগকে বড় করুক, দর্শকের নিকট হইতে নাট্যকারের প্রাপ্য করতালির ধ্বনি তাঁহাদের অভিনয়ের যশকে প্রসারিত করুক, অর্দ্ধেন্দুশেখরের এ রোগ ছিল না, তাঁহাকে বড় করিবার জন্য অন্য কোন নাট্যকার লেখনী ধারণ করেন নাই, কিন্তু তিনি অনেক নাট্যকারের নাটকের শিক্ষাদানে এবং সেই সেই নাটকের সামান্য বা বিশেষ চরিত্রের ভূমিকা অভিনয় করিয়া—বড় করিয়া গিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের

জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।...যিনি নাট্যশালার অভিনেতারূপে পদার্পণ করেন তিনিই নায়ক সাজিবার জন্য ব্যস্ত। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনী হইতে তাঁহাদের শিক্ষা করা উচিত; নাটকান্তর্গত বিশিষ্ট চরিত্রের অভিনয় করিয়া গৌরব কিছু নাই। যে কোন চরিত্র সাজিয়া সেই চরিত্রকে গৌরবান্বিত করাই অভিনেতার কৃতিত্ব।...তাঁহার যে আদর পাওয়া উচিত ছিল, তাহা তিনি পান নাই। সত্য কথা বলিতে আমরা জানি না, সত্যের আদর করিতে আমরা শিখি নাই, তাই অর্দ্ধেন্দুশেখরের ন্যায় শিক্ষক, অর্দ্ধেন্দুশেখরের ন্যায় অভিনেতা অনাদরে, অনাহারে, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে রঙ্গভূমির কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন আর যাঁহারা তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শিক্ষার এক আনা মাত্র আদায় করিয়াই অভিনেতা অভিনেত্রী বলিয়া সাধারণে পরিচিত হইয়াছে, আজ তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার অপেক্ষা চতুর্গুণ অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া বঙ্গরঙ্গভূমির স্বত্বাধিকারীগণের এবং দর্শকবৃন্দের বিচারশক্তির কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, দুঃস্থ নাট্যসম্প্রদায় তাঁহার দ্বারা যত উপকৃত হইয়াছে, তত উপকৃত আর কাহারও দ্বারা হয় নাই, বন কাটিয়া নগর বসাইবার ক্ষমতা তাঁহার ন্যায় আর কাহারও ছিল না, যখনই কোন নাট্যসম্প্রদায় অভাবগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই সম্প্রদায় দর্শক আকর্ষণে আর সমর্থ নহেন, ভাঙ্গাদলে অর্থাভাবে যখন নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাব, তখনই সেই সকল সম্প্রদায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের দ্বারস্থ হইয়াছেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরও মুক্তপ্রাণে অর্থের বা স্বার্থের আশা না রাখিয়া সেই সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছেন, তাহাদের শিক্ষা দিয়াছেন এবং সেই সম্প্রদায়কে দর্শনোপযোগী করিয়া দর্শকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অদৃষ্ট মন্দ, তিনি কখনও তাঁহার এই সকল মহৎ কার্যের ফলভোগ করিবার সুযোগ পান নাই। অর্দ্ধেন্দুবাবুর সাহায্যে দুর্দশা কাটিয়া গেলেই ঐ সকল সম্প্রদায় অর্থসামর্থ্যে লক্ষ্মীর বরপুত্র বড় বড় হাতি আনিয়া পুষিতেন কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের দিকে ফিরিয়া দেখিতেন না। মহাপুরুষ অর্দ্ধেন্দুও সেজন্য কখনও কোন অনিষ্টব্যবহার করিয়া মহত্ব হইতে ভ্রষ্ট হন নাই।" ('৺অর্দ্ধেন্দুশেখর' ঃ 'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ ১৩২১)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় লিখে গেছেন :

"ইনি একরূপ মূর্তিমান হাস্যরস ছিলেন। ইঁহার চলনে বলনে ভাবভঙ্গীতে কথায় ও চাউনিতে হাস্যরস ফুটিয়া পড়িত, অনেক সময়ে ইনি গ্রন্থকারকেও ছাপাইয়া হাসি ছড়াইয়া দিতেন। পরের যেটুকু দাগ, সেটুকু নকল করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি কখনও তোতলা সাজিতেন, কখনও খোনা

সাজিতেন, অনেক সময়ে স্টেজের মধ্যে তামাক সাজিতেন ও খাইতেন, সকলেরই উদ্দেশ্য এক, লোক হাসানো। লোককে হাসাইতে পারিলে অর্দ্ধেন্দুবাবু চরিতার্থ হইতেন, সেইটাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, কিছুরই দিকে তিনি তাকাইতেন না, কেবলই চেষ্টা করিতেন কি করিয়া লোককে খুশি করিবেন ও হাসাইবেন। থিয়েটারগুলিতে তাঁহার অগাধ প্রতিপত্তি ছিল। কোনো থিয়েটারে তিনি সাজিবেন শুনিলে সে থিয়েটারে লোক ধরিত না। ভদ্রলোকের মজলিসেও তাঁহার খুব পসার ছিল, মজলিস জমাইতে তাঁহার মত লোক আর পাওয়া কঠিন ছিল।

"অর্দ্ধেন্দুবাবু খুব বড়মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সম্পত্তিরও অভাব ছিল না। তাঁহার কুটুম্বেরা সকলেই কলিকাতার মধ্যে প্রসিদ্ধ বড়মানুষ। সুতরাং কিছুই না করিলেও হাসিয়া খেলিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু অল্প বয়সেই তিনি নাটকে সাজিতে লাগিলেন, তাঁহার অভিনয় দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইতে লাগিল। অতি অল্পদিনের মধ্যে একই নাটকে তিনি ৭।৮টি পাত্র সাজিতেন, কেহই বুঝিতে পারিত না যে, একই ব্যক্তি সাজিয়া আসিল। সাহেব সাজিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, তাঁহার নামই হইয়াছিল সাহেব। সাহেবেরা যেমন পা ফাঁক করিয়া দাঁড়ায়, পা ও গা নাচায়, বাঁহাত দিয়া পকেট হইতে রুমাল তুলিয়া লয়, বাঁ হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছে, তিনি সেইগুলি সমস্ত করিতে পারিতেন, গলার স্বর ইচ্ছামত গম্ভীর, ইচ্ছামত চেরা, ইচ্ছামত পাতলা, ইচ্ছামত সরু, ইচ্ছামত মোটা করিতে পারিতেন।

"সাজে ত সবাই, সাজিতে পারেও অনেকে, কিন্তু পরকে শিখান আর এক ব্যাপার। অর্দ্ধেন্দুবাবুর দৃষ্টিশক্তি খুব ছিল, তাঁর শিষ্যের যদি সেরূপ দৃষ্টি না থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাঁকে 'যা তুই পাল্লি নি, তোর দ্বারা হ'ল না' বলিয়া সরাইয়া দিতেন না। সে যতক্ষণ না শিখিত, যতক্ষণ তার দৃষ্টিশক্তি না জন্মিত, ততক্ষণ ছাড়িতেন না। একবার দুইবার পাঁচবার সাতবারেও যদি না হইত, তবুও ছাড়িতেন না।…

অর্দ্ধেন্দুশেখর শুধু যে নটরাজ ছিলেন তাহা নহে—নটযোগী ছিলেন, নট-ঋষি ছিলেন। ধ্যান, ধারণা ও সমাধিতে নাট্যযোগের দ্বারা পরমপদ লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই তিনি আপনার সংসারধর্ম একেবারেই দেখিতেন না। [illegible]ল শখের অভিনয় করিয়া, অভিনয়ে সিদ্ধিলাভ করা যায় না দেখিয়া শেষ পেশাদারী ধরিলেন। কতকগুলি লোক তন্ময় হইয়া যাহাতে নটের কার্য করে, তাহারই জন্য পেশাদারী ধরিলেন। পেশাদারী নিজের জন্য নহে, নাট্যের শ্রীবৃদ্ধির

জন্য। কিছুদিন কাজ করিয়া দেখিলেন পেশাদারী ধরিতে গেলে দল বাঁধিতে হয়, দল বাঁধিতে গেলেই পয়সার দরকার হয়, পয়সার দরকার হইলেই বখরাদার চাই। অনেক সময় বখরাদারদের সঙ্গে তাঁহার মত মিলিত না; সুতরাং তাঁহাকে তফাৎ হইতে হইত। এইরূপ ২।৩ বার তফাৎ হইয়া শেষ তিনি সঙ্কল্প করিলেন তিনি নিজেই দল বাঁধিবেন। কিন্তু অ্যাক্ট করা এক, তাহাতে তিনি দক্ষ বৃহস্পতি ছিলেন, অ্যাক্টিন্ দেখানোতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, দল বাঁধা আর একরকম কাজ। তাহা তাঁহার মাথায় ঢোকে নাই, তিনি দল বাঁধিতে পারেন নাই। তাঁর থিয়েটার ভাঙিয়া গেল, ক্রমে তাঁহার দেনা হইয়া পড়িল, তাঁহার ঘর-বাড়ি, বিষয়-আশয় সবই গেল; কিন্তু তাঁর স্ফূর্তি গেল না, তাঁহার অ্যাক্টিন্ গেল না, অ্যাক্টিন্ শেখানোও গেল না। অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িলে একদিন তাঁহার পুত্র ব্যোমকেশ তাঁহাকে বলিলেন, 'বাবা, আমাদের সবই গেল, আমাদের চলবে কিসে? অর্দ্ধেন্দুবাবু উত্তর করিলেন, 'বাবা, তুমি কেন মনে কর না, তোমার বাবা মরেছে, আর সংসারটা সমস্তই তোমার ঘাড়ে পড়েছে।'

এই মহাপুরুষই বলিতে গেলে বাঙলার সাধারণ নাট্যশালার সৃষ্টিকর্তা। স্টেজ যখন শখের ছিল তখন হইতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর স্টেজ যখন সমস্ত বাংলা, সমস্ত ভারত মাতাইয়া তুলিয়াছে, তখনও তিনি সেই স্টেজের চূড়ামণি। এখনকার যত নটধুরন্ধর সকলেই তাঁহার শিষ্য বা প্রশিষ্য।...তিনি একরকম বাংলা স্টেজের গ্যারিক ছিলেন, এমন কি ভরতমুনি অথবা কোহল, ধুর্ত্তি, শাণ্ডিল্য বলিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর': 'নাচঘর', ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১)

শাস্ত্রীমহাশয় অন্যত্র লিখেছেন:

"...অর্দ্ধেন্দুবাবু হাসির ফোয়ারা ছুটাইতেন—তাঁহার ভাবভঙ্গী, পোশাক-পরিচ্ছদ, সব জিনিসেই হাস্যরস ফুটিয়া পড়িত।...

"...অনেক সময়ে থিয়েটারে দেখিতাম, অর্দ্ধেন্দুবাবু ধুতি ও চাদর গায়ে, ভুঁড়িটি খুলিয়া নানারূপ রঙ্গভঙ্গ করিতেছেন আর থিয়েটারসুদ্ধ লোক হাসিতেছে।

"...থিয়েটারের যাহাতে ভাল হয়, তাহারই জন্য তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিতেন, নিজের পরিবারের সুখদুঃখের দিকে চাহিয়াও দেখিতেন না, থিয়েটারের আমোদেই মশগুল হইয়া থাকিতেন...

"অর্দ্ধেন্দুবাবু যেমন তন্-মন্-ধন দিয়া কেবল রঙ্গালয়েরই সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুত্র আমাদের পরম বন্ধু ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ও তন্-মন্-ধন দিয়া সাহিত্যের, বিশেষ সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

দারিদ্র্যের সহস্র তাড়না সহ্য করিয়াও দুজনেই আপনাদের জীবনব্রত উদ্যাপন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বাঙালী দুজনেরই জন্য সমানভাবে কাঁদিতেছে এবং বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহাদের ভালরূপ আদর করিতে পারে নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছে। হয়তো সাহিত্য-সেবক আরও মিলিবে, থিয়েটার-সেবক আরও মিলিবে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর মতো হাস্যরসের রসিক আর একটি মিলিবে কিনা সন্দেহ। কারণ নিরন্ন বাঙালী পেটের জ্বালায় হাসিখুশি ভুলিয়া যাইতেছে। আমরা বাল্যকালে লোকের যেরূপ স্ফূর্তি, হাসির গর্‌রা, ফক্কুড়ির আদর দেখিয়াছি, একালে তাহার শতাংশের একাংশও দেখি না। তখন অন্ন ছিল, তাই অর্দ্ধেন্দু বাবুর মত লোক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখন অন্ন নাই, ঐরূপ লোক আর হইবে না।" ('অর্দ্ধেন্দু-কথা' : 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক ১৩২৭)

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখেছেন :

"অর্দ্ধেন্দুর ধৈর্য ও অধ্যবসায় অসাধারণ। তিনি যখন যাহা ধরিতেন, যতক্ষণ তাহা মনোমত করিয়া না শিখাইতে পারিতেন, ততক্ষণ ছাড়িতেন না। এই গুণ ছিল বলিয়াই তিনি রঙ্গালয়ে চিরদিন শিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন। এক একটি অভিনেতাকে লইয়া তিনি শিক্ষাদানার্থ কি পরিশ্রম করিয়াছেন যাহারা তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে সকলেই তাহা স্বীকার করিবে। অভিনয় করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন, তিনি সকলই অতি যত্নে অতি কষ্টে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কোন্ ভূমিকায় কি বেশ উপযোগী তাঁহার অপেক্ষা তাহা কেহ ভাল বলিয়া দিতে পারিত না। তিনি বেহালা, সেতার ও কনসার্টের অনেকগুলি বাদ্য নিপুণতার সহিত বাজাইতে পারিতেন এবং নৃত্যকলাও সাধন করিয়াছিলেন। কাজেই এ সকল বিষয়ে তাঁহার কাছে ফাঁকি চলিত না। আবু হোসেন সাজিয়া তিনি গান গাইতেন।

"বাল্যকাল হইতেই তিনি হাস্যরসরসিক। যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সেই আমোদে ভরপুর হইয়া যাইত। তবে 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং' করিতে তিনি চিরদিনই নারাজ ছিলেন। যাহারা রসিকতা চাহিত না, তাহাদিগের নিকট তিনি মূক, আপনাতে আপনি মগ্ন।

"তাঁহার সরলতা ছিল অসাধারণ, মেজাজ ছিল আমীরী। জীবনে কাহারও সহিত তাঁহার বিবাদ হয় নাই। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে, তিনি যে বুঝিতে পারিতেন না, তাহা নহে, তবে তিনি কখনও সে সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচারীকে কোন কথা বলিতেন না। অসহ্য হইলে 'স্থানত্যাগেন দুর্জনং' নীতির অনুসরণ করিতেন। এইখানে তাঁহার আভিজাত্যের অভিমান ফুটিয়া উঠিত, অন্য সকল

সময়েই তিনি নিরীহ, সরলপ্রকৃতি, কৌতুকপ্রিয় মানুষমাত্র। যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তিনিই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রাসাদের অধিপতি রাজা-মহারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ণকুটীরবাসী দীন-দরিদ্রের সহিত তিনি সমভাবে মিশিতে পারিতেন। এমন কি তিনি পুত্রদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের সহিতও অসঙ্কোচে রহস্যালাপ করিতেন। কিন্তু সে আলাপে আত্মমর্যাদা উভয় পক্ষেরই অক্ষুণ্ণ থাকিত এবং উপস্থিত সকলেই তাহা উপভোগ করিত। যেখানে দম্ভ অহঙ্কার রাজত্ব করে, সেখানে তিনি কখনও যাইতেন না।...

"অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষাও অসাধারণ। তিনি যেমন নানা বিষয়ের পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন, সেগুলি তেমনিই আয়ত্তও করিয়াছিলেন, আর পুস্তক পাঠ করিয়া যাহা হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা ছিল না, সেগুলি যেখানে সম্ভব, সেইখানেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। নাটক ও নাট্য-সাহিত্যের তো কথাই নাই। শরীরতত্ত্ব তিনি খুব ভালই জানিতেন। জননক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা শরীরতত্ত্বের সম্যক আলোচনা না করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও বোধগম্য নয়। সমাজতত্ত্বেও তাঁহার অধিকার ছিল। পীরালি-সমাজের আধুনিক কেন্দ্র কলিকাতাসমাজে গণ্যমান্য অনেকে সমবেত হইয়া, সমাজস্থ দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার প্রথম সভাপতিরূপে অর্দ্ধেন্দুশেখর যে দু-চারিটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সমাজের উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার বিষয়।

"তাঁহার সরলতাও অসাধারণ। বিশ্বাসী হৃদয় কখনও কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে পারে না। তিনিও করিতেন না। এ কারণে তিনি অনেকবার অপদস্থ হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয়ে বিকৃতি আসে নাই। তিনি প্রতারিত হইয়াও আবার বিশ্বাস করিতেন, আবার ঠকিতেন, তথাপি তাঁহার সহজ সরলতা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই।

"বিষয়বুদ্ধিহীনতাও তাঁহার অসাধারণ। তিনি যে প্রতিজ্ঞা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যেরূপ জ্ঞানোপার্জন করিয়াছিলেন, যে অভিজাত বংশে তাঁহার জন্ম, তিনি ইচ্ছা করিলে যে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হইয়া, ধনেমানে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতেন, তাহা না করিয়া তিনি জীবন যে পথে চালিত করিলেন, সে-পথ অতি বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ। তখন যে সে-পথে বিচরণ করিত তাহাকে লোকের নিকট নিন্দাভাজন হইতে হইত, সমাজে হেয় হইতে হইত, অধিকন্তু দারিদ্র্যকেই বরণ করিতে হইত। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি থাকিলে কদাচ এপথে আসিতেন না। তার

পরেও, যখন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল, তখনও যদি তাঁহার বিষয়বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হইত, তাঁহার অর্থাগম যথেষ্ট পরিমাণেই হইতে পারিত।" ('বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

শিশিরকুমার ভাদুড়ী বলেছেন :

"…আমাদের দেশেও গরীব লোকেরাই থিয়েটার খুলেছিলেন। গিরিশবাবুর ছাড়া কারো কিছু ছিল না। অর্দ্ধেন্দুবাবু ছিলেন অন্নদাস। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে থাকতেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর যত্নআত্তি করতেন, পঞ্চাশটাকার বেশি একসঙ্গে চোখে দেখেন নি। শীতকালে ওভারকোট আর গরমকালে ড্রেসিং গাউন পরে কাটিয়েছেন।" (দ্রঃ রবিমিত্র ও দেবকুমার বসু প্রণীত 'শিশির সান্নিধ্যে'—পৃঃ ৫০)

হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন :

"পাশ্চাত্য নাট্যজগতে নবযুগ এনেছিল জার্মানীর মিনিন্‌জেন্ নাট্যসম্প্রদায়-পরে যার আদর্শে গঠিত হয় রুশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটার। সেখানে বড় ও ছোট ভূমিকা ছিল তুল্যমূল্য। অর্দ্ধেন্দুশেখরও নিশ্চয়ই ঐ মত পোষণ করতেন। কিন্তু এইরকম নিঃস্বার্থ শিল্পী-মনের পরিচয় দিয়ে তাঁর পক্ষে আখেরে ফল বড় ভাল হয়নি। তিনি নটগুরু এবং সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের অন্যতম স্রষ্টা হ'লেও সকলেই তাঁর মাথাতেই কাঁটাল ভক্ষণ করেছে পরমানন্দে। সে সময়ে একজন নৃত্যশিক্ষকও দেড়শত টাকা মাহিনা পেতেন অথচ নিজের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর কখনো আশী টাকার বেশি মাহিনা পান নি।

"অর্দ্ধেন্দুশেখর দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁর অসাধারণ শিল্পনিষ্ঠা কোনদিন তাঁকে টাকা-আনা-পয়সার দিকে আকৃষ্ট হ'তে দেয়নি। এমন কি এটা বলা চলেও যে, নিজেই তিনি নিজের মাথায় দারিদ্র্যের ভার তুলে নিয়েছিলেন এবং তারও কারণ তাঁর গভীর নাট্যানুরাগ।" ('যাঁদের দেখেছি'—পৃ. ৮৩)

হেমেন্দ্রকুমার অন্যত্র লিখেছেন :

"সকল অভিনেতাকেই দেখি, বড় বড় ভূমিকার জন্যে লালায়িত হ'তে। এ দুর্বলতা হচ্ছে অক্ষমের বা অল্পশক্তির দুর্বলতা। কেন না বড় ভূমিকা অভিনয় করলেই যে বড় অভিনেতা হওয়া যায়, এটা হচ্ছে প্রচলিত কুসংস্কার মাত্র। কারণ বুঝিয়ে বলা দরকার। বড় ভূমিকায় অনেক জায়গায় ফাঁকি দেওয়া চলে। এক জায়গায় অভিনয় খারাপ হলেও, অন্য জায়গায় তা শুধ্‌রে নেওয়া চলে। কিন্তু ছোট ভূমিকায় সেটি হবার যো নেই, তার মধ্যে অবকাশ অত্যন্ত অল্প। তাই তার প্রত্যেক কথাটি যারপরনাই সাবধানে উচ্চারণ করতে হয়। কারণ মুহূর্তের অমনোযোগিতায় সমস্ত ভূমিকা ব্যর্থ হয়ে যায়, আর তা শুধ্‌রে নেবার

অবসর মেলে না, তাই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যেই তাকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুট না ক'রে তুললে চলে না। এইজন্যে প্রায়ই বড় ভূমিকার চেয়ে ছোট ভূমিকার মধ্যেই অভিনেতার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় বেশি।

"এদিকে অর্দ্ধেন্দুশেখরের জুড়ি পাওয়া ভার। ছোট'র মধ্যে তিনি বড়কে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন—বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর আভাস।...গিরিশচন্দ্রের দ্বারা অনূদিত 'ম্যাকবেথ' নাটকে অনেক সাধারণ নট বড় বড় ভূমিকা নিয়ে লাভ করেছিলেন প্রচুর আত্মপ্রসাদ; কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর একসঙ্গেই কয়েকটি ক্ষুদ্র ভূমিকা নিয়ে আপনার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে দর্শকদের একেবারে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। এথেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, অর্দ্ধেন্দুশেখরের চরিত্রে হাম-বড়াই ভাব ছিল না মোটেই। অথচ এই গুণ তাঁর পক্ষে সাংসারিক হিসেবে দোষের হয়েই দাঁড়িয়েছিল—কারণ এইজন্যেই প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাবান হয়েও সারা জীবনে তিনি নিজের আর্থিক উন্নতি করতে পারেন নি কিছুমাত্র। বাংলা রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা হয়েও তাঁর মাসিক মাহিনা কখনো আশী টাকা পর্যন্ত ওঠে নি—অথচ তাঁর অনেক অযোগ্য শিষ্য আজ গুরুর চেয়ে দুগুণ, তিনগুণ বা তার চেয়েও বেশি টাকা রোজগার করছেন। অর্থের প্রতি এই নিস্পৃহতার মধ্যে আমরা অর্দ্ধেন্দুশেখরের আর এক মূর্তি দেখতে পাই। সে মূর্তি হচ্ছে খাঁটি সাধক ও কলাবিদের মূর্তি—যাঁর একমাত্র উপাস্য হচ্ছে আর্ট এবং আর্টের মধ্যেও যিনি টাকা-আনা-পয়সা বা সওদাগরির হিসাব আনতে একান্ত নারাজ! এ-কথা মনে করলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের উপরে আমাদের শ্রদ্ধা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে—কারণ এদেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এই হিসাবে অর্দ্ধেন্দুশেখরের মতন আর একটি সাধকেরও দেখা পাওয়া যায় না। উপরন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারীরা যে কতদূর অবিবেচক, স্বার্থপর ও হৃদয়হীন, অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতি পরম অবহেলাতেই তার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে ও স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্রের মত লোকও অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতিভার জন্য যথাযোগ্য সহানুভূতি দেখাতে পারেন নি এবং বাঙালীর পক্ষে এটা লজ্জার কথা।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর': 'নাচঘর', ৩রা আশ্বিন, ১৩৩১)

সমসাময়িকদের এই সব রচনায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের অন্তর্জীবনের সুন্দর ছবি প্রতিফলিত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন গৌরকান্তি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। মুখশ্রী ছিল তাঁর সুন্দর গম্ভীর। প্রকৃতি ছিল তাঁর সরল, অমায়িক ও নিরহঙ্কার।

কলালক্ষ্মীর উপাসনাই তাঁর সারধর্ম ছিল। যে কেউ আগ্রহসহকারে যখনই তাঁর কাছে অভিনয়-কলা শিক্ষার জন্যে উপস্থিত হতো তাকেই পরিপূর্ণভাবে শিক্ষাদান করে নিজে কৃতার্থ হতেন। অপরেশচন্দ্র লিখেছেন:

"তাঁহার কাছে ইতর বিশেষ ছিল না—নদীর জল যেমন সকলের সহজলভ্য—অর্দ্ধেন্দুবাবুর নিকট উৎসাহলাভ ও শিক্ষাগ্রহণও সেইরূপ সকল শ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রীর সহজলভ্য ছিল। তিনি প্রাণান্ত পরিশ্রমে সকল শিক্ষার্থীকেই সমানভাবে শিক্ষা দান করিতেন; তাহাদের ভিতর কাহারও এতটুকু ক্ষমতা দেখিলে শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতেন; সস্নেহে বলিতেন, 'বাপু পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা কর, সাধনা কর, কালে আমার অপেক্ষাও বড় অভিনেতা হইতে পারিবে।' মনুষ্যত্বের হিসাবে অর্দ্ধেন্দুশেখরের এই সহৃদয়তা ও মহত্ত্ব কেবল নটজীবীর নহে, মনুষ্যমাত্রেরই অনুকরণীয়।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখরের নটজীবন')

মানুষের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর প্রেম। যে কেউ তাঁর হৃদয়ের কাছে যেত, তাকেই অকৃত্রিম ভালবাসায় বুকে টেনে নিতেন। কোনও প্রার্থীকে 'না' বলতে পারতেন না। মিত্র নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক সারল্যের জন্যে তাঁকে ঠকতে হয়েছে। তাঁর মেজাজ ছিল মজলিসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানারকম রঙ্গরসের কথা বলে এই সদাহাস্যময় পুরুষ সকলকে আমোদে রাখতে পারতেন। ছোটবড় বয়সের ভেদাভেদ ভুলে, এমন কি তাঁর পুত্রের বন্ধুদের সঙ্গেও অসঙ্কোচে সরস আলাপ করতেন। অর্দ্ধেন্দুর জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যোমকেশের বন্ধু আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এ বিষয়ের উল্লেখ ক'রে লিখে গেছেন:

"ব্যোমকেশের সঙ্গে আমি প্রায়ই তাঁদের বাগবাজারের বাসায় যেতেম, তখন বৃদ্ধ অর্দ্ধেন্দুশেখর এসে আমাদের কাছে বসতেন, বুড়ীর পিঠে গড়বার কথা তিনি যে কতবার আমাদের নকল ক'রে শুনিয়েছেন, তার সংখ্যা নেই। বুড়ী জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে কাঁথা ও লেপ মুড়ি দিয়ে পিঠে কী ক'রে তৈরি কচ্ছিল তা অর্দ্ধেন্দুবাবু এমনই কণ্ঠস্বর ক'রে বলে যেতেন যে আমরা হাসতে হাসতে মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে পড়তুম। আমরা তাঁর ছেলের বন্ধু, কিন্তু তিনি এমনিভাবে মিশতেন যেন মনে হতো তাঁর সঙ্গে আমাদের বয়স বা পদের কোন পার্থক্য নেই। এক অবাধ সারল্য যেন সকল বাধার গণ্ডী অতিক্রম ক'রে বুড়োকে এনে যুবকের সঙ্গে এক পংক্তিতে মিলিয়ে দিত।" (উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'অর্দ্ধেন্দুশেখর' পুস্তিকা থেকে পুনরুদ্ধৃত)

অর্দ্ধেন্দুশেখর ছিলেন একান্তভাবেই নির্বিবাদী মানুষ। থিয়েটারে নোংরা পলিটিক্স্ তখনও ছিল, এখনও আছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর থিয়েটারী পলিটিক্সের ধারে কাছেও থাকতেন না। অর্দ্ধেন্দুর এই মহৎগুণের কথা উল্লেখ ক'রে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বলেছেন:

"থিয়েটারে দলাদলি চিরকাল। ক্ষেত্রমণিকে ভাল পার্ট না দিয়ে starve

করিয়ে করিয়ে নষ্ট করে দিলে। দলাদলিতে থাকতেন না অর্দ্ধেন্দুবাবু; খুব ভাল লোক ছিলেন তিনি। সব দলেই মিশতেন। খুব দরাজ দিলও ছিল ওঁর। অমন লোক আর হবে না।" ( রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু প্রণীত 'শিশির সান্নিধ্যে', পৃ. ৩৭ )

শিশিরকুমার আরও বলেছেন :

"মানুষ বড় ভালো ছিলেন, রিহার্সালে আমারই মত ঝোঁক ছিল, দশ-পঁচিশ বার বলতে কষ্ট পেতেন না। রিহার্সাল আরম্ভ করলে আর শেষ করতে চাইতেন না, তা লোকে মরুক আর তরুক।

"মানুষটি খুব দুঃসাহসী ছিলেন। 'দন্তাবক্রে' শৌরীন্দ্রমোহনের নকল করে তাঁর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হলেন। তবে কালীকেষ্ট ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। শিখিয়েছেন কিন্তু পাত্র-অপাত্র ভেদ না করে।

"গিরিশবাবু কিন্তু কাউকে শেখাতেন না; রিহার্সালে বসতেন এক ডাবা পান, আর ব্র্যাণ্ডি বা হুইস্কির বোতল নিয়ে, চাকর সোডার বোতল নিয়ে তৈরি থাকত। দু'তিনবার বলেই বলতেন—ঠিক হয়েছে, তোমার বয়সে অমন আমি পারতুম না, এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল, তাহলেই হবে।" ( তদেব, পৃ. ৪৯ )

অর্দ্ধেন্দুশেখরও মদ্যপান করতেন। অপরেশচন্দ্রের সাক্ষ্যে জানা যায়, মদই তাঁর অহোরাত্রের সঙ্গী ছিল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারও তাঁর মদ্যপান সম্বন্ধে কিছু কিছু সরস মন্তব্য করে গেছেন। তিনি বলেছেন :

"অর্দ্ধেন্দুবাবুর কথা ছেড়ে দাও, মরবার সময়ে বলেছিলেন, সর্বাঙ্গে দিশী মদ ঢেলে তবে যেন পোড়ান হয়।···খাবার মধ্যে খেতেন দিশী মদ। দিশী ছাড়া কখনও বিলিতিতে উঠতে পারেন নি। দিশী মদ বোধ হয় তখন চোদ্দ আনা বোতল ছিল।" ( তদেব, পৃ. ৪৮-৫০ )

শিশিরকুমার অন্যত্র বলেছেন :

"শুনেছি বিলিতি মদকে অর্দ্ধেন্দুবাবু ঘৃণা করতেন এবং আকণ্ঠ বাংলা খেয়েও তিনি মাতাল হতেন না। তিনি নাকি বলে গিয়েছিলেন—'আমার মৃত্যুর পর বাংলা মদে স্নান করিয়ে আমায় পোড়াবে।' অপরেশবাবু ও হাঁদুবাবু * নাকি তাই করেছিলেন।" ( শ্রীসমীর লাহিড়ী প্রণীত 'আমাদের নাট্যাচার্য' শীর্ষক প্রবন্ধ : 'নতুন খবর', ১১ই জুলাই, ১৯৫৯)

শেষ জীবনে অর্দ্ধেন্দুশেখর সংসার সম্বন্ধে নিস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন। পিতৃভক্ত ব্যোমকেশ সংসারের সকল দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়ে পিতাকে অবসর

*সেকালের নামজাদা অভিনেতা মন্মথনাথ পাল। ইনি অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিষ্য ছিলেন।

দিয়েছিলেন। পিতা একদা 'কিছু কিছু বুঝি'-তে শৌরীন্দ্রমোহনের নকল ক'রে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রের সরল ও মধুর ব্যবহারে সে বিরাগের অবসান হয় এবং ব্যোমকেশ শৌরীন্দ্র-মোহনের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের পর বেনারসী দাস এমারেল্ড ভাড়া নিলেন। 'অনুসন্ধান' পত্রের ( ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২।নভেম্বর, ১৮৯৫ ) সংবাদ :—

"এমারেল্ড থিয়েটার।—একজন হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী এমারেল্ডের নাকি কর্তৃত্ব লইয়াছেন। নূতন বন্দোবস্তে শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় এক্ষণেও উক্ত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ বটে। রঙ্গক্ষেত্রে তিনি একজন প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি; তাঁহার সহযোগিগণও অনেকেই আছেন। 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতির পর এক্ষণে তাঁহারা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা' নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগ করিতেছেন।"

'বঙ্গবিজেতা' ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর 'মাসুমি কাবুলি' সাজেন।

২৫এ ডিসেম্বর তারিখে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পর 'এমারেল্ড' উঠে যায়।

অতঃপর নীলমাধব চক্রবর্তী ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের শেষার্ধে এমারেল্ডের মঞ্চ ভাড়া নিয়ে সেখানে সিটি থিয়েটার চালাতে শুরু করেন। কিন্তু নীলমাধববাবুরও ভাড়া বাকি পড়তে থাকায় গোপালবাবু সিটি থিয়েটারকেও উঠিয়ে দেন। সিটি থিয়েটার উঠে যাবার পর গোপালবাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে (১৮৭৬-১৯১৬) এমারেল্ড মঞ্চ ভাড়া দিলেন। অমরেন্দ্রনাথ এখানে ক্লাসিক থিয়েটার খুললেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল ক্লাসিকের দ্বারোদ্ঘাটন হয় এবং ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের মে-মাসে এর দরজা বন্ধ হয়। ক্লাসিক নিলামে ওঠে। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নদীয়া জেলার চণ্ডীপুরের জমিদার ( এখন বাঙলা দেশের অন্তর্গত ) শরৎ কুমার রায় একলক্ষ আট হাজার টাকায় ক্লাসিক অর্থাৎ এমারেল্ডের বাড়ি কিনে সেখানে কোহিনুর থিয়েটারের পত্তন করেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ১১ই আগস্ট তারিখে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ঐতিহাসিক নাটক 'চাঁদবিবি' দিয়ে কোহিনুর থিয়েটারের উদ্বোধন হয়।

কিন্তু আমরা অনেকটা দূর এগিয়ে এসেছি। আপাতত অর্দ্ধেন্দুর কাছে ফিরে যাওয়া যাক।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

'ইতিবৃত্ত আছে শুদ্ধ' ( ১৮৯৬-১৯০২ )

পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি ১৮৯৫ সালের ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পর এমারেল্ড থিয়েটার উঠে যায়। এই সময়েই অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনের একটি পর্যায় শেষ হয়ে আর একটি পর্যায় শুরু হয় যার পরিব্যাপ্তি-কাল ১৮৯৬ সালের প্রারম্ভ থেকে ১৯০২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। তাঁর এই ছয় বৎসরের নটজীবনের ইতিবৃত্ত বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইতস্তত বিবরণ যেটুকু পাওয়া গেছে তাই উপস্থাপিত করছি। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের অবকাশ আছে।

এই পর্যায়ের গোড়ার দিকে ( ১৮৯৬-৯৭ ) অর্দ্ধেন্দুশেখর কয়েকটি প্রাইভেট থিয়েটারে শিক্ষকতা করতেন।

সে সময়ে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু প্রাইভেট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেকালে প্রাইভেট থিয়েটার হিসেবে 'ভিক্টোরিয়া ড্রামাটিক ক্লাব'-এর প্রসিদ্ধি ছিল। এই ক্লাবের পরিচালক ছিলেন চন্দ্রনাথ সেন এবং শিক্ষক ছিলেন অর্দ্ধেন্দু-শেখর। এই প্রাইভেট থিয়েটার কলকাতার রামবাগান অঞ্চলে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পাল-পরবে শহর ও মফঃস্বলে নাট্যাভিনয় দেখিয়ে বেড়াত। অমরেন্দ্রনাথ যখন ক্লাসিক থিয়েটার খোলেন ( ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭ ) তখন এই ক্লাব সাজপোশাক ও অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেছিল ( দ্র. অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশবৎসর,' পৃ. ২৯ )। অতএব এই গৌণ প্রমাণের বলে বলা যায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর এই সময়ে প্রাইভেট থিয়েটারের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।

বীণা রঙ্গমঞ্চ থেকে 'গেইটি' থিয়েটার ( সিটি থিয়েটারের পরিবর্তিত নাম ) যখন উঠে যায় ( ১৮৯৬ ), সেই সময়েও অর্দ্ধেন্দুশেখর অপর একটি নাম-না-জানা প্রাইভেট থিয়েটারে শিক্ষকতা করতেন। এর গৌণ প্রমাণ সেকালের নামজাদা নটী বড় সুশীলাবালার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনীতে পাওয়া যায়। সেটি উদ্ধার করে দিই—

"গেইটি থিয়েটার উঠিয়া গেলে, সুশীলা কিছুদিন কোন প্রাইভেট থিয়েটারে অভিনয় করিয়াছিল। এইখানে নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর শিক্ষকতা করিতেন ;

—জহুরীর নিকটেই জহরের কদর হয়,—অর্দ্ধেন্দুবাবু অভিনয়কার্যে সুশীলার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন, ভবিষ্যতে সে যে বঙ্গীয় নাট্যশালার একটি উজ্জ্বল রত্নের ন্যায় দীপ্তিলাভ করিবে তাহা তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন এবং বিশেষ যত্নসহকারে সুশীলাকে অভিনয় শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন; সে শিক্ষার প্রভাবে সুশীলার অভিনয়জীবনে যে যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।" (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'অভিনেতৃ-কাহিনী', পৃ ১১২)

এরপর অর্দ্ধেন্দুশেখরকে ভিন্ন ভিন্ন পর্বে মিনার্ভা থিয়েটারে দেখা গেছে। প্রথম পর্বে ১৮৯৮ সালের জুলাই মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত (দ্র. রমাপতি দত্ত প্রণীত 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ', পৃ. ১৯৩ ও ১৯৮), দ্বিতীয় পর্বে ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯০০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্বে ১৯০০ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯০১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত।

সমকালে গিরিশচন্দ্রের কর্মস্থল ও কর্মকাল সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হলো—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| স্টার থিয়েটার | — | ১৮৯৬ থেকে | ১৮৯৭ | পর্যন্ত |
| ক্লাসিক থিয়েটার | — | জুলাই, ১৮৯৮ থেকে | ২৪এ ডিসেম্বর ১৮৯৮ | ,, |
| মিনার্ভা থিয়েটার | —২৫এ ডিসেম্বর ১৮৯৮ থেকে | | ২৫এ মার্চ, ১৮৯৯ | ,, |
| ক্লাসিক থিয়েটার | — ২৯এ এপ্রিল ১৮৯৯ থেকে | | ১৫ই এপ্রিল, ১৯০০ | ,, |
| মিনার্ভা থিয়েটার | — ১৬ই এপ্রিল ১৯০০ থেকে | | ২৩এ অক্টোবর, ১৯০০ | ,, |
| ক্লাসিক থিয়েটার | —২৪এ অক্টোবর ১৯০০ থেকে | | অক্টোবর, ১৯০৪ | ,, |

১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহোপলক্ষ্যে মিনার্ভা সম্প্রদায়কে কাশিমবাজারে অভিনয়ার্থ আমন্ত্রণ করেন। তদুপলক্ষে মিনার্ভা থিয়েটার সেখানে 'সধবার একাদশী', 'চৈতন্যলীলা' ও 'প্রফুল্ল' অভিনয় করে। সম্প্রদায়ের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরও কাশিমবাজারে গিয়েছিলেন।

১৮৯৮ সালের ৩১এ মার্চ তারিখে নাগেন্দ্রভূষণের মিনার্ভা থিয়েটার প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি হয়। ১৮৯৯ সালে শ্রীপুরের তরুণ জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক। তাঁর আমলে অভিনীত নাটকগুলির তালিকা,—অভিনয়ের তারিখ সহ—এখানে উপস্থাপিত করছি। তালিকায় প্রদত্ত সন-তারিখ অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে সঙ্কলিত।

২৯এ মে, ১৮৯৯—শ্রী
১২ই অগাস্ট, ১৮৯৯—মদালসা
৩০এ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯—কিশোর সাধন
৪ঠা নভেম্বর, ১৮৯৯—Encore' 99 or Sreemati
৬ই জানুয়ারি,১৯০০—জুলিয়া
৭ই জানুয়ারি, ১৯০০—পলাশীর যুদ্ধ
২৪এ জানুয়ার, ১৯০০—জেনানা যুদ্ধ
২৪এ মার্চ, ১৯০০—বসন্ত-বিহার বা হোরি
২৫এ মার্চ, ১৯০০—মাধবীকঙ্কণ

আমার অনুমান, 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'জেনানা যুদ্ধ'-য় অর্দ্ধেন্দুশেখর যথাক্রমে ক্লাইব ও কর্তার ভূমিকায় নেমেছিলেন। এই অনুমানের পিছনে অবশ্যই যুক্তি আছে। কারণ, অর্দ্ধেন্দুশেখরের সাহায্য ব্যতিরেকে সেকালে কোন থিয়েটার 'জেনানা যুদ্ধ'-র অভিনয়ে সাহসী হতে পারে এটা ভাবতেই পারা যায় না। সমকালীন সাক্ষ্যে জানা যায় অর্দ্ধেন্দুশেখর ক্লাইব করেছিলেন এবং সে অভিনয়ের প্রশংসা ক'রে ললিতচন্দ্র মিত্র লিখেও গেছেন, "পলাশীর যুদ্ধে তিনি ক্লাইব সাজিয়া ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীকে দর্শন করিয়া মুখে যে বিস্ময়ের ভাব আনিতেন, সে ছবিও অতি মনোরম।" ( 'অর্দ্ধেন্দু কথা' : 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্ত্তিক ১৩২৭ )

১৯০০ সালের নভেম্বর মাসে অর্দ্ধেন্দুশেখর আবার মিনার্ভায় যোগ দেন। ৭ই ডিসেম্বর তারিখে সাধারণ নাট্যশালার আটাশ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে মিনার্ভায় তাঁর উদ্‌যোগে একটি সভা হয় এবং ঐ সভায় তিনি ও মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মশায় বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস বিবৃত করেন।

১৯০১ সালের ৮ই মার্চ, শুক্রবার প্রখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু ক্লাসিক থিয়েটারের বাড়িতে পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতির সম্মানার্থে ১৩ই মার্চ, বুধবার ক্লাসিকের অভিনয় বন্ধ থাকে। ১০ই মার্চ, রবিবার মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় আরম্ভের আগে ( 'শ্রী' ও 'হীরার ফুল' ) অর্দ্ধেন্দুশেখর মহেন্দ্রলালের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ক'রে নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি দেন—

"আজ আমি আপনাদিগকে একটি শোকের সংবাদ দিতে আসিয়াছি। গত শুক্রবার বেলা ৯ টার সময়ে আমাদের নাট্যজগতের একটি রত্ন মহেন্দ্রলাল বসু ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যে কয়জন মিলিয়া কলিকাতায় এই নাট্যামোদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম, একে একে সেই কয়জনের মধ্যে অনেকেই চলিয়া গেলেন। এই নাট্যামোদ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যিনি আমার প্রধান

শক্তি ছিলেন, সেই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সকলের অগ্রে আমাদিগকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন, তাহার পর আমার সহোদরপ্রতিম মতিলাল সুর আজ কয়েক বৎসর মাত্র ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। সহোদর বলিলাম, কারণ, মতি আর আমি আমার গর্ভধারিণীর স্তনপান করিয়া বাঁচিয়া ছিলাম। তাহার পর আজ আমি আর একটি ভাই হারাইলাম। মহেন্দ্রের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে আজীবন এই এক কার্যে একত্র কাটাইয়াছি, চিরদিন মহেন্দ্র আমার দক্ষিণ হস্তের ন্যায় কার্য করিয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্র কিরূপ অভিনেতা ছিল, সে কথা আর আমি অধিক ব্যাখ্যা করিয়া কি বলিব? আপনাদিগকে সে এতদিন অনেক আনন্দ দিয়া গিয়াছে, আপনারাই তাহা ভাল জানেন। আপনারাই তাহার কৃতিত্বে প্রীত হইয়া তাহাকে 'The Tragedian' বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র যেসকল নাটকে, যেসকল ভূমিকা লইয়া অভিনয় করিয়া গিয়াছে, সে সকল ভূমিকা তেমন সুন্দররূপে প্রতিফলিত করিতে কয়জন পারে? মহেন্দ্র গিয়াছে, কিন্তু তাহার আবাল্যঅনুষ্ঠিত কার্যাবলী আজ আমার দৃষ্টিপথে একে একে ফুটিয়া উঠিতেছে। বিধাতা হঠাৎ তিনদিনের দুরন্ত প্লেগরোগে তাহাকে সরাইয়া লইলেন, নতুবা তাহার স্বাস্থ্য সেরূপ ভগ্ন হয় নাই। আমার কোনদিন বিশ্বাস ছিল না যে, মহেন্দ্রকে আমরা এত শীঘ্র হারাইব। মহেন্দ্রর মৃত্যু, অকালমৃত্যু। এই অকাল মৃত্যু না হইলে মহেন্দ্রের অভিনয়ে বাঙ্গলা নাট্যালয়ের এখনও আরও উন্নতির আশা ছিল। মহেন্দ্র নাটকের রসগ্রহণ, কথাবস্তুর ভাবগ্রহণ করিতে পারিত, সুতরাং তাহার অভিনয় ভাল হইত। মহেন্দ্র বাল্যকালে যেভাবে অভিনয় শিখিয়াছিল, শেষপর্যন্ত সেইভাবেই সে অভিনয় করিয়া গিয়াছে। সেকালের শিক্ষায় স্বাভাবিক ভাব, স্বর, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি অনুকরণ করিবার জন্যই অভিনেতৃগণকে আমরা প্রাণপণে শিখাইতাম। আমাদের সেই চেষ্টার একটি সুন্দর ফল ফলিয়াছিল—মহেন্দ্রলাল বসু। আজ সেই ফলটি অকালে বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। মহেন্দ্রের মৃত্যুতে আপনারা যেমন একটি আনন্দদায়ক বন্ধু হারাইলেন, দেশের একজন যশস্বী অভিনেতা হারাইলেন, আমিও তেমনি একটি সহোদরোপম বন্ধু, সখা, ছাত্র হারাইলাম। মহেন্দ্রের সম্বন্ধে আর একটি সংবাদ আপনারা কেহ জানেন না। মহেন্দ্রের পিতা ৺ব্রজলাল বসু মহাশয় একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। সেকালের কলিকাতার শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ইংরাজিতে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকাদির অভিনয় করিতেন। ৺ব্রজলাল বসু তাহারই একজন অভিনেতা ছিলেন। পিতার গুণ পুত্রে সুন্দর বর্তিয়াছিল।

"একে একে নগেন্দ্র, মতি, মহেন্দ্র চলিয়া গেল, পুরাতনের মধ্যে আমাদের

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, আমার সহোদরোপম বন্ধু শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু আর আমি রহিলাম। একদিন আমাদেরও যাইতে হইবে। স্তবকের ফুল ফল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে স্তবকটি শীঘ্রই শূন্য হইয়া যায়। আমরাও এইরূপ কে কবে ঝরিয়া যাইব জানি না, কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা, আমাদের পরবর্ত্তী নবীন অভিনেতাগণ নাট্যসাহিত্যের মান রক্ষা করিয়া, অভিনয়কলার নিয়ম রক্ষা করিয়া এই নাট্যামোদের উন্নতি করিতে থাকুন। আমি বিদায় হই।" ('রঙ্গভূমি', ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৩০৭, ৫ই চৈত্র : ২৭এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সালের 'নাচঘর' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত )

মিনার্ভায় পরবর্ত্তী যে-দুটি নাটকের পুনরভিনয় হয়, আমার অনুমান, তার মূলেও অর্দ্ধেন্দুশেখর। একটি 'বঙ্গবিজেতা', অভিনয়ের তারিখ ১৬ই মার্চ ; অপরটি 'বসন্ত রায়', অভিনয়ের তারিখ ৬ই এপ্রিল। ইতিপূর্বে এ-দুটি নাটক এমারেল্ডে অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতায় অভিনীত হয়েছিল।

এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। অপরেশচন্দ্র বলেছেন, অর্দ্ধেন্দুশেখর 'সীতারাম' নাটকে দরোয়ান ও কাজীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু কবে কোথায় তা বলেননি। আমাদের নিশ্চিত ধারণা, অভিনয়ের স্থান মিনার্ভা থিয়েটার ; তবে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে কালসম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে এও উল্লেখ করতে হয়, মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের পরিচালনায় ১৯০০ সালের ২৩এ জুন তারিখে 'সীতারাম' অভিনীত হয়।

অতঃপর এই পর্যায়ে অর্দ্ধেন্দুশেখরের নটজীবনের আর কোনও বিবরণ খুঁজে পাই নি। সমকালীন সাক্ষ্যে আর একটি সংবাদ পাওয়া যায়, এই সময়ের পরে অর্দ্ধেন্দুশেখর বেশ কিছুকাল ঢাকায় ছিলেন এবং সেখানে অভিনয় করতেন।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### অরোরা থিয়েটারে নটলীলা (১৯০২)

বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর (১৮৮০ খ্রীঃ) দীর্ঘ বিশবৎসর কাল বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ৭ই জুন, ১৮৪০) বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিহারীলালের মৃত্যুর (২০এ এপ্রিল, ১৯০১) অব্যবহিত পরেই বেঙ্গল থিয়েটার বিলুপ্ত হয়।

বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চ ভাড়া নিয়ে গুরুপ্রসাদ মৈত্র সেখানে অরোরা থিয়েটার স্থাপন করেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট তারিখে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দক্ষিণা' দিয়ে অরোরার উদ্বোধন হয়।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে অর্দ্ধেন্দুশেখর অরোরায় যোগ দিলেন। এ ব্যাপারে উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন :

"অর্দ্ধেন্দুবাবু যখন অরোরা থিয়েটারে যোগদান করেন তখন অরোরা থিয়েটারে রিজিয়া নাটকের পুরাদস্তুর মহলা চলিতেছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই নাটকে রিজিয়ার ভূমিকা মহলা দিতেছিল। সঙ্গীতসমাজের ৺নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রিজিয়ার শিক্ষাপ্রদান করিতেছিলেন। কিন্তু মুস্তৌফী সাহেব আসিয়া সে শিক্ষা ইংরাজী ভাবাপন্ন বলিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে তাহা একেবারে ভুলিয়া যাইবার উপদেশ দেন এবং স্বয়ং আগাগোড়া নূতন করিয়া শিক্ষাপ্রদান করেন।" ('বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী,' ১৫ই চৈত্র, ১৩২৬)

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে 'রিজিয়া'-র প্রথম অভিনয় হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় (২৪এ মে, ১৯০২) প্রকাশিত 'রিজিয়া'-র দ্বিতীয় রজনীর অভিনয়ের বিজ্ঞাপন :

Glorious Success ! Glorious Success !!

Glorious Success !

AURORA THEATRE

**Saturday, the 24th May, 1902, at 9 p.m.**

**Second Performance of Rezia.**

**REZIA**

The virgin Queen of Delhi
By Babu Mono Mohun Rai, B A.
An Historical tragedy in five acts
The maiden production of a drawing genius.
Histrionic grandeur commingled with literary culture
and elevating correctives in the shape of chaste honour.
Paraphernalia all in Aurora's style and finish.
Rezia—Sm. Tarasundari.
Executioner—Mr. A. Mustaphi
Next day, Sunday at candle light
Last performance of
KALPARINAY
followed by
ABU HOSSAIN
Abu—A. Mustaphi.

S. C. Dass — G. P. Moitra
Asstt. Manager. — Manager.

"Rezia" to be had at the Box Office.

'রিজিয়া' সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "...স্কটের প্রসিদ্ধ নভেল (Kenilworth) কেনিলওয়ার্থ অবলম্বনে ইহা রচিত। 'অরোরা' থিয়েটারে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়।...এই থিয়েটারে যতগুলি নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একমাত্র 'রিজিয়া'ই উল্লেখযোগ্য আর বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের গৌরবাস্পদা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীর যশোমুকুটে অভিনয়-সাফল্যের যতগুলি রত্ন আছে, এই রিজিয়ার ভূমিকায় অভিনয়-নৈপুণ্য তন্মধ্যে মধ্যমণি-স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন এবং এখনও রিজিয়া বলিতে তারাসুন্দরীকেই বুঝায়। এ ভূমিকায় এ পর্যন্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইবার সাহসও কেহ করেন নাই। বহুকাল পূর্বে মিনার্ভা থিয়েটারের কোন এক সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই 'রিজিয়া'র উল্লেখ করিয়াই বলিয়াছিলেন, যে ইউরোপ ও আমেরিকার কোন রঙ্গমঞ্চে 'তারার' রিজিয়ার অভিনয়ের মত অভিনয় তিনি দেখেন নাই।" ('রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর', ১৩৪০, পৃ. ৬৭)

এখানে তারাসুন্দরীর 'রিজিয়া' সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পালের লিখিত মন্তব্যটি উদ্ধার করে দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিপিনচন্দ্র লিখে গেছেন—

But not merely in the refinement and delicacy of their deportment on the stage, but equally also in the quality of

their art some of our actresses could well hold their own in competition with the best representatives of the English Stage. Those who have seen the part of Reziya as it is played by Sreemati Tarasundaree, will bear out the truth of this statement. Reziya's is one of the most complex characters met with in any literature. Shakespeare's Lady Macbeth comes very close to it. But even Lady Macbeth is possibly a shade simpler than Reziya. And Tara's rendering of Reziya has been declared by competent critics, who have seen the best European actresses, to be as good an achievement as the best rendering of Lady Macbeth by the most capable of English actresses..." ('The Bengalee Stage': 'The Hindu Review', February, 1913; Reprinted in 'Bohurupee' Patrika, March, 1974).

অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'ঘাতক' সম্বন্ধে কলা-সমালোচক হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন:

"অধিকাংশ অভিনেতাই বড় বড় ভূমিকার জন্যে লালায়িত হন। কিন্তু বড় বড় ভূমিকাভিনয়ের জন্যে অতুলনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এবং নিজে নাট্যাচার্য হয়েও অর্দ্ধেন্দুশেখর কখনো প্রধানরূপে পরিচিত হতে চান নি। প্রায়ই গ্রহণ করতেন ছোট ছোট অবান্তর ভূমিকা এবং প্রায়ই দেখা গিয়েছে তাঁর অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যে সেই সব ছোট ছোট ভূমিকাই নাটকের মধ্যে অত্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করেছে। 'রিজিয়া' পালায় সকলকে নাটকের পাঠ শিখিয়ে এবং বড় বড় ভূমিকাগুলি অন্যান্য পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিলি ক'রে তিনি নিজে নিলেন ঘাতকের ছোট্ট ভূমিকা। কিন্তু তাঁর অভিনয়গুণে সেই ক্ষুদ্র ভূমিকাই এতটা বিখ্যাত হয়ে উঠল যে, পরে শ্রেষ্ঠ নট ছাড়া আর কেউ সেই ভূমিকাটি গ্রহণ করতে সাহসী হ'ত না।"* ('যাঁদের দেখেছি', পৃ. ৮২)

* পরবর্তীকালে নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অলৌকিক অভিনয়-নৈপুণ্যে 'ঘাতক' আবার নবরূপে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। বস্তুত, শিশিরকুমারের নটজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই 'ঘাতক'-এর ভূমিকাভিনয়। এই ভূমিকায় তাঁর ব্যক্তিত্ব-নিমজ্জিত অভিনয় সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে অদ্বিতীয় নাট্য-সমালোচক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী লিখেছেন: "আরও দু'একটি চরিত্রের উল্লেখ করা যায় যার অভিনয়ে শিশিরকুমারের কোন ব্যক্তিত্বই প্রকাশ পায় নাই। তন্মধ্যে 'রিজিয়া' নাটকের 'ঘাতক' চরিত্রটির কথা আমি সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে চাই। ঐ অতি ক্ষুদ্র এবং স্বল্প সংলাপ-সম্বলিত ভূমিকাটির অভিনয় দেখিতে দেখিতে স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হইতে হয়। ঘাতকের

অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'ঘাতক' সম্পর্কে শিশিরকুমারের মন্তব্য : "রিজিয়াতে অর্দ্ধেন্দুবাবু ঘাতক করতেন, তাঁর জন্যেই চলত।" (দ্রঃ রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু প্রণীত 'শিশির সান্নিধ্যে'—পৃ. ৮২)

অরোরায় ২৮এ মে অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' ও অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'পশু শাসন', ৩১এ মে 'রিজিয়া' এবং পরদিন ১লা জুন 'দক্ষিণা' আর 'সধবার একাদশী' অভিনীত হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় (৩০এ মে, ১৯০২) প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর 'সধবার একাদশী'-তে নিমচাঁদও সেজেছিলেন।

AURORA THEATRE
Saturday the 31st May 1902 at 9 P.M.
REZIA
By Babu Mono Mohun Rai, B.A.,
An Historical tragedy in five acts
Rezia—Sm. Tarasundari.
Executioner—Mr. A. Mustaphi.
Next day Sunday at Candle light
DAKSHINA
Followed by
That ever new and highly admired social-satire
SADHABAR-EKADASHI
Neemchand—Mr. A. Mustaphi.
Kanchan—Sm. Tarasundari.
"Bisha-Briksha" in active Rehearsal.

S. C. Dass — G. P. Moitra
Asstt. Manager. — Manager.

ভীতত্রস্ত দৃষ্টি, স্খলিত বাক্য শিশিরকুমারের সকল ম্যানারিজ্‌মকেই আচ্ছন্ন আবৃত করিয়া রাখে।" ('অভিনেতৃ আর অভিনয়' : 'ভগ্নদূত' পত্রিকা, ২৪ জুন, ১৯৫১)

নট-নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন : "কীন্‌ অভিনীত 'স্যার গিল্‌স' চরিত্র যে ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, স্মরণ করুন শিশিরকুমার অভিনীত…'রিজিয়া' নাটকের ক্ষুদ্র ঘাতকের ভূমিকা। যাঁরা এই অভিনয় দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে একজনও কি আছেন যিনি বলতে পারেন একটিবারও আত্মবিস্মৃত হয়ে থর্‌থর্‌ ক'রে কেঁপে ওঠেন নি?" ('রূপমঞ্চ' : শারদীয়া ১৩৬৬

১৬ই জুলাই বুধবার অভিনীত হয় 'নলদময়ন্তী', 'আবুহোসেন' আর 'জেনানা যুদ্ধ'। সেদিনের 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত বিজ্ঞাপন :—

Grand Tripple Programme on Wednesday
Attractive and Extraordinary
A rare opportunity !
AURORA THEATRE
No. 9, BEADON STREET.
NALA-DAMAYANTI
Nala—Babu Priyonath Ghosh.
Damayanti—Sm. Tara Sundari.
Followed by
ABU HOSSAIN
Abu—Ardhendu Babu (Mustaphi Saheb)
Rosina—Sm. Kusum Kumari
Songs and Dances—soft, sweet, beautiful
and graceful
To conclude with
ZENANA WAR
Padma Lochan—Mr. A. Mustaphi.
Best attention is paid to Zenana Seats.

S. C. Dass — G. P. Moitra
Asstt. Manager — Manager

২৬এ জুলাই রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালপরিণয়' ও গিরিশচন্দ্রের 'আলাদিন' এবং পরদিন ২৭এ জুলাই 'বিষবৃক্ষ' ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রমোদরঞ্জন' অভিনীত হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-য় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন (২৬এ জুলাই, ১৯০২) থেকে জানা যায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর 'কালপরিণয়' নাটকে 'জগদীশ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন।

Another Change of Programme.
Attractive ! Delightful ! Sensational !
AURORA THEATRE
No. 9, BEADON STREET
Saturday, the 26th July 1902 at 9 P.M.
KALPARINAY

OR

*The Fatal Marriage*

Jagadish—Mr. A. Mustaphi.

Mokshoda—Sm. Tarasundari

Abounding in thrilling dramatic situation painfully pathetic scenes relieved by humorous sketches and witty repartees scattered throughout in studied carelessness.

Followed by

ALADIN *OR The Wonderful Lamp*

Next Sunday at Candle light

BISHA-BRIKSHA

Nogendra—Babu Preonath Ghosh

Surja-Mukhi—Sm. Tarasundari

Followed by

PROMODE RANJAN

Chanchal—Ranu Babu (Sarat ch, Banerjee)

Best attention is paid to Zenana Seats.

S. C. Dass G. P. Moitra

Asstt. Manager Sole Proprietor & Manager

অরোরার পরবর্তী অভিনয়-প্রবাহ :—

৩০এ জুলাই—বিল্বমঙ্গল ও অমৃতলাল বসুর তাজ্জব ব্যাপার।

২রা অগাস্ট—নিত্যবোধ বিদ্যারত্নের একাদশ বৃহস্পতি।

২৩এ অগাস্ট—বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারানী ( হরিচরণ আচার্য কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্তিত )

২২এ নভেম্বর—রিজিয়া ও একাদশ বৃহস্পতি।

২৩এ নভেম্বর—প্রফুল্ল।

'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরকে দেখা যাচ্ছে। 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'-য় (২২এ নভেম্বর, ১৯০২) প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি দ্রষ্টব্য :—

Sensation of the Season

Rezia and Ekadas Brihaspati on Saturday

Profulla and Sita's Exile on Sunday

Grand Attraction ! Grand Attraction !

AURORA THEATRE
9, BEADON STREET
Saturday, the 22nd November at 9 P.M.
For one night only
REZIA
The Virgin Queen of Delhi
An Historical Tragedy in five Acts
REZIA—Sm. Tarasundari
Song-Soft and sublime
Dances—Beautiful
To be followed by
EKADAS BRIHASPATI
That most fascinating comic piece
comic songs, comic dances, comic situations
Next Day, Sunday, at candle light
That G. C. Ghose's Master-piece
PROFULLA
Jogesh—Mr. A. Mustaphi Romesh—Mr. Ranu Babu.
Suresh—Mr. P. N. Ghosh
Uma Sundari—Bhaba Tarini
Gyanada—Sm. Tara Sundari
To be followed by
SITA'S EXILE
War between Father and Son

G. P. MOITRA
Manager

Our New Drama PARITOSH is in active
Rehearsal.

সমকালীন দর্শক ও সমালোচকদের মধ্যে অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, তিনি শুধু কমিডির অভিনেতা, ট্র্যাজিডি তিনি অভিনয় করতে পারেন না। কিন্তু এ ধারণা একেবারে অমূলক ছিল। কি কমিডি বা কি ট্র্যাজিডিতে তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র লিখে গেছেন—

"গম্ভীর ভূমিকাতেও তাঁহার সমদক্ষতা ছিল; কিন্তু গম্ভীর ভূমিকা লইয়া তিনি বাহির হইলে, দর্শক প্রথমে সে অংশের গাম্ভীর্য ধরিতে পারিত না। অবশ্যই পরিশেষে সে ভূমিকার প্রকৃত পরিচয় পাইত এবং যেরূপ হাস্যরসাত্মক

অংশে হাসিত, করুণরসাত্মক অংশেও কাঁদিত।" ('নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী')

প্রসঙ্গক্রমে উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মশায়ের একটি মূল্যবান মন্তব্য এই স্থলে স্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন—

"অর্দ্ধেন্দুশেখর যে কেবল Comic ভূমিকারই অভিনয় করিতেন তাহা নহে, তিনি যোগেশ প্রভৃতি গুরুগম্ভীর ভূমিকাও অভিনয় করিয়াছেন। তবে তাঁহার Comic অভিনয়ের অপ্রতিম যশোরবি tragic অভিনয়ের গৌরবচন্দ্রমাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বসন্তের পিককাকলী যেমন অপর সমুদায় সুস্বর পক্ষীর কূজনকে ঢাকিয়া দেয় সেইরূপ অর্দ্ধেন্দুর comic অভিনয়ের বিপুল মাধুরীস্রোত তাঁহার tragic অভিনয়ের যশোলহরী অদৃশ্য করিয়া দিয়াছে।...প্রকৃত tragic অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের অবসানে লুপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রকৃত comic অভিনেতা বুঝি অর্দ্ধেন্দুশেখরের পরলোকপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইতেছে।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর', ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭)

এই সূত্রে অমৃতলাল বসুরও একটি মন্তব্য মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন—

"...অর্দ্ধেন্দুর মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হাসির ঢেউ তুলে লোকের বিচার-শক্তিকে পর্যন্ত ডুবিয়ে দেবার ক্ষমতা নিয়ে আর একজন রসিক বঙ্গদেশে জন্মাবে কিনা তাও সন্দেহ। গ্যারিক, কীন, কেম্বেল, ম্যাকরেডি, আর্ভিং এদের দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চম হয়েছে এবং হবেও কিন্তু আজও ইউরোপে কোথাও আর একজন জন লরেন্স টুল কি গ্রিমাণ্ডি দেখা দেয় নি।"...('অর্দ্ধেন্দুশেখর': 'নাচঘর,' ২৭ ভাদ্র ১৩৩১)

'যোগেশ'-এর ভূমিকায় গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ের তুলনাত্মক আলোচনা করতে গিয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন:

"'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশ একটি বিখ্যাত ভূমিকা। 'যোগেশ'রূপে গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের চরমসীমায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই ভূমিকায় একদিন অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাম বিজ্ঞাপিত হওয়াতে আমি দেখতে গেলুম সাগ্রহে। হতাশ হ'তে হল না। তিনি দেখালেন সম্পূর্ণ নূতন ধারণা। কেবল দুই জায়গায় তিনি গিরিশচন্দ্রের কাছে গিয়ে পৌছতে পারেন নি এবং আর কেউ পারবেন বলেও বিশ্বাস হয় না। শুঁড়িখানার দৃশ্যে এবং শেষ দৃশ্যে গিরিশচন্দ্র ছিলেন একেবারেই অতুলনীয়।" ('যাঁদের দেখেছি'—পৃ. ৮৫)

শেষ দৃশ্যে ঐ দুই দিকপাল অভিনেতার অভিনয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে হেমেন্দ্রকুমার অন্যত্র লিখেছেন:

"আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলবার সময়ে তাঁর চোখে অশ্রু থাকতো না, কিন্তু মনে হত সে দুটো পাথরে গড়া চোখ—চরম শোকে প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর যোগেশের ভূমিকায় এই দৃশ্যে নিজের অক্ষমতা বুঝে, দুই হাতে চোখ ঢেকে মাটির উপরে বসে পড়তেন।" ( তদেব, পৃ. ২৩ )

আর একজন প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণ এখানে উপস্থাপিত করছি। তিনি দীনবন্ধু-তনয় ললিতচন্দ্র মিত্র। তাঁর বিবরণ :

"তিনি হাসির অভিনেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি গম্ভীর ও গুরুতর অভিনয়েও যে সমান দক্ষ ছিলেন তাহা অনেকে অবগত নহেন। আমি 'প্রফুল্ল' নাটকে তাঁহাকে 'যোগেশ' রূপে দেখিয়াছি। গিরিশচন্দ্রেরও ঐ ভূমিকার অভিনয় দর্শন করিয়াছি। উভয়েই অতি উচ্চঅঙ্গের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। তুলনায় বলা যায় না কাহার অভিনয় অধিকতর উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। মনে হয় কোন কোন স্থলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের ভাল হইয়াছিল। 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' উক্তিতে অর্দ্ধেন্দু করুণভাবের এরূপ উৎস আনিতেন যে,যতবার সেই উক্তি শুনিয়াছিলাম, ততবার চক্ষে জল আসিয়াছিল। মুস্তফী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, একবার ঢাকাতে তাঁহার যোগেশের অভিনয় দেখিয়া একজন শ্রোতা ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন।" ( 'অর্দ্ধেন্দু কথা' : 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক ১৩২৭ )

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে অরোরায় নতুন নাটক 'পরিতোষ' মঞ্চস্থ হয় এবং ঐ বছরের শেষে অরোরা উঠে যায়। অর্দ্ধেন্দুশেখর স্টারে যোগদান করলেন।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

### ষ্টার থিয়েটারে নটলীলা ( ১৯০৩-০৪ )

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দ। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটার তখন খ্যাতিপ্রতিপত্তির সর্বোচ্চ শিখরে অধিরূঢ়। ক্লাসিকের একাধিপত্যে অন্যান্য রঙ্গালয়ের ভিত্তি পর্যন্ত কম্পমান। রথী মহারথী অভিনেতৃর সমাবেশে ক্লাসিকের আসর জমজমাট। স্টার নিষ্প্রভ।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি থেকে ৯ই মে পর্যন্ত স্টারে অভিনয় প্রবাহ :—

৩রা জানুয়ারি—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'বেদৌরা'

('The brilliant Turko-chinese opera')

৪ঠা ,, — ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সাবিত্রী'
১০ই ,, — বেদৌরা
১১ই ,, — সাবিত্রী
১৭ই ,, — বেদৌরা
১৮ই ,, — (অভিনয় হয় নি)
২৪এ ,, — বেদৌরা
২৫এ ,, — সাবিত্রী
৩১এ ,, — বেদৌরা
১লা ফেব্রুয়ারি— সাবিত্রী
৭ই ,, — বেদৌরা
৮ই ,, — ডি. এল. রায়ের 'বিরহ'
ও অমৃতলাল বসুর 'যাদুকরী'
১১ই ,, — (অভিনয় হয় নি)
১৪ই ,, — বেদৌরা
১৫ই ,, — বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'
২৮এ ,, — বেদৌরা
১লা মার্চ — অমৃতলাল বসুর 'হরিশ্চন্দ্র'
৭ই ,, — বেদৌরা
৮ই ,, — বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর'

১৮ই মার্চ — রাজকৃষ্ণ রায়ের 'লয়লামজনু'
ও অমৃতলাল বসুর 'তাজ্জব ব্যাপার'
২১এ „ — বেদৌরা
২২এ „ — চন্দ্রশেখর
২৮এ „ — বেদৌরা
২৯এ „ — চন্দ্রশেখর
৪ঠা এপ্রিল — বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'
৫ই „ — বেদৌরা
১৮ই „ — রাজসিংহ
১৯এ „ — বেদৌরা
২৫এ „ — রাজসিংহ
২৬এ „ — বিষবৃক্ষ
২ রা মে — রাজসিংহ
৩ রা „ —হরিশ্চন্দ্র
৯ই „ — রাজসিংহ

অর্দ্ধেন্দুর আগমনে স্টার ১০ই, ১৬ই আর ২৩এ মে নীলদর্পণ নামালে। ক্লাসিকও প্রতিযোগিতায় ১৬ই মে নীলদর্পণ খুললে; সেখানে গিরিশচন্দ্র উডসাহেব, দানীবাবু রোগসাহেব, অমরদত্ত নবীনমাধব আর তিনকড়ি সাবিত্রী সাজলেন।

স্টারের পরবর্তী অভিনয় প্রবাহ :—

১৭ই মে — গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'
ও অমৃতলালবসুর 'বিবাহবিভ্রাট'
২৪এ মে — ঐ
৩০এ মে — সাবিত্রী
৩১এ মে — তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সরলা'; 'তাজ্জব ব্যাপার'
৩ রা জুন — চৈতন্যলীলা ও বিবাহ বিভ্রাট
১৩ই জুন — 'গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' ও অমৃতলাল বসুর 'যাদুকরী'
১৪ই জুন — বিষবৃক্ষ
২০এ জুন — রাজসিংহ
২১এ জুন — যাদুকরী
২৪এ জুন — চৈতন্যলীলা ও বিবাহবিভ্রাট

৫ই জুলাই — মনোমোহন বসুর 'প্রণয়-পরীক্ষা' ; 'যাদুকরী'
১১ই ,, — সাবিত্রী
১২ই ,, — প্রণয়-পরীক্ষা
১৮ই ,, — সাবিত্রী
১৯এ ,, — প্রণয়-পরীক্ষা
২৫এ ,, — লয়লামজ্নু
২৬এ ,, — হরিশ্চন্দ্র
১লা অগাষ্ট — লয়লামজ্নু ও যাদুকরী
২রা ,, — চন্দ্রশেখর
৮ই ,, — সাবিত্রী
৯ই ,, — চন্দ্রশেখর

ইতিমধ্যে একটি নতুন নাটক রিহার্সালে পড়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদের 'প্রতাপাদিত্য'। অর্দ্ধেন্দুশেখরের দুটি ভূমিকা—'বিক্রমাদিত্য' ও 'রডা'।

একদিন রাত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে মন্মথমোহন বসু * 'প্রতাপাদিত্য'-র রিহার্সাল দেখতে এলেন। বিক্রমাদিত্যের চরিত্রটি ক্ষীরোদপ্রসাদ একভাবে ফুটিয়েছেন কিন্তু রিহার্সালে দেখলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর চরিত্রটিকে আর একভাবে ফুটিয়ে তুললেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের মনে হ'ল অর্দ্ধেন্দুর conception ভুল। কিন্তু প্রথম রাত্রের অভিনয় দেখে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর সাক্ষ্য—

"ক্ষীরোদবাবুর প্রতাপাদিত্য নাটকের যখন স্টার থিয়েটারে মহালা চলিতেছিল অর্দ্ধেন্দুবাবু তখন স্টার থিয়েটারে। এই নাটকখানির যাহাতে সর্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয় হয় তাহারই জন্য তিনি মহোৎসাহে শিক্ষা দিতেছিলেন। একদিন রাত্রে ক্ষীরোদবাবুর সহিত প্রতাপাদিত্য নাটকখানির মহালা দেখিবার জন্য স্টার থিয়েটারে উপস্থিত হইলাম। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাটকখানির মহালা হইল। রিহার্সাল দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম নাটকখানি জমিয়া যাইবে। রিহার্সাল শেষ হইতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। রিহার্সাল ভাঙ্গিবার পর যখন আমরা বাড়ি ফিরিতেছিলাম সেই সময় ক্ষীরোদবাবু বলিলেন, 'সমস্ত চরিত্রগুলিই আমার

* 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থের রচয়িতা। স্কটিশ চার্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, পরে স্কটিশচার্চ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন। ইনি নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর অভিনয়শিক্ষার 'হাতেখড়ির ব্যাপারে কিছুটা কৃতিত্বের অধিকারী বিবেচিত হইতে পারেন।' জীবৎকাল ১৮৬৮-১৯৫৯।

মনোমত হয়েছে, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের ভূমিকাটি খারাপ হয়ে গেল বলে আমার মনে হয়। ও ভূমিকাটি ঠিক হয় নি।

"ক্ষীরোদবাবুর এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, 'আপনি এ কথাটা কেন অর্দ্ধেন্দুবাবুকে বল্লেন না?'

ক্ষীরোদবাবু কহিলেন, 'সর্বনাশ! সাহেব তাহ'লে চটে লাল হয়ে যেতেন। ওঁর ওইটাই হলো সব চেয়ে দোষ যে কারুর কথা শোনেন না। যদি ও কথা আমি বলতেম তাহ'লে তিনি চটেমটে ও ভূমিকাটাতো ছেড়ে দিতেনই, হয়তো কোন ভূমিকারই অভিনয় করতেন না।'

"ক্ষীরোদবাবুর এ কথায় আমি কিন্তু সায় দিতে পাল্লেম না। আমি বলিলাম, 'আপনার যদি সাহস না হয় আমি ও কথাটা কাল তাঁকে বলবো।'

"পরদিন সকালে আমি অর্দ্ধেন্দুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং বক্তব্যটুকু তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'তুমি যা বল্লে ভায়া ও কথাটা যে আমি ভাবি নি—তা নয়, কিন্তু একটা ভূমিকা নিয়েই একখানা নাটক হয় না; নাটকের সব চরিত্রগুলিরই সামঞ্জস্য রাখা দরকার। বিক্রমাদিত্যের চরিত্রটা একটু লঘু না কল্লে বসন্ত রায়ের ভূমিকাটি কেমন ক'রে ফুটবে?'

"অর্দ্ধেন্দুবাবুর কথাটা আমি বেশ বুঝিলাম,—কাজেই ও সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি করিতে পারিলাম না। যথাসময়ে স্টার থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য নাটকের মহাসমারোহে অভিনয় হইল। প্রথম রাত্রেই অভিনয় দেখিবার জন্য আমি স্টার থিয়েটারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। স্বয়ং অর্দ্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্যের ভূমিকা লইয়াছিলেন। আগাগোড়া তাঁহার অভিনয় দেখিলাম, বুঝিলাম তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। আমার মনে হইল বিক্রমাদিত্যের ভূমিকাটি তিনি যে ঢঙে অভিনয় করিলেন তাহাই ঠিক। এ ভূমিকার অন্য যে কোন ঢঙে অভিনয় হইত তাহাতে ভূমিকাটির গৌরব বর্ধিত না হইয়া লঘুই হইত। অর্দ্ধেন্দুবাবুর ঈশ্বরদত্ত এমন একটি ক্ষমতা ছিল যে তিনি ভূমিকাটি একবার পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন, চরিত্রটি কি এবং ইহাতে কিরূপ রঙ দিলে তাহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইবে। যে রঙটি যে ভূমিকায় দিলে সেই ভূমিকাটি ফুটিয়া ওঠে তিনি ঠিক সেই রঙটি সেই ভূমিকায় প্রদান করিতেন। কাজেই তাঁহার অভিনয় অননুকরণীয় হইত। অর্দ্ধেন্দুশেখর যে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেরূপ শক্তিলাভ অল্প অভিনেতার ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।" (উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'অর্দ্ধেন্দু-শেখর' পুস্তিকা থেকে পুনরুদ্ধৃত)

অর্দ্ধেন্দুর 'রডা' সাজা সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"স্টারে যখন প্রতাপাদিত্যের রিহার্সাল হয়, শুনিয়াছি, রডার ভূমিকা ছোট বলিয়া কিম্বা তাহাতে উচ্চ চীৎকারের সুযোগের অভাব বুঝিয়া কোন অভিনেতাই তাহা গ্রহণ করিতে চাহে নাই। অগত্যা এক শিক্ষানবীসকে উহা দেওয়া হইয়াছিল, ড্রেস রিহার্সালের দিন অর্দ্ধেন্দুবাবু দেখিলেন যে, কে একজন রডা সাজিয়াছে,—সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র তখন রিহার্সাল মাস্টার। অর্দ্ধেন্দু তাঁহাকে বলিলেন—'হ্যাঁরে শিবু, তুমি ( শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ) বা আমি থাক্‌তে সাহেবের পার্ট আবার কাকে দিয়েছিস ? অমৃতবাবু বলিলেন—'তোমার একটা বড় পার্ট রয়েছে, আর এটা একটা ছোট পার্ট সেই জন্যেই একে দিইছি।' সাহেব বলিলেন, না আমার তো আটকায়না, ও পার্ট আমিই করবো।" ( '৺অর্দ্ধেন্দুশেখর' : 'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ ১৩২১)

ললিতচন্দ্র মিত্র লিখেছেন—

"অর্দ্ধেন্দুবাবুর সাহেব সাজা সম্বন্ধে আর একটি গল্প অমৃতবাবুর* নিকট শুনিয়াছি। যখন স্টারে 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের রিহার্সাল চলিতেছিল, অর্দ্ধেন্দুবাবু তখন 'বিক্রমাদিত্য' সাজিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। 'রডা' সাহেব সাজিবার জন্য আর একজন অভিনেতাকে শিখান হইতেছিল। অর্দ্ধেন্দুবাবু একদিনও 'রডা' সাহেব সাজিবার জন্য মহলা দেন নাই। কিন্তু যে দিন পোশাক তৈয়ার করিবার জন্য বন্দোবস্ত হয় সেইদিন তিনি বলিলেন, 'আমার জন্যে একটি সাহেবের পোশাক আবশ্যক, আমি রডা সাজব।' কর্তৃপক্ষ বলিলেন, 'একদিনও রিহার্সাল দিলে না, কি করে সাজবে ?' তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি রঙ্গমঞ্চে থাকতে অপর কেউ সাহেব সাজবে তা হ'তে পারে না, আমার নামই সাহেব।' অমৃতবাবু প্রমুখ অধ্যক্ষগণ সাহেবের ক্ষমতা বিশেষ জানিতেন, আর আপত্তি না করিয়া পোশাকের মাপ লইলেন।" ('অর্দ্ধেন্দু কথা' : 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক ১৩২৭ )

'প্রতাপাদিত্য' অভিনয়ের তারিখ নির্ধারিত হলো ১৫ই অগাস্ট, ১৯০৩। ১০ই অগাস্ট তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-য় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো—

NEW DRAMA ! NEW DRAMA !

PRATAPADITYA ! ! !

STAR THEATRE

Saturday, 15th August at 9 P.M.

The first performance of a New Historical

*অমৃতলাল বসু।

Drama by Babu Khirode Prasad Bidyabinode M.A.,
entitled
PRATAPADITYA
The Genius of Yash Hara ! !

One of the most conspicuous, out of the many benefits we have received from the English Nation is that of resuscitating for us our own history and educating the children of the soil in it. Pratapaditya and the ruins of his capital would probably have remained a myth, but for the unflagging energy and thirst for research inborn in an English mind.

Besides the historical characters necessary for the purpose of the play the author has very ingeniously imagined certain characters, the introduction of which has shed a Divine Halo on the whole drama.

The author has not also forgotten
the claims of the lovers of sweet songs.
PRATAP—Babu Amritalal Mittra.
Next day Sunday at candle light
For one night only
Bankim Babu's Historical Romance
RAJSINGHA

AMRITALAL BOSE
Manager

ভূমিকালিপি :—বিক্রমাদিত্য ও রডা—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, বসন্ত রায়—অক্ষয়কালী কোঁয়ার, প্রতাপাদিত্য—অমৃতলাল মিত্র, গোবিন্দদাস—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া—নরীসুন্দরী, গয়লাবৌ—ক্ষেত্রমণি, ইত্যাদি।

বাংলা সাধারণ নাট্যশালার অন্যতম সংগঠক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র স্বনামধন্য সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিনকার অভিনয়ের একজন দর্শক ছিলেন এবং অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় সেই প্রথম দেখছেন। সৌরীন্দ্রমোহন ঐ অভিনয়ের স্মৃতিতে লিখেছেন :

"দেখলুম তাঁকে…প্রতাপ-আদিত্যের পিতা রাজা বিক্রম-আদিত্যের ভূমিকায়। বিক্রম-আদিত্য চিন্তাকুল…বসন্ত রায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে। তিনি

চিন্তাকুলভাবে এ-কথা বলেন, বসন্ত রায় বুঝিয়ে দেন তাঁর ভুল। বিক্রম-আদিত্য তখন সে-কথা ছেড়ে দেন…হাতের পাখা ঘন ঘন নাড়তে থাকেন…তারপর গোবিন্দদাস এলেন…গোবিন্দদাস গান শুরু করলেন…বিক্রম-আদিত্য বৈষ্ণব… গোবিন্দদাস পদাবলী গাইতে শুরু করলেন। গোবিন্দদাস গাইলেন—

তাতলসৈকতে বারিবিন্দুসম
স্নুতমিত রমণী সমাজে—

বিক্রম-আদিত্য গান শুনছেন…কিন্তু ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে…গানে তাঁর মন নেই…তিনি পুত্র প্রতাপ-আদিত্যের জন্য চিন্তায় কাতর—প্রতাপ গোঁয়ার হয়ে উঠছেন। মোগল হলো দেশের সম্রাট…সেই মোগলকে প্রতাপ মানে না! কি যে হবে—এ চিন্তায় তিনি আকুল। এবং গানের অর্থও তিনি করলেন ঐ পুত্রের বেপরোয়াভাবের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে।

"এমন সময়ে সামনে ঝুপ করে পড়লো বাণে-বেঁধা বাজ-পাখী। গোবিন্দদাস জীব-হত্যা দেখে শিউরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন…বিক্রম-আদিত্য তটস্থ… ভয়ে যেমন কাঁটা, রাগে তেমনি আগুন। তিনি বললেন—কে এমন পাপ কাজ করলে? সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন প্রতাপ-আদিত্য…বিজয়ীর ভঙ্গীতে। প্রতাপ বললেন—আমি করেছি পিতা। তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কর চক্রবর্তীর প্রবেশ। শঙ্কর বললেন—মিথ্যা কথা! এ-পাখী মেরেছি আমি, মহারাজ…পাখীর দেহে আমার বাণ! তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়িনীর মূর্তিতে বিজয়ার প্রবেশ। বিজয়া বললেন—আমি এ-পাখীকে বাণবিদ্ধ করেছি!

"নাটকের সিচুয়েশনে ক্লাইমাক্স…এ ক্লাইমাক্সে বিক্রম-আদিত্যের অভিনয় যা দেখেছিলুম…তা তুলনাহীন। তিনি রাজা…বসন্তরায় তাঁর একান্ত অনুগত… প্রতাপ যা করেন, বসন্ত রায় তার তারিফ করেন…অথচ বসন্ত রায় বিক্রমাদিত্যের কাছে পুত্রের চেয়েও প্রিয়তর। জ্যোতিষী বলেছে গণনা করে…প্রতাপ পিতৃঘাতী হবেন। একথা বিক্রমাদিত্যের বুকে কাঁটার মতো ফুটে আছে।

"বিক্রমাদিত্যের ভূমিকা হালকা করে তিনি দেখিয়েছিলেন—তার কারণ, তিনি বলেছিলেন—তা না করলে বসন্ত রায়ের চরিত্র মাটি হয়ে যেত। প্রতাপের নির্ভীক বেপরোয়া ভাব দেখে বিক্রমাদিত্য এমন চিন্তাকুল…প্রতাপ কি একটা করে বসবেন! বসন্ত রায় তাঁকে বোঝান—না, না, প্রতাপ বীর, প্রতাপ সুপুত্র! তাঁর সম্বন্ধে বিক্রমাদিত্যের এ-সংশয় সম্পূর্ণ অমূলক। এইসব ব্যাপার—অর্দ্ধেন্দু-শেখরের অভিনয় নিমেষে দর্শকের মনে রেখাপাত করেছিল—সেইসঙ্গে তাঁর অভিনয়ে এটুকুও চমৎকার উপলব্ধি হয়েছিল, বসন্ত রায়ের উপর তাঁর স্নেহ এত

বেশি যে বসন্তর নিরাপত্তার জন্য তিনি প্রতাপকে ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র কাতর নন। অভিনয়ের ভঙ্গীদ্বারা নাটকের পাত্রের চরিত্র সম্বন্ধে এমন আভাস-ব্যঞ্জনা আনতে কজন অভিনেতা পারেন?

"এরপর তিনি পোর্তুগীজ বোম্বেটে 'রডা'র ভূমিকায় নামলেন···তখন তাঁর সে চেহারা হাবভাব ভঙ্গী দেখে কে বলবে, এ সেই ব্যক্তি, যিনি বিক্রমাদিত্য সেজেছিলেন! রডার বেপরোয়াভাব দুচারটি কথায় এবং হাবেভাবে কি চমৎকার না ফুটেছিল। ধরা পড়ে বিক্রমাদিত্যের সভায় আনা হলে রডার ভাষা না বুঝতে পেরে মদন, না কোন্ অনুচর তাঁকে হনুমান বলে তামাশা করে সুর ভেঁজেছিল। সে সুর শুনে রডা হেলেদুলে যে নৃত্য করেছিলেন···তা শুধু চমৎকার বললে সব কথা বলা হবে না। সে নাচে রডার বেপরোয়াভাব পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল। তারপর রডাকে মার্জনা করা হলো; তখন মাথার টুপি রাজার পায়ের কাছে রেখে রডার সেই কথা—রাজা, তুমি আমার বাপ, বাঙালী আমার ভাই···দর্শকের চোখগুলোকে শুধু সজল করেনি···দর্শক তাতে মুগ্ধ হয়েছিল। তারপর প্রতাপের যখন পরাজয় হলো, তখন দুচোখে হাত চেপে রডা গদ গদ কণ্ঠে বলেছিলেন— কি করবে রাজা, তোমার লোক চাকসিরি দিয়ে দুশমনকে এনেছে! এবং তারপর দুচোখে জল······চোখে হাত রেখে রডার সেই উক্তি—কুছু করতে পারলে না রাজা···ভেরি স্যরি! সে কণ্ঠ আজো ভুলিনি।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর': 'সচিত্র শিশির', চৈত্র ১৩৬৩)

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

"অর্দ্ধেন্দুবাবু রডা সাজিলেন, সহস্র সহস্র দর্শক প্রতাপাদিত্যের অন্যান্য অভিনেতার অভিনয় ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু রডার সেই একটি কথা 'ভেরি সরি রাজা' কেহ ভুলিবেন না। আমার বিশ্বাস যিনি একবার তাহা শুনিয়াছেন, বার্ধক্যের ক্ষীণ স্মৃতি আশ্রয় করিয়াও সেই মর্মভেদী করুণ স্বর তাঁহার কর্ণে চিরদিন ঝঙ্কার করিবে।" (৺'অর্দ্ধেন্দুশেখর': 'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ ১৩২১)

ললিতচন্দ্র মিত্র লিখেছেন:

"সাহেব' সাহেবের ভূমিকায় যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা সে অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহা ভুলিতে পারিবেন না। এই ক্ষুদ্র চিত্রেও তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়াছিলেন···তাঁহার বিক্রমাদিত্যের অভিনয়ও অতুলনীয় হইয়াছিল এবং সকলেই তাঁহার ক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।" ('অর্দ্ধেন্দু কথা': 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক, ১৩২৭)

হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন :

"প্রতাপাদিত্য নাটকে রডার ভূমিকাটি আগে আরো ছোট ছিল। পালাটি যখন খোলা হয়, তখন কোন নামজাদা নটই ঐ ভূমিকাটি গ্রহণ করতে রাজি হননি। অবশেষে রডা সেজে দেখা দিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর নিজেই। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকাটি এমন প্রধান হয়ে উঠল যে, তারপর থেকে সেরা সেরা অভিনেতারা ঐ ভূমিকাটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতেন এবং রডার লোকপ্রিয়তা দেখে নাট্যকারও ভূমিকার আকার আরও বাড়িয়ে দিলেন।...সাহেব সেজে তিনি এমন নিখুঁত অভিনয় করতে পারতেন যে, তাঁকে বাঙালী বলে চেনবার উপায় থাকতো না। এইজন্যে নাট্যজগতে তাঁর ডাকনাম ছিল 'সাহেব'। আমাদের নাট্যজগতে আর যেসব নট য়ুরোপীয়দের ভূমিকা গ্রহণ করেন, সাধারণতঃ অতি-অভিনয়ের জন্যে ভূমিকাগুলি পরিণত হয় 'ক্যারিকেচারে'। এ দোষ তাঁর অভিনয়ে কখনো দেখা যেত না" ('যাঁদের দেখেছি,' পৃ. ৮২-৮৫)

'বিক্রমাদিত্য' সম্বন্ধে শিশিরকুমার ভাদুড়ী রায় দিয়ে গেছেন :

"ক্যারেক্টার অ্যাক্‌টিং-এও অর্দ্ধেন্দুবাবুর জুড়ি ছিল না, আজও নেই। সেদিক থেকে তিনি গিরিশবাবুর থেকেও বড় ছিলেন। একসঙ্গে একাধিক ভূমিকায় রূপ, কণ্ঠ, ম্যানারিজম্ বদলিয়ে যখন অভিনয় করে যেতেন, তখন ধরার উপায় থাকতো না যে একই লোক—সেই অর্দ্ধেন্দুশেখর। এই ধর না—ঐ দীর্ঘ দেহধারী যিনি টাই-স্যুট পরিহিত সোজা হেঁটে বীরদর্পে বাংলা...দোকানে গেলেন, তিনিই যে একটু আগে আশি বছরের বৃদ্ধ বিক্রমাদিত্য সেজে হাঁপানী রুগীর মতো হাতে পাখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে স্টেজে এসেছিলেন এ চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। তখন হয়তো তাঁর বয়স ৫০।৫৫। নিন্দুকেরা বলেন, তাঁর সত্যিকারের হাঁপানী ছিল—কিন্তু আমি হলপ ক'রে বলতে পারি : বিক্রমাদিত্যের সে হাঁপানী তাঁর ক্রিয়েশান, ক্রিয়েশান, ক্রিয়েশান।" (শ্রীসমীর লাহিড়ী লিখিত 'আমাদের নাট্যাচার্য' শীর্ষক প্রবন্ধ : 'নতুন খবর', ১১ জুলাই, ১৯৫৯)

'রডা' সম্বন্ধে শিশিরকুমারের সাক্ষ্য :

"রডার পোশাক ছিল হাস্যকর। টকটকে লাল কোট আর প্যান্ট, তার ওপর একটা অ্যাডমিরালের টুপি। কিন্তু উনি যখন কথা বলতে আরম্ভ করতেন, তখন পোশাকের কথা মনে থাকত না কারও।" (রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু প্রণীত 'শিশির সান্নিধ্যে'—পৃ. ৮২)

অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় সম্বন্ধে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'রঙ্গালয়'-এর (২৩এ অগাস্ট, ১৯০৩) মন্তব্য :

"বিক্রমাদিত্য ও রডার অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। অভিনেতা স্বয়ং বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।"

স্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটারে হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষ বীর বা প্রতাপাদিত্য' উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে ২৯এ অগাস্ট 'প্রতাপাদিত্য' খোলেন। 'রঙ্গালয়' পত্রিকায় (৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৩) দুই থিয়েটারের 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয়ের একটি তুলনাত্মক সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তার এক স্থলে স্টারের 'রডা' ও 'গয়লা বৌ' সম্বন্ধে সমালোচক মন্তব্য করলেন :

"স্টারের রডা সাহেবীয়ানা হিসাবে অতুলনীয়। তবে রডাকে পর্তুগীজ বলিয়া ধরিলে কোন থিয়েটারেই রডার অংশ ঠিক হয় নাই। উভয় স্থানেই ইংরেজ ফিরিঙ্গী ছবি দেখিলাম। পর্তুগীজ দেখিলাম না, ইংরেজি কথা, ইংরেজি স্বর, ইংরেজি উচ্চারণের আড় দেখিলাম।* প্রতাপাদিত্যের রডা ইংরেজি শিখিল কোন্ স্কুলে পড়িয়া? তবে ইংরেজি সাজের ও ভঙ্গীর যদি প্রশংসা করিতে হয় তো, স্টারের রডা বহুরূপী, অতি সুন্দর হইয়াছিল।...স্টারের গয়লা বৌ অনুপম; আর কোন রঙ্গমঞ্চে এমন পাকা অভিনেত্রী নাই।"

ক্ষেত্রমণির 'গয়লাবৌ' সম্বন্ধে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মন্তব্য :

"ক্ষেত্রমণি—ইতিহাসে তার নাম নেই; কিন্তু অমন গয়লা বৌ— অমন ক'রে 'বুক জ্বলে যায়' বলা আর দেখি নি।" (রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু প্রণীত 'শিশির সান্নিধ্যে'—পৃ. ৩২-৩৩)

অর্দ্ধেন্দুর একক কৃতিত্বে পড়তি স্টার আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। প্রতি অভিনয় রাত্রেই দর্শক ভেঙে পড়তে লাগল। স্টার প্রচুর অর্থ আমানত করতে লাগল।

* ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে নব নাট্যমন্দিরে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে রডার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সে সময়ে শিশিরকুমার রডার মুখে দিয়েছিলেন চট্টগ্রামী উপভাষা। "কারণ জলপথে সে ঐখানেই প্রথম আসে ও ধরা পড়ে। রডা দিল্লী আগ্রায় যায়নি এবং সেহেতু হিন্দী ভাষা তার ছিল অজ্ঞাত। ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, রডা চট্টগ্রামী উপভাষাতেই কথা কয়েছে। পর্তুগীজ ভাষায় নয়, ইংরেজি বুকনি ও হিন্দীর জগাখিচুড়িতেও নয়।... রডা সেজে শিশিরকুমার—'এই, এ কে আছে?' উচ্চারণ না ক'রে বলেছিলেন—'হেই, ইবা কন?'...তারপর 'কোদে তুন'=কোথা থেকে, 'তু ইন্দি আ'=তুই এখানে আয় এবং আছিল=ছিল, ধরিল=ধরলো. করিগ্যি=করেছি, কইরলাম=করলাম, এঁড়=রাখ, ঠ্যাঙ্গ=পা, ত=সে (পুং), আসতক=এস, ইন্দি=এখানে প্রভৃতি চট্টগ্রামী ভাষার টুকিটাকি শব্দসংযোগে সংলাপ রচনা করে নিয়ে পরীক্ষায় রত হয়েছিলেন শিশিরকুমার।" (শ্রীসুললিত গোস্বামীর 'ঘটনা ও রটনার বার্তাবরণে মহান্ শিল্পী শিশিরকুমার' শীর্ষক প্রবন্ধ : 'রবিবারের বসুমতী সাময়িকী,' ৪ঠা জুন, ১৯৭২)

স্টারের পরবর্তী অভিনয়সমূহের তালিকা :—

| | | |
|---|---|---|
| ২২শে | অগাস্ট | প্রতাপাদিত্য |
| ২৯শে | ,, | ঐ |
| ৩০শে | ,, | নীলদর্পণ ও যাদুকরী |
| ৪ঠা | সেপ্টেম্বর | প্রতাপাদিত্য |
| ১২ই | ,, | ঐ |
| ১৩ই | ,, | বিষবৃক্ষ |
| ১৯শে | ,, | প্রতাপাদিত্য |
| ২০শে | ,, | চন্দ্রশেখর |
| ২৬শে | ,, | প্রতাপাদিত্য |
| ২৭শে | ,, | প্রণয়-পরীক্ষা ও যাদুকরী |
| ১০ই | অক্টোবর | প্রতাপাদিত্য |
| ১১ই | ,, | প্রণয়-পরীক্ষা ও যাদুকরী |
| ১৭ই | ,, | প্রতাপাদিত্য |
| ১৮ই | ,, | ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সপ্তম প্রতিমা' |
| ৩১শে | ,, | প্রতাপাদিত্য |
| ১লা | নভেম্বর | হরিশ্চন্দ্র ও রাজাবাহাদুর ( অমৃতলাল বসুর ) |
| ৭ই | ,, | প্রতাপাদিত্য |
| ৮ই | ,, | নীলদর্পণ ও অমৃতলাল বসুর 'অবতার' |
| ১৪ই | ,, | প্রতাপাদিত্য |
| ১৫ই | ,, | রাজসিংহ |
| ২১শে | ,, | প্রতাপাদিত্য |
| ২২শে | ,, | সরলা ও রাজাবাহাদুর |
| ২৮শে | ,, | প্রতাপাদিত্য |
| ২৯শে | ,, | চন্দ্রশেখর |

থেকে জানা যায়, ২রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত স্টার মঞ্চে অভিনয় বন্ধ ছিল।

STAR THEATRE

Prayer for leave of absence

Owing to a tolerably long engagement

graciously offered by one of our oldest
admiring patrons Rai Budh Singh
Doodhuria Bahadur of Azimgunze, and
gratefully accepted by us, we are obliged
to ask in this high tide of
Calcutta season, and when our
City-Audience are as liberal towards us,
leave of absence for about (2) two weeks.
The performance on our Calcutta Stage
will be suspended from the 2nd of
December to the 16th of December.

A. L. Bose.

আজিমগঞ্জ থেকে ফিরে এসে স্টার ১৯এ ডিসেম্বর 'প্রতাপাদিত্য' নামালো। ২৫এ ও ৩০এ ডিসেম্বর যথাক্রমে ক্ষীরোদপ্রসাদের নতুন অপেরা 'বৃন্দাবন বিলাস' ও রাজকৃষ্ণ রায়ের অপেরা 'বেনুজীর-বদ্রেমুনীর' মঞ্চস্থ হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-য় প্রকাশিত (৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৩) নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য :—

Holiday-Week Entertainments !
STAR THEATRE
Wednesday, 30th Dec, at 9 p. m.
The Beautiful Fairy Opera
BENUJIR-BUDRAMUNIR
Followed by the Wonderful
PULFRAGRAPH
The Honey-Moon—Sham Rock after the accident—
Artillery crossing the River—The Magic Table—
Twelve in a Barrel. The Indiscreet Lady-Horses
Bathing—The Enchanted Wardrobe—What is seen
through a Key-Hole, etc, etc, etc,
To Crown All
Gulliver in the Lands of Lilliput and Brobdingnag
To Finish with the Sight of Sights
A Trip to the Moon

AMRITALAL BOSE
MANAGER

১৯০৪। অর্দ্ধেন্দু স্টারেই আছেন। এদিকে আবার তিনি অবৈতনিক ইলিসিয়াম থিয়েটারের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। নড়ালের জমিদার জিতেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ রায় বহু অর্থব্যয়ে এই শখের থিয়েটারটি গড়ে তুলেছিলেন। সেকালে শখের থিয়েটার হিসেবে এই ইলিসিয়ামের যথেষ্ট সুনাম ছিল। প্রধানতঃ সাধারণ নাট্যশালার নামজাদা নট-নটী নিয়েই এই দল সংগঠিত হয়েছিল। বৈকুণ্ঠনাথ বসুর পুত্র জানকীনাথ বসু এই নাট্যসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ আর অর্দ্ধেন্দুশেখর শিক্ষক ছিলেন। প্রতি বৎসর পূজোর সময় এই দল নড়ালে গিয়ে অভিনয় করত। প্রসিদ্ধ অভিনেতা নীলমাধব চক্রবর্তীও কোন কোন বার এখানে অভিনয় করতেন। আর একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছি। তিনি তখন এই ইলিসিয়াম থিয়েটারে। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে নড়ালে চন্দ্রশেখর ও কপালকুণ্ডলা মঞ্চস্থ করার আয়োজন হয়েছে। অপরেশচন্দ্র চন্দ্রশেখর ও নবকুমারের ভূমিকায় রিহার্সাল দিচ্ছেন। এই সূত্রে এইখানেই অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর সমস্ত দিন ইলিসিয়ামে সমান যত্নে অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলকে শিক্ষা দিয়ে রাত্রে স্টারে চলে যেতেন। ( দ্রঃ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—পৃ. ৫৫-৫৬ )

এদিকে 'প্রতাপাদিত্য'-র পর স্টার ঝিমিয়ে পড়ল। অর্দ্ধেন্দুশেখর সেপ্টেম্বর মাসে স্টার ছেড়ে মিনার্ভায় চলে গেলেন।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## পুনরায় মিনার্ভা থিয়েটারে ( ১৯০৪-০৮ )

মিনার্ভার সে-গৌরবের দিন আর নেই। গিরিশচন্দ্রের বিদায়গ্রহণের পর থেকেই তার দুর্দিনের সূত্রপাত হয়। এর জন্যে একমাত্র নাগেন্দ্রবাবুই দায়ী। মিনার্ভার আয় যত বাড়ছিল নাগেনবাবুর কাপ্তেনীর মাত্রাও তত বাড়ছিল। ত'বিল থেকে তাঁর দুমুঠো টাকা নেওয়ার গল্প সেকালে থিয়েটারজগতে বিখ্যাত ছিল। খরচের বহর দেখে গিরিশচন্দ্র শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এইরকম উচ্ছৃঙ্খলতা আর যথেচ্ছাচার যদি বেশি দিন চলে তাহ'লে থিয়েটারে-যে লালবাতি জ্বলবে তা তিনি স্পষ্ট বুঝলেন। গিরিশচন্দ্র আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। তিনি নাগেনবাবুকে বললেন, 'থিয়েটারের আয়ব্যয়ের হিসেবপত্র আমি নিজের হাতে রাখতে চাই। যে রকম ব্যয় হচ্ছে আমি দেখছি, তাতে থিয়েটার কিছুতেই চলতে পারে না।'

গিরিশচন্দ্রের কথার উত্তরে অপরিণামদর্শী নাগেনবাবু তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে বললেন, 'আয় ব্যয় কিংবা হিসেবপত্র দেখবার জন্যে তো আপনাকে রাখা হয় নি। আপনাকে যে কাজের জন্যে রাখা হয়েছে আপনি সেইটুকু করবেন।'

গিরিশচন্দ্র আর বাক্যব্যয় না ক'রে সেইদিন থেকেই মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করলেন। স্টার গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় সাদরে বরণ করে নিল ( ১৮৯৬ খ্রীঃ )।

মিনার্ভার দুর্দশা শুরু হলো। পাওনাদারের তাড়নায় নাগেনবাবু মিনার্ভা বন্ধক রাখলেন, তারপর বন্ধকী থিয়েটারের আট আনা অংশ প্রমথনাথ দাসকে বেচে দিলেন। অবশেষে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ৩১এ মার্চ তারিখে থিয়েটার নিলামে উঠল; খরিদ করলেন খুলনার উকিল বেণীমাধব রায়। শ্রীপুরের নাবালক জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকারের এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন এই বেণীবাবু এবং তাঁর ভাই অতুলবাবু ছিলেন সহকারী। সাবালকত্ব প্রাপ্ত হলে নরেনবাবু এঁদের কাছ থেকে উচ্চ মূল্য দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার কিনে নেন। নরেনবাবু গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে কিছুকাল থিয়েটার চালালেন; তারপর তিনিও জাল গুটোলেন। পরবর্তী স্বত্বাধিকারী প্রিয়নাথ দাস। কিন্তু মিনার্ভা তখন রিসিভারের হাতে। ১৯০৩-এর ১০ই মে তারিখ থেকে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রিয়বাবুর কাছ থেকে মাসিক পাঁচশো টাকা ভাড়ায় তিন বছরের জন্যে মিনার্ভা লিজ্ নিয়ে একসঙ্গে মিনার্ভা ও ক্লাসিক চালাতে লাগলেন। ১৯০৪-এর মার্চ মাসে অমরেন্দ্রনাথ চুনিলাল দেবকে মিনার্ভা

ছেড়ে দিলেন। সর্ত রইলো চুনিবাবু বাড়িভাড়া বাবদ পাঁচশো টাকা মাস মাস বাড়িওয়ালাকে মিটিয়ে দেবেন। লেসি কিন্তু অমরেন্দ্রনাথই রইলেন। কিন্তু চুনিবাবু ভাড়া বাকি ফেলতে লাগলেন। বাড়িওয়ালার তাগাদার জ্বালায় অমর দত্ত অস্থির হয়ে উঠলেন। ২৭এ জুলাই অমর দত্ত মিনার্ভার বাকি দু'বছরের লিজ্ মনোমোহন পাঁড়েকে হস্তান্তর করলেন। চুনিবাবু আবার পাঁড়ে মশায়ের কাছ থেকে মাসিক সাড়ে সাতশো টাকায় মিনার্ভা ভাড়া নিলেন। এখন লেসি মনোমোহন পাঁড়ে। হাইকোর্টের উকিল মহেন্দ্রকুমার মিত্র, এম. এ., বি. এল., পাঁড়ে মশায়ের legal adviser অর্থাৎ আইন-আদালতের ব্যাপারে পরামর্শদাতা হলেন। ১৯০৪-এর শেষের দিকে মিনার্ভা মফঃস্বলে বায়নায় যায়। ১৯০৫-এর জানুয়ারিতে মালদহে সামান্য এক খিলি পান নিয়ে চুনিবাবুর সঙ্গে মনোমোহনবাবুর মনান্তর হয়। মালদহ থেকে ফিরে এসে চুনিবাবু মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করেন। মনোমোহনবাবু এখন মিনার্ভার একমাত্র স্বত্বাধিকারী। শুধু মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পাঁড়ে মশায়ের মৌখিক চুক্তি এই হ'ল যে, তিনি working partner হিসেবে লাভের এক-তৃতীয়াংশ বখরা পাবেন। চুনিবাবুর প্রস্থানের পর অপরেশবাবু ১৯০৫-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি থেকে ( ৩রা ফাল্গুন, ১৩১১ ) মিনার্ভার ম্যানেজার হলেন।

আগেই বলা হয়েছে অর্দ্ধেন্দুশেখর ১৯০৪-এর সেপ্টেম্বরে স্টার থেকে মিনার্ভায় এসেছেন। তখন কিন্তু চুনিবাবু মিনার্ভা চালাচ্ছেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভায় যোগ দেবার পর মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার' নাটকে নব খুড়ো আর দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এ উডসাহেব ও তোরাপের ভূমিকায় নামলেন। অর্দ্ধেন্দুর এখানকার অভিনয় সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য উদ্ধার করা যাক। তিনি লিখেছেন :

"সংসার অভিনীত হচ্ছিল। নাটকে চা-বাগানের চা-কর সাহেবের অত্যাচার নীলদর্পণের নকলে প্রদর্শিত হয়েছে—এ ব্যাপারের সঙ্গে এক গৃহস্থ-ঘরের কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। নাটকের কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভায় যোগ দেবার পর তিনি নামলেন এ-নাটকে নব খুড়োর ভূমিকায়। তাঁর অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এ-নাটকের অভিনয় এমন জমলো যে সংসার অভিনয় ক'রে মিনার্ভা বহু অর্থসংগ্রহে সমর্থ হয়েছিল। নবখুড়োর অভিনয় এ নাটকে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। তাঁর অভিনয় দেখবার জন্য আমিও গিয়েছিলুম এবং দেখে পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলুম। আশ্চর্য হয়েছিলুম এ-চরিত্রের অপরূপ অভিব্যক্তি দেখে। তখন তাঁর অনেক বয়স তবু চরিত্রচিত্রণে তরুণ বয়সের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা কত তা বুঝেছিলুম···এ চরিত্রটিকে বিশিষ্ট রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলার সার্থকতায়। তাঁর

অভিনয় যখনি দেখেছি তখনি মনে হয়েছে, অর্দ্ধেন্দুশেখরকে দেখছি না…নাট্যোক্ত মানুষটিকে জীবন্ত দেখছি। এ-কথা গিরিশচন্দ্র এবং আর দু-চারজন সেকালের নাট্যরথীদের সম্বন্ধেই শুধু বলতে পারি ; এবং আমার মত বলছি, এ-যুগে নামজাদা নটসূর্যদের অভিনয়ে তাঁদের মজ্জাগত ত্রুটি মুদ্রাদোষ যেমন সব অভিনয়ে ফুটে ওঠে, গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর তেমন কোন ত্রুটি আমি অন্ততঃ কখনো লক্ষ্য করি নি। ( 'অর্দ্ধেন্দুশেখর' : 'সচিত্র শিশির,' চৈত্র ১৩৬৩ )

উড্সাহেব ও তোরাপের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন :

"উডসাহেবের ভূমিকায় তাঁর সেই কথা—তোম শালা নালায়েক আছে…বলে, আমিনকে বুটের ঠোক্কর মারা এবং তোরাপের ভূমিকায় ট্যাক থেকে সাহেবের কাটা কর্ণাগ্র বার করে উক্তি—হালার কানের খানিকডা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছি …গায়ে রোমাঞ্চরেখা ফুটেছিল। এমন জীবন্ত তোরাপ—নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় আরো অনেকবার দেখেছি…কিন্তু এ তোরাপ আর কোথাও দেখি নি।" ( তদেব )

অতঃপর অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতায় মনোমোহন রায়ের 'ঐন্দ্রিলা' ৫ই নভেম্বর তারিখে মঞ্চস্থ হলো। মিনার্ভা সম্প্রদায় বড় আশা করে এই নতুন নাটকটির প্রযোজনায় প্রায় চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট সব নতুন করে তৈরি করানো হয়েছিল। নাম-ভূমিকায় ছিলেন তারাসুন্দরী আর অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন তারকনাথ পালিত, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মন্মথনাথ পাল ( হাঁদুবাবু ), মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল ( মণ্টুবাবু ), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উঠ্‌তি অভিনেতারা। চুনিবাবু সেজেছিলেন 'বৃত্র'। কিন্তু ঐন্দ্রিলা জমলো না। প্রথমরাত্রের বিক্রি মাত্র দু'শো আশি টাকা।

টাল সামলানোর জন্যে অর্দ্ধেন্দুশেখর 'প্রতাপাদিত্য' খোলবার পরামর্শ দিলেন। খুব ধুমধাম ক'রে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ( ২৫এ অগ্রহায়ণ, ১৩১১ ) মিনার্ভায় 'প্রতাপাদিত্য' খোলা হ'ল। প্রথম রজনীর অভিনেতৃবৃন্দঃ—বিক্রমাদিত্য ও রডা—অর্দ্ধেন্দুশেখর, প্রতাপ—চুনিলাল দেব, বসন্তরায়—তারকপালিত, গোবিন্দরায়—ক্ষেত্তা মিত্তির, গোবিন্দদাস—মোহিত মোহন গোস্বামী, ভবানন্দ—হাঁদুবাবু, সুন্দর—মণ্টুবাবু, শঙ্কর—অপরেশবাবু, কল্যাণী—তারাসুন্দরী, বিজয়া—কিরণময়ী পরে সুশীলাসুন্দরী, ছোটরানী—সরোজিনী, ইত্যাদি।

অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর স্টারের ধারা মিনার্ভায় কিছু কিছু পরিবর্তন করে

দিয়েছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, যে-দৃশ্যে কল্যাণীকে মুসলমান আততায়ীরা অপহরণ করতে আসে, সেই দৃশ্যে প্রতাপ কল্যাণীকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করলে, স্টারের কল্যাণী পটক্ষেপ না হওয়া পর্যন্ত সজ্ঞানে দাঁড়িয়ে থাকত। মিনার্ভার কল্যাণীকে অর্দ্ধেন্দু শিখিয়েছিলেন, উদ্ধারের পর অচেতন হয়ে পড়ে যেতে, সেই অচৈতন্য অবস্থায় শঙ্কর তাকে ধরে ফেলবে। এতে দর্শকদের মধ্যে প্রথম প্রথম হাসাহাসি হতো। প্রথম রাত্রের অভিনয়ের পর তারাসুন্দরী অর্দ্ধেন্দুশেখরকে বলেছিলেন, 'সাহেব, এ ত নিলে না, লোকে যে হেসে উঠল ?' অর্দ্ধেন্দু তারার পিঠ চাপড়িয়ে বলেছিলেন, 'কোন ভয় নেই, ক্রমশঃ নিতে শিখবে।' অর্দ্ধেন্দুর কথাই সত্য হয়েছিল। ( দ্রঃ 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর,' পৃ. ৭৩ )

প্রতাপাদিত্যের প্রতিযোগিতায় মিনার্ভায় প্রথম রাত্রের বিক্রি মাত্র দুশো সাতাশ টাকা হলেও ক্রমশঃ হাজারের ওপর উঠেছিল। প্রতাপাদিত্য খোলবার কিছু আগে চুনিবাবু গিরিশচন্দ্রকে ক্লাসিক থেকে ভাঙিয়ে মিনার্ভায় নিয়ে এলেন।

গিরিশচন্দ্র এবার ক্লাসিকে একটানা অনেকদিন ছিলেন—১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৪এ নভেম্বর থেকে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত। আসবার সময়ে গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলার পাণ্ডুলিপি ও নাট্যরূপায়িত দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে এলেন। ( দ্রঃ রমাপতি দত্ত প্রণীত 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ,' পৃ. ৩৭৯)

অপরেশচন্দ্র লিখছেন :

"মিনার্ভায় এই যে গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর মিলন, উত্তরকালে ইহাই মিনার্ভার সমৃদ্ধির নানাকারণের মধ্যে একটা বিশেষ কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই প্রতিভার একত্র মিলন বহুবার হইয়াছে, কিন্তু বহুদিন ধরিয়া ইহাদের একস্থানে অবস্থান বাঙ্গালা নাট্যশালায় আর কোনদিন হয় নাই।…মাঘ মাসে অর্দ্ধেন্দুশেখরের একখানি নূতন প্রহসন খোলা হয়—'ভগবান ভূত'।* সাহেবের বই লেখা, অনেকে জানেন—এই বোধহয় প্রথম, এই বোধহয় শেষ ; কিন্তু আমরা জানি, ইহার পূর্বেও তিনি একখানি বই লিখিয়াছিলেন—'দুর্গাপূজার পঞ্চরং' ; উহা এমারেল্ডে অভিনীত হয়। 'ভগবান ভূত' মাত্র একরাত্রি অভিনীত হইয়াছিল।"

অতঃপর মিনার্ভা থিয়েটারে ১৩১১ সালের ২০এ ফাল্গুন ( ৪ঠা মার্চ, ১৯০৫ ) শিবরাত্রির দিন গিরিশচন্দ্রের 'হর-গৌরী' খোলা হয়। প্রথম রাত্রে তারকপালিত

* কিন্তু হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 'ভগবান ভূত'-এর অভিনয় তারিখ উল্লেখ করেছেন ২৫এ ডিসেম্বর, ১৯০৪। দ্রঃ 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (১৫২৫-১৯৪৫), পৃ. ৬২।

'হর'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন ; দ্বিতীয় রাত্রি থেকে গিরিশচন্দ্র। অর্দ্ধেন্দুশেখর সাজেন 'নন্দী' আর তারাসুন্দরী 'গৌরী'। এর পঁয়ত্রিশ দিন পরে 'বলিদান' খোলা হ'ল। এই বলিদান থেকেই মিনার্ভার সৌভাগ্যোদয়।

'বলিদান'-এর প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৮ই এপ্রিল, ১৯০৫। ভূমিকালিপি :— করুণাময়—গিরিশচন্দ্র, রূপচাঁদ—অর্দ্ধেন্দুশেখর, দুলালচাঁদ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), কিশোর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মোহিত—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, ঘনশ্যাম—মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু), রমানাথ পাল—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), কালীঘটক—জীবনকৃষ্ণ পাল, সরস্বতী—তারাসুন্দরী, জোবী—সুশীলাসুন্দরী, যশোমতী—সরোজিনী, রাজলক্ষ্মী—নগেন্দ্রবালা, কিরণময়ী—কিরণবালা, হিরণ্ময়ী—চারুবালা, ঝি—চপলাসুন্দরী, ইত্যাদি।

'বলিদান'-এর সামগ্রিক অভিনয় সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন :

"...ভাবাভিনয়ে, গার্হস্থ্য জীবনের সরল সহজ ও স্বচ্ছন্দ ঘাত-প্রতিঘাত সমন্বিত নাটকের অভিব্যক্তিতে এই প্রবীণ ও অধিকাংশ নবীন কর্মীর দল যে শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই অনন্যসাধারণ ; এবং প্রথম-বারের বলিদানের সে অভিনয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সত্যই একটা স্মরণীয় ব্যাপার। বড় বড় ভূমিকার কথা ছাড়িয়া দিলেও সামান্য একটা পানবিড়িওয়ালার ভূমিকায় একটি ছোট অভিনেতা যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, তাহাও আজিকার দিনে বড় বড় থিয়েটারেও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। বলিদানের একটা ঝি, একজন মুদী, একটা সামান্য শালওয়ালা, কি দু'টো বওয়াটে ছেলের সে নিখুঁত অভিনয়ের অনুকরণ করিতে কয়জন পারেন তাহা জানি না। সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে (details) ও অতি ছোটখাটো ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের দৃষ্টি ছিল সর্বদা সজাগ ও তীক্ষ্ণ। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষাদান বাঙ্গলা নাট্যশালার এক অক্ষুণ্ণ গৌরবের অধ্যায়।" ('রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর', পৃ. ৭৯)

'করুণাময়'-এর ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছিলেন—

"স্যার হেন্‌রি আর্ভিংকে দেখেছি, গিরিশবাবুর অভিনয় তাঁর চেয়েও অদ্ভুত। সামাজিক নাটকে এবং বস্তুতন্ত্র-বিষয়ীভূত ব্যাপারে স্যার হেন্‌রি গিরিশচন্দ্রের ন্যায় কিছুতেই পারতেন না।...যেখানে আত্মহত্যায় উদ্যত করুণাময় শূন্যে হাত বাড়িয়ে গলায় দেবার দড়ি খুঁজছে, গিরিশবাবুর সেখানকার অভিনয়ের তুলনা হয় না।" (দ্রঃ হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ২২-২৩)

করুণাময়ের প্রতিবাসী রূপচাঁদের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় সম্বন্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ( ১২ই অগাস্ট, ১৯০৫ ) পত্রিকার মন্তব্য :

"His rich neighbour was represented by another veteran actor Ardhendu Sekhar Mustafi who did his part as might be expected of him."

'অর্দ্ধেন্দু-রূপচাঁদ' সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখছেন :

"হাবা-গোবা ছেলে দুলালচাঁদের পিতা রূপচাঁদ। খুব ধনী···কিন্তু খুব চতুর এবং ফন্দীবাজ। এ ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে মনে হয়েছিল, এমন ধনী ঘুঘু দু-চারটি কলকাতা শহরে দেখেছি তো! তাঁর অভিনয়ের মস্ত বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বিচিত্র বিভিন্ন রসের ভূমিকা তিনি এমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতেন যে অর্দ্ধেন্দু বলে মনে হ'ত না—যেন নাটক বর্ণিত লোকটিকে জীবন্ত দেখছি! হাবে ভাবে···প্রত্যেক খুঁটিনাটির দিকে ছিল তাঁর আশ্চর্য লক্ষ্য।" ( 'অর্দ্ধেন্দু-শেখর' : 'সচিত্র শিশির', চৈত্র ১৩৬৩ )

দু'চার রাত্রি অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্রের পরিবর্তে অর্দ্ধেন্দুশেখর 'করুণাময়'-এর ভূমিকায় অভিনয় করলেন। সে-অভিনয়ের বিবরণ অপরেশচন্দ্র লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি লিখছেন :

"বলিদান অভিনয়ের দুই চারি রাত্রি পরে এক শনিবারে 'করুণাময়ের' ভূমিকা অভিনয় করিয়া গিরিশচন্দ্র হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। নূতন নাটকের প্রথম ধারাবাহিক অভিনয়—গিরিশচন্দ্র হঠাৎ অসুস্থ, সম্প্রদায়স্থ সকলেই চিন্তিত, করুণাময় সাজিবেন কে? অথচ নূতন বই, বন্ধ দিলে সমূহ ক্ষতি। সোমবার দুপুরবেলায় গিরিশবাবুকে দেখিতে গেলাম; তখনও তাঁহার হাঁপানির টান রহিয়াছে এবং আশু প্রতীকারের কোনও সম্ভাবনা নাই।

"বই বন্ধ করিতে গিরিশবাবু সম্মত হইলেন না। তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইল, করুণাময় সাজিবেন কে? তিনি বলিলেন, 'দু-রাত্রি যদি চালিয়ে দিতে পার বোধ হয় পরে আমি সাজতে পারবো।' কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন উঠিল, দুই রাত্রিই বা চালাইয়া দিবে কে? গিরিশবাবু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, 'পারে এক অর্দ্ধেন্দু। তবে তাকে যদি এ ক'দিন নজরবন্দী রাখতে পার, আর কোন রকমে পার্টটি মুখস্থ করিয়ে দিতে পার।' ইদানীং সাহেবের বড় সুখ্যাতি ছিল, তিনি পার্ট মুখস্থ করিতেন না। অনেক তর্কবিতর্কের পর গিরিশবাবুর রায়ই বহাল রহিল। সাব্যস্ত হইল যে অর্দ্ধেন্দুবাবুই সামনের সপ্তাহে করুণাময় সাজিবেন। থিয়েটারে ফিরিয়া আসিয়া আমরা সাহেবকে এই সুখবর দিলাম।

অর্দ্ধেন্দুশেখরকে সকলে সাহেব বলিয়া ডাকিত। সাহেব বলিলেন, 'বলিস্ কি? ও পার্ট যে গিরিশ জ্বালিয়ে দিয়েছে! ও পার্ট আর কাউকে ছুঁতে হবে না।'

"আমরা বলিলাম, 'উপায় কি? বই বন্ধ দিলে যে বইখানা একেবারে যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা, বিপক্ষ দল যে হাসবে। বলবে ওদের দলে এমন একটা লোক নেই যে, করুণাময় সাজে?'

"সাহেব বলিলেন, 'বলুকগে…রা। একি ছেলের হাতে মোয়া? যারা বলবে তারা এর বোঝে কি?'

"কিন্তু আমাদের তখন 'গরজ বড় বালাই'। সাহেবকে আমরা দলসুদ্ধ ধরিয়া বসিলাম, সাহেবও সম্মত হইলেন। সোমবার হইতে শনিবার পর্যন্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর আর বাড়ি যান নাই। চোখে ভালো দেখিতে পাইতেন না; বই পড়িয়া পার্ট মুখস্থ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ক্ষেত্রবাবু তাঁহাকে পার্ট বলাইতে আরম্ভ করিলেন। দিবারাত্রি করুণাময়ের ভূমিকা সাহেবের জপমালা হইল। যখনি থিয়েটারে যাই, দেখি সাহেব পার্ট বলিতেছেন; আহার-নিদ্রা নাই; অন্য কোন কথা নাই। গিরিশবাবু যে তাঁহাকে নজর-বন্দী রাখিতে বলিয়াছিলেন, সে-কথাও তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। আর গিরিশবাবুর সে কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, সে ইঙ্গিতের মর্যাদা তিনি রাখিয়াছিলেন; এ কয়দিন তিনি মদ স্পর্শ করেন নাই—অথচ এই মদই ছিল তাঁহার অহোরাত্রের সঙ্গী।

"সে-শনিবার অর্দ্ধেন্দুশেখর করুণাময় সাজিলেন। তাঁহার অপবাদ ছিল তিনি পার্ট মুখস্থ করিতেন না, কিন্তু সে কলঙ্ক এবার আর রহিল না। তিনি করুণাময়ের ভূমিকা যে শুধু মুখস্থ করিয়া চালাইয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে, অভিনয় তাঁহার এত সুন্দর ও মর্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, গিরিশচন্দ্রের পর এ পর্যন্ত শত করুণাময় দেখিয়াছি, অর্দ্ধেন্দু-করুণাময়ের মত করুণাময় দেখি নাই।

"অর্দ্ধেন্দুশেখর সে-রাত্রি খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিলেও, গিরিশচন্দ্রের সহিত এই চরিত্রের conception লইয়া পার্থক্য ছিল। সে পার্থক্য কি, যেমন দেখিয়াছি এবং আমার বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, তেমনই বলিবার চেষ্টা করিব। চেষ্টা করিব সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় কালী-কলমে অভিনয়কে তো আর ফুটাইয়া তোলা যায় না।

"গিরিশচন্দ্রের করুণাময় যাহা বলে, যাহা করে, তাহা কন্যাদায়গ্রস্ত কেরানীর মত হইলেও সাধারণ কেরানী বা সাধারণ কন্যাদায়গ্রস্ত বাপের মত নহে। সে করুণাময়ের বাক্যে ও কার্যে যেন অন্তর্নিহিত একটা গভীর ভাব আছে, যাহা

বাহিরে সহজে ধরা যায় না, কিন্তু মর্মে অনুভব করা যায়। একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদ, একট প্রচ্ছন্ন মহত্ব, একটা প্রচ্ছন্ন উদার হৃদয়, একটা প্রচ্ছন্ন সত্যনিষ্ঠা, একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান। এই অভিমানকে, এই বিষাদক্লিন্ন ভাবকে চাপা দিয়া করুণাময় আপিসে যায়, অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহের জন্য বরের বাপের দ্বারস্থ হয়, পণের টাকা সংগ্রহ করিতে বাড়ি বাঁধা দেয়, পাওনাদারদের তাগাদা সহ্য করে, কিন্তু insolvent court-এ যায় না, আর মেয়েগুলোকে অনিচ্ছায় অপাত্রে দিয়া মর্মের আগুনে গুমরিয়া পোড়ে। এ করুণাময়ের অন্তরে যৌবনের প্রথম দিনে যেন উচ্চাভিলাষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু অঙ্গারের উত্তাপ দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্ষরক্তকে শুকাইয়া দিতেছে। সাহেবের করুণাময় হইত ঠিক সাধারণ গৃহস্থ বাপ। মমতাকাতর, দারিদ্র্যে ম্রিয়মান্, কন্যাদায়ে উদ্ব্যস্ত এবং সংসারচক্রে নিস্পেষিত মানব। সাহেবের এ ভঙ্গীর অভিনয় দেখিয়াও দর্শক কাঁদিত এবং গিরিশচন্দ্রের করুণাময় দেখিয়াও দর্শকের চক্ষে জল ঝরিত। কিন্তু এই দুই চোখের জলেরও প্রভেদ ছিল। সাহেবের অভিনয় দেখিয়া চোখের জল পড়িত বটে, কিন্তু তাহাতে গলা শুকাইত না; মনে হইত না যে, বুকের মধ্যে সব যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে; মনে হইত না যে, কেহ যেন বক্ষের পঞ্জর একখানির পর একখানি খুলিয়া লইতেছে। যে দুঃখে হিরণ্ময়ী পুকুরে ডুবিয়া মরে, সেই দুঃখে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর মমতাবিগলিত চক্ষের ধারে বক্ষ ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, 'এই যে, খুঁজে পাওয়া গিয়েছে! তাইত বলি, আমার শান্ত মেয়ে, রাস্তায় যাবে না' ইত্যাদি। এ ক্রন্দনেও দর্শক কাঁদিতেন, কিন্তু গিরিশ-চন্দ্র যখন এই কথা বলিতেন, তখন তাঁর চক্ষে জল কোথায়! দেহের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছে, শোণিত-প্রবাহ স্তব্ধ, নিস্পলকনেত্রে জমাটবাঁধা মেঘ, কণ্ঠস্বর শুষ্ক, ভগ্ন, গভীর! এ চিত্র দেখিয়া দর্শকের অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন হাহাকার করিয়া উঠিত, কোন্ অপরিজ্ঞাত শোক—কোথায় ছিল, কখন আসিল, দমকা ঝড়ের মত অলক্ষ্যে, নিমিষে সব যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গেল! গিরিশচন্দ্রের করুণাময় দর্শককে অনুসরণ করিত। অভিনয়ান্তে—পথে, গৃহদ্বারে, অন্ধকার শয়নকক্ষে, আহারে নিদ্রায় স্বপ্নে, অভিনয় দেখার দু'-তিন দিন পরেও এ-করুণাময়ের প্রভাব দর্শককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। সাহেবের অভিনয়ে সমস্ত নাটকের প্রভাব দর্শককে আকুল করিয়া তুলিত; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে নাটকের সকল ঘটনা চাপা দিয়া মানসচক্ষে কেবল দেখা দিত—করুণাময়,—বজ্রাহত তরুর ন্যায়, পত্রপুষ্পহীন, বিদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের মত! গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে এই দুই করুণাময়ের আলোচনায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'করুণাময় যদি ও দুঃখে

কাঁদে, তাহ'লে সে আর গলায় দড়ি দিতে পারে না ('রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর,' পৃ. ৭৯-৮৩)

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ২২এ জুলাই তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় স্টারের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলো—

A new Historical Play
RANA PRATAP
STAR THEATRE
Saturday 22nd July at 9 P.M.
Mr. D.L. Roy's New Historical Play
RANA PRATRAP

The Great name of the Author is itself a guarantee of the excellence of the Piece.

We talk of Garibaldi, Napoleon, Nelson and Wellington and our tongues are eloquent about the patriotism and heroism of Japan ; but in strict observance of the old adage, "the beggar of the village receive no alms." We often forget the ideal heroes and patriots of our own country.

RANA PRATAP

has defied the name of "Pratap" by his almost divine deeds.

The caste including the whole strength of the company, including the public's most obedient servant—the Manager.

Babu Girish Chandra Ghose's most popular poem "Haldighat" has been incorporated in the stage copy of Mr. D. L. Roy's Drama.

Next day Sunday at Candle light
SARALA
AND
JADUKARI

AMRITALAL BOSE
MANAGER

প্রধান ভূমিকাগুলির পরিচয়: রাণাপ্রতাপ-অমৃতলাল মিত্র, শক্তসিংহ—অমৃতলাল বসু, পৃথ্বীরাজ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মানসিংহ—অক্ষয়কালী কোঁয়ার, মেহেরউন্নিসা—নরীসুন্দরী, দৌলত—বসন্তকুমারী।

স্টারে 'রাণা প্রতাপ'-এর অভিনয় দর্শকদের তাতিয়ে দিল। কিন্তু ঐ অভিনয়ের প্রযোজনা নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে স্টারের মনোমালিন্য ঘটে। গিরিশচন্দ্রের 'হলদীঘাটের যুদ্ধ' নামে বিখ্যাত কবিতাটি অমৃতলাল বসু 'রাণা প্রতাপ'-এর হলদীঘাট-দৃশ্যে তিনটি কি চারটি বিভিন্ন দূতের মুখে যুদ্ধবর্ণনাচ্ছলে জুড়েছেন। এতে দ্বিজেন্দ্রলাল দারুণ চটে গেলেন। প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পরেই তিনি স্টারের সংস্রব ত্যাগ করলেন এবং মিনার্ভার মহেন্দ্রবাবুকে ধরে বসলেন, 'রাণা প্রতাপ' মিনার্ভায় খুলতে হবে আর তা স্টারের দ্বিতীয় অভিনয়ের রাত্রেই অর্থাৎ পরের শনিবার ২৯এ জুলাই তারিখে। মহেন্দ্রবাবু স্টারের 'রাণা প্রতাপ' দেখেছেন। তিনি রাজি হলেন। মিনার্ভায় সোমবার থেকে দিবারাত্র রিহার্সাল আরম্ভ হ'ল। মাঝে সময় মাত্র পাঁচ দিন। এই পাঁচ দিনের রিহার্সালে একটা পাঁচ অঙ্কের নাটক নামাতে হবে, বিশেষতঃ স্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। ঐ পাঁচদিন মিনার্ভার অধিকাংশ অভিনেতৃবৃন্দ বাড়ি যান নি।

২৯এ জুলাই মিনার্ভায় 'রাণা প্রতাপ' মঞ্চস্থ হলো। এখানে অবশ্য 'হলদীঘাটের যুদ্ধ' দূতমুখে দেওয়া হয় নি। অভিনয়ের আগে প্রস্তাবনা হিসেবে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র দু'চার রাত্রি 'হলদীঘাটের যুদ্ধ' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। মিনার্ভায় প্রথম অভিনয়-রজনীতে ভূমিকালিপি ছিল এইরকম—

রাণা প্রতাপ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), শক্তসিংহ—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীরাজ—অর্দ্ধেন্দুশেখর, মানসিংহ—মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু), আকবর—নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (থাকোবাবু), সেলিম—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, পুরোহিত—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), যোশীবাই ও দৌলৎ—তারাসুন্দরী, মেহের—সুশীলাবালা, ইরা—ভূষণকুমারী, লক্ষ্মী—সুধীরাবালা (পটল)।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'পৃথ্বীরাজ' সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

"এ নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর নেমেছিলেন কবি পৃথ্বীরাজের ভূমিকায়। ভূমিকাটি তিনি এমন চটুল করেছিলেন যে পৃথ্বীরাজের সম্বন্ধে মনে আজীবন যে ধারণা পোষণ করে আসছিলুম, সে ধারণায় আঘাত লেগেছিল।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর' 'সচিত্র শিশির', চৈত্র ১৩৬৩)

কিন্তু মিনার্ভায় 'রাণা প্রতাপ' জমলো না। সময় বুঝে গিরিশচন্দ্র এবার 'সিরাজউদ্দৌলা'-কে আসরে নামালেন।

১৯০৫—বাঙলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। বাঙালীর জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাবার উদ্দেশ্যে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ঐ বছরের জুলাই মাসে

বঙ্গবিভাগের কথা ঘোষণা করেন। উত্তর ও পূর্ববঙ্গ যুক্ত হবে আসামের সঙ্গে আর পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হবে বিহার-উড়িষ্যার সঙ্গে। ইংরেজের এই শয়তানী মতলব বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা ধরে ফেললেন। প্রতিবাদ জানাবার জন্যে অগাস্ট মাসে কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট জনসভা হয়। সেদিনকার সভায় মুখ্য বক্তারূপে বাঙলার 'মুকুটহীন সম্রাট' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিময়ী ভাষায় পাল্টা ঘোষণা করলেন, যতদিন না বঙ্গভঙ্গ রদ হবে ততদিন বিলাতি দ্রব্য 'বয়কট'।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশময় এক তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এই আন্দোলন 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে অমর হয়ে আছে। এই আন্দোলনকে ঘিরে সেদিন সমগ্র জাতির হৃদয় দেশপ্রেমে উদ্বোধিত হয়েছিল। বাঙালীর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো ঋষি বঙ্কিমের মাতৃমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্', রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বাঙালী গেয়ে উঠল 'আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি'।

বাঙলার রঙ্গমঞ্চও সেদিন জাতীয় ভাবোদ্দীপনার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা' ও 'মীরকাশেম', দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ' ও 'মেবার পতন', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' ও 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' সেদিন দেশপ্রেমের বাণী বহন করে এনেছিল।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে সেদিন সমগ্র জাতির সঙ্গে স্টার থিয়েটারও অশৌচ পালন করেছিল। স্টারের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারিত হয়েছিল—

*MOURNING AT THE 'STAR' ! ! !*
*PARTITION OF BENGAL*
*NO AMUSEMENT WORK AT THE*
*STAR THEATRE*
ON
Wednesday, the 6th September.

AMRITALAL BOSE
MANAGER

৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় স্টার থিয়েটার কর্তৃক নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হয়—

Grand Dramatic Night !
RANA PRATAP ! RANA PRATAP !
STAR THEATRE

Saturday the 9th September at 9 P.M.
On the raising of the curtain the
recently written but already Universally popular
song by Babu Rabindra Nath Tagore "Sonar
Bangla etc. etc." will be sung by all the
gentlemen vocalists of the company.

Next the Patriotic Drama
RANA PRATAP
RANA PRATAP
RANA PRATAP
Nextday Sunday at Candlelight
RANJABATI

AMRITALAL BOSE
MANAGER

এদিকে ৯ই সেপ্টেম্বর (২৪এ ভাদ্র, ১৩১২) মিনার্ভায় 'সিরাজউদ্দৌলা' মঞ্চস্থ হয়। সে রাতের পরিচয়-লিপি :

সিরাজউদ্দৌলা—দানীবাবু, মীরজাফর—নীলমাধববাবু, মীরমদন—মণ্টুবাবু, সৌকৎজঙ্গ—হাঁদুবাবু, মোহনলাল—তারকপালিত, উমিচাঁদ—হরিদাস দত্ত, ক্লাইব—ক্ষেত্রবাবু, করিমচাচা—গিরিশচন্দ্র, দানশা ফকির—অর্দ্ধেন্দুশেখর, জহরা—তারাসুন্দরী, লুৎফা—সুশীলাবালা, ঘেসেটি—সুধীরাবালা।

গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "সিরাজউদ্দৌলা -নিখুঁতভাবে অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র যেরূপ প্রধান প্রধান ভূমিকাগুলির শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকিতেন—অর্দ্ধেন্দুবাবু সেইরূপ ছোটখাটো ভূমিকাগুলির শিক্ষাদানে চরিত্রগুলি জীবন্ত করিয়া দিতেন। সিরাজউদ্দৌলা নাটকে হিন্দু, মুসলমান, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি বিস্তর ছোট ছোট ভূমিকা আছে —অর্দ্ধেন্দুবাবু অতি কৃতিত্বের সহিত ফুটাইয়া দিয়াছিলেন।" ('গিরিশচন্দ্র', পৃ. ৫৩৬)

এ নাটকের সামগ্রিক অভিনয় এবং অর্দ্ধেন্দুর ব্যক্তিগত অভিনয়দক্ষতা সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যে বলা আছে :

" 'সিরাজউদ্দৌলা'য় দানশা ফকিরের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর আর এক অপূর্ব অভিনয় দেখিয়েছিলেন। ক্রূর নির্মম ঘাতকের সে-মূর্তি সে-ভঙ্গী নাটকের ট্র্যাজিডিকে মর্মঘাতী করে তুলেছিল। এ নাটকের অভিনয় আশ্চর্য সাফল্য লাভ

করেছিল গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, দানীবাবু, জহরা এবং সিরাজের বেগম লুৎফ-উন্নিসার অভিনয়ের দরুণ…এমন team work এত বড় ট্র্যাজিডিতে নাট্যমঞ্চে বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর': 'সচিত্র শিশির', চৈত্র ১৩৬৩)

আমরা এখানে 'সিরাজউদ্দৌলা'র সপ্তম ও অষ্টম অভিনয়-রজনীর বিজ্ঞাপন (২৮-এ অক্টোবর ও ৪ঠা নভেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত) পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি—

MINERVA THEATRE
6, Beadon Street
Saturday, 28th October, 1905, at 9 P.M.
The seventh grand performance of
G. C. Ghose's new historical Drama
SIRAJ-UD-DOWLA
The last independent Nabab of Bengal,
The patriotic prince who gave his heart's
blood to preserve the independence
of his country.
Karim—Girish Chunder Ghosh
New and Splendid Scenery !
National Costumes ! !
Plenty of Songs and Dances ! ! !
Nextday, Sunday at Candle light
Another extraordinary Programme for
one night only
I. RANA PRATAP
The most illustrious name in the pages
of history.
The Grand Social Drama
II. SANSARA
Nobo Khuro—Mr. A, Mustafee.
III. THE MINERVA BIOSCOPE
Grand Exhibition of fine Pictures.
N. B. Those gentlemen who had to go back
disappointed on Saturday and Sunday last week
are specially requested to come early in order

to avoid the repetition of that unpleasant disappointment.

G. C. GHOSE, Manager.

* * *

MINERVA THEATRE

6, Beadon Street

Saturday, the 4th November, at 9 P. M. Sharp

The Eighth grand performance of

G. C. Ghose's new historical Drama

SIRAJ-UD-DOWLA

The last independent Nabab of Bengal,

SIRAJ-UD-DOWLA

The history of the English Conquest of

Bengal laid bare

Karim—Girish Chunder Ghosh

National Costumes ! !

Plenty of Songs and Dances ! ! !

Next day, Sunday, at Candle light

for one night only

RANA PRATAP

The most illustrious name in the pages

of history.

II. G. C. Ghose's splendid Mythological Drama

JANA

Vidushak—Mr. Mustafee.

III. THE MINERVA BIOSCOPE.

I am glad to announce that a grand amphitheatre has been constructed on the second story in order to provide extra accommodation for the hundreds of our patrons and constituents who had to go away disappointed for want of seats during the last few weeks. But Gentlemen will kindly remember that the accommodation then provided is also limited and they are accordingly requested to book their seats in order to avoid repeated disappointed.

G. C. GHOSE Manager

'সিরাজদ্দৌলা'-র যে- দুটি বিজ্ঞাপন তুলে ধরেছি তার মধ্যে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটিতে পাঠক দেখবেন, ৫ই নভেম্বর, রবিবারের রাত্রে 'রাণা প্রতাপ' ও 'জনা'-র অভিনয় ছিল : 'জনা'-য় 'বিদূষক'-এর ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাম বিজ্ঞাপিত আছে। কিন্তু ঐ রবিবারে অর্দ্ধেন্দুর জামাতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। শোকাহত অর্দ্ধেন্দুশেখর সেদিন আর বিদূষক সাজতে পারেন নি। এই ঘটনার স্মৃতিতে শিশির-যুগের অভিনেতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ( 'সীতা' ও 'দিগ্বিজয়ী'-র নাট্যকার ) লিখেছেন :

"অর্দ্ধেন্দুকে আমি যেদিন প্রথম দেখি—সে দিনটা আমার জীবনের বেশ একটা চিহ্নিত স্মরণীয় দিন। ১৯০৫ সাল, সবে পাড়াগাঁ থেকে কলিকাতায় আসিয়াছি। সে একটা রবিবার। সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয় সেই প্রথম দেখি, মিনার্ভা থিয়েটারে। দুইখানি নাটকের অভিনয় ছিল। রাণা প্রতাপ, পরে জনা। রাণা প্রতাপ অভিনয় হইয়া গিয়াছে, জনা আরম্ভ হইবার পূর্বে এক দীর্ঘকায় পুরুষ যবনিকার অন্তরাল হইতে পাদপ্রদীপের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, 'আজ জনায় আমার বিদূষকের ভূমিকা অভিনয় করবার কথা—আমার নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছে। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ ক'রবো। আমার মন আজ বড় খারাপ। আমার জামাতা হাইকোর্টের উকিল অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজ মারা গেছেন। আজ অভিনয় করবার মত মনোভাব আমার নেই। আপনারা যদি অনুমতি দেন, আমার পরিবর্তে অন্য অভিনেতা অভিনয় করবেন। কিন্তু আপনাদের অনুমতি না পেলে আমি অভিনয় করতে বাধ্য।' আশেপাশের দর্শকের কাছে শুনিলাম—ইনিই অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও সহযোগিগণের মুখে ও লেখায় তাঁর নটজীবনের কর্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সব কথা শুনিয়া ও পড়িয়া থাকি—তাহা যে একবর্ণও অত্যুক্তি নহে তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্দ্ধেন্দুর এই চিত্রটি আমার মনে আজও অম্লান রহিয়াছে, বোধ হয় চিরদিন থাকিবে। ইহার পরে বোধ করি মাত্র ৩।৪ বার তাঁর অভিনয় আমি দেখিয়াছি। যে সকল ভূমিকায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল তার মধ্যে একমাত্র 'গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ' ছাড়া আর কোন ভূমিকায় অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।...তাঁর সম্বন্ধে আমার নিজস্ব স্মৃতি এই।...এ স্মৃতি সামান্য নয়।... তারপর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর কয়েকখানি চিত্র দেখিয়াছি। অপূর্ব,—সেই চিত্র কয়খানি হইতে অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়-শক্তির বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রগুলি প্রাণশক্তিতে একেবারে জীবন্ত।

প্রত্যেক চিত্রের মধ্য হইতে অর্দ্ধেন্দু যেন কথা কহিয়া বলিতেছেন—'আমি আছি'।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর': 'নাচঘর', ৫ই আশ্বিন, ১৩৩৫)

'সিরাজউদ্দৌলা'র ত্রয়োদশ অভিনয়-রজনীতে (৯ই ডিসেম্বর, ১৯০৫) অর্দ্ধেন্দুশেখর রূপদান করলেন পাঁচটি বিভিন্ন চরিত্রে—শওকতজঙ্গ, মীরকাশেম, ড্রেক, সেরাফ্‌টন আর মুঁসালা। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত (৯ই ডিসেম্বর, ১৯০৫) নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য :—

MINERVA THEATRE
6, Beadon Street.
Saturday, the 9th December, at 9 P. M.
The thirteenth grand performance of Girish Chunder
Ghose's New historical Drama
SIRAJ-UD-DOWLA
The last independent Nawab of Bengal,
The history of the English Conquest
of Bengal laid bare,
Babu Ardhendu S. Mustafee will appear in five
different characters :—
Suokutjung—Meerkasem—Mr. Drake
Mr. Serafton—Mushala
Karim—Girish Chunder Ghosh (My humble self)
New and Splendid Scenery !
National Costumes ! !
Plenty of Songs and Dances ! ! !
Next Day, Sunday at Candle light
That renowned Social Drama
SANSARA
Followed by Mr. D. L Roy's Great National Drama
RANA PRATAP
The most illustrious name on the pages of History
to end with
THE MINERVA BIOSCOPE
Please book early to avoid disappointment

A. S. MUSTAFEE — Master
G. C. GHOSH — Manager

১৯০৫-এর ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে ডাঃ হরনাথের 'জাগরণ' নামে একটি

জাতীয় ভাবাত্মক নাটিকা মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়। ঐ পালায় অর্দ্ধেন্দুশেখর 'নকল-রাজা' সেজে অত্যাশ্চর্য অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। সে রাত্রে দেশের বহু নেতা ও বিদ্বজ্জন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য :—

SUNDAY—First performance of a New Stirring
National Sketch in three acts.

MINERVA THEATRE
6, Beadon Street.

Saturday, the 16th December, at 9 P. M. Sharp
The grand fourteenth performance of Girish Chunder
Ghose's new historical Drama
SIRAJ-UD-DOWLA
The last independent Nawab of Bengal
Karim—Girish Chunder Ghosh (my humble self)
Next day, Sunday, Grand Candle light performance
Under the distinguished patronage
and kind presence of Sir Guru Dass Bannerjee, the Hon'ble
Bhupendra Nath Bose, Raja Peary Mohan Mukherjee
of Uttarpara, Babu Indronath Banerjee, Pleader
of Burdwan, Babu Akshoy Kumar Sircar, (Editor,
"Sadharani"), Babu Chandra Nath Bose, Late
Bengali Translator to Government Court,
Maharaja Surja Kanto Acharja Chowdhury Bahadur of
Mymensingh, Kumar Manmotho Nath Mitra,
Roy Pashupati Nath Bose, Babu Subodh Chunder Mullick
First performance of the New National Sketch
JAGARANA
OR
The Awakened Bengal.
All songs have been set up in music by
Professor Deba Kunto Bagchi Surasagara
Songs Pretty ! Dances Picturesque ! !
Scenes and Dresses Appropriate !!!
Mr. A. Mustafee impersonates a Jocular Mock King.
Followed by Mr. D. L. Roy's National Drama.

RANA PRATAP
RANA PRATAP

A. S. MUSTAFEE — Master
G. C. GHOSE — Manager

২৬এ ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্রের নতুন নাটক 'বাসর' খোলা হ'ল ; অর্দ্ধেন্দুশেখর 'বিধাতাপুরুষ'-এর ভূমিকায় আবির্ভূত হলেন। সেদিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এই রকম :—

*GRAND X'MAS ENTERTAINMENTS*

The entire Pavillion Tastifully decorated.

*MINERVA THEATRE*

6, Beadon Street

Tuesday the 26th December, 9 P.M.

New Drama ! New Drama ! New Drama !

Grand opening performance of

Girish Chunder Ghose's New Drama

*BASAR*

If you want to realise with what success India, in the days of her glory, was governed by the Arya King, what anxious solicitude he displayed for the welfare of his subjects and how he passed years of penance and self-sacrifice to prevent even a single case of untimely death in his vast dominions, please come and witness our performance of

*BASAR*

In order to make the subject interesting as well as instructive the Drama has been made to consist of Thirty-five songs, the first of which would set out in gorgeous colours the beauty, the grandeur and the glory of our motherland.

Splendid costumes ! Gorgeous Scenery ! !
Graceful Dances ! ! Thrilling Songs ! ! !

followed by Dr. Haranath's new society sketch

*JAGARANA*

*or,*

**The Awakening of Bengal**

**A realistic picture of the present situation !!**

Mr. Mustafee's wonderful impersonation of the mock king.

Wednesday, the 27th December at 9 P. M.

I. Pundit Khirode Prasad's

PRATAPADITYA

Vikramaditya and Roda—Mr. Mustafee

II. ABU HOSSAIN

III. THE MINERVA BIOSCOPE

A. S. MUSTAFEE — Master

G. C. GHOSE — Manager.

১৯০৬ খ্রী: । নতুন বছরের পালা সুরু হ'ল মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার' আর চুনিলাল দেবের অপেরা 'নসীব' দিয়ে। সেদিন ছিল বুধবার, ৩রা জানুয়ারি। অমৃতবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, সেদিন বেলা দেড়টা থেকে অভিনয় শুরু হয়েছিল।

১০ই ফেব্রুয়ারি 'সিরাজউদ্দৌলা'-র দ্বাবিংশতিতম অভিনয় আর ১১ই ফেব্রুয়ারি 'দুর্গেশনন্দিনী'-র revival। শেষোক্ত নাটকের ভূমিকালিপি: বীরেন্দ্র সিংহ—গিরিশচন্দ্র, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ—অর্ধেন্দুশেখর, অভিরাম স্বামী—নীলমাধব চক্রবর্তী, ওসমান—দানীবাবু, জগৎসিংহ—তারকপালিত, কত্‌লু খাঁ—মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু), বিমলা—তিনকড়ি, আয়েষা—তারাসুন্দরী।

১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য:

A rare combination of the best artistes of the day never before witnessed on the Indian Stage

*MINERVA THEATRE*

6, Beadon Street

Saturday the 10th February at 9 P. M. Sharp

The grand 22nd performance of Girish Chunder Ghose's New historical Drama

*SIRAJ-UD-DOWLA*

The last independent Nawab of Bengal

Karimchacha—Girish Chunder Ghosh

Mr. Drake—Mr. Mustafee

Ghaseti Begum—Miss. Tincowri

Johara—Miss. Tarasundari

Next Day, Sunday at candle light

DURGESHNANDINI

or the Chieftain's Daughter

Carefully dramatised by my humble self

Birendro—Girish C. Ghose

Vidyadigyaj—Mr. Mustafee

Bimala—Miss. Tincowri

Ayesha—Miss. Tarasundari

New and gorgeous dresses : Splendid Scenery.

Great sensation from start to finish

Charming songs—Graceful Dances

The genius of Bunkim Chandra will shine forth in redoubled glory in every scene, Every Pose and every situation.

The Histrionic Art manifested in all its glory.

A. S. MUSTAFEE G. C. GHOSE

Master Manager

'গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ'-এর ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় সম্পর্কে সমকালীন সাক্ষ্য উপস্থাপিত করছি। সকলেই তাঁর অলৌকিক অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন :

"…অর্দ্ধেন্দুবাবু গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ সেজে এসেছিলেন। বঙ্কিমবাবুর বর্ণিত পোড়া কাঠের মত পা, লম্বকর্ণ দিগ্‌গজ ঠাকুর সেদিন যেমন আমার চক্ষের সামনে প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন—এমন তাঁর বই পড়ে কখন হয়নি। দিগ্‌গজ যখন মুসলমান ফকির সেজে ছড়া আওড়াচ্ছিলেন, 'হপ্ত দিনের মরা গরু দস্তে কাটে ঘাস'—তাঁর মুখে সেইদিন শুনেছিলাম, এখনও তা বেশ মনে আছে এবং লাঠি হাতে টুপি মাথায় উদ্ভট ফকির মূর্তি এখনও যেন সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাঁর অভিনয় মনের উপর এমনিই ছাপ মেরে গেছে।" (উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'অর্দ্ধেন্দুশেখর' পুস্তিকা থেকে পুনরুদ্ধৃত)

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন :

"আহার করিতে করিতে বিমলায় ডাকে হুঁ শব্দটুকু পর্যন্ত আজও আমাদের

কানে বাজিতেছে। বিদ্যাদিগ্‌গজ আহারে বসিয়াছেন, আহার করিতে করিতে কথা বলিলে আহার নষ্ট হয়, অথচ সাড়া না দিলেও বিমলা ফিরিয়া যায়, এ অবস্থায় সাড়া দিবার সে হুঁ টি কত সুন্দরভাবে অর্দ্ধেন্দুশেখর আবৃত্তি করিতেন যে সেরূপভাবে আবৃত্তি করা বড় একটা যে সে ক্ষমতার কাজ নয়। এই বিদ্যাদিগ্‌-গজের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর যে কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন সেরূপ অভিনয় আর হইবার বড় একটা সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মুখে সেই মাণিকপীরের গানটি 'মাণিকপীর ভবপারে যাবার না' গানটি এত সুন্দর হইত যে একমুখে তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকার অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর যথেষ্ট যশ পাইয়াছেন; যখনই অর্দ্ধেন্দুশেখরের কথা মনে পড়ে তখনই তাঁহার সেই বিদ্যাদিগ্‌গজের ছবিটুকু মনের ভিতর জাগিয়া ওঠে।...আমাদের মনে হয় অর্দ্ধেন্দু-বিদ্যাদিগ্‌গজ বঙ্কিম-কল্পনাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। কিরূপে যে মুস্তফী মহাশয় দেহ, মন, বাক্য এমন কি চেহারার উপরও এতাদৃশ প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর')

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন:

"দেহের উপর আধিপর্ত্য থাকা নটের প্রয়োজন।...'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয়ে যে অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুর 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' দেখিয়াছেন তাঁহার স্মরণ হইবে যে আহারান্তে জলপানকালে বিদ্যাদিগ্‌গজের গলার নলী এরূপভাবে সঞ্চালিত হইতেছে যেন 'গজপতি' সত্যই জলপান করিতেছেন। অভিনেতা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখুন এ সামান্য কার্যও কিরূপ অভ্যাসসাপেক্ষ।" ('অভিনয় ও অভিনেতা' শীর্ষক প্রবন্ধ)

'বসুমতী' (৩১এ মার্চ, ১৯০৬) সংবাদপত্র লিখেছেন:

"মিঃ মুস্তফীর যদি 'গৌরবরণ' না হইয়া 'মধুকর নিকরকরম্বিত কোকিল-কূজিত' কুঞ্জের পিকবরের ন্যায় কুচ্‌কুচে 'কালোবরণ' হইত তাহা হইলে তিনি আসল কি নকল বিদ্যাদিগ্‌গজ তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইত। আহারে বসিয়া বিদ্যাদিগ্‌গজ ঠাকুরটির জলপানের ভঙ্গিটি পর্যন্ত স্বাভাবিক।"

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

"দুর্গেশনন্দিনীতে বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকায় দেখেছি আলগোছে জল খাওয়া দেখাতে তাঁর গলার নলীর উত্থান-পতন এবং জলপানান্তে 'আঃ' বলে আরামের ছোট উক্তিটি। এ সব খুঁটি-নাটির দিকে একালের লায়ন-টাইগার আখ্যাধারী অভিনেতাদের কোনো লক্ষ্য দেখতে পাই না। এ খুঁটিনাটি শুধু একই রকমের নয়—যখন যেটুকু প্রয়োজন...তখনই সেটুকু দেখেছি এবং আত্মা ঠিক থেকেছে।

তাঁর অভিনয়ের এ-বৈশিষ্ট্য অবিস্মরণীয়।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর' : 'সচিত্র শিশির', চৈত্র ১৩৬৩)

আর কেউ নন, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী বলছেন :

"আগেকার দিনের অভিনেতারা আমাদের সময়ের অভিনেতাদের চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন। আমরা যতই হৈ-চৈ করি না কেন, এক প্রোডাক্সানে কিছু উন্নতি করা ছাড়া ইণ্ডিভিডুয়াল আর্টিস্টিক ব্রিলিয়ান্সে পুরোনোদের কাছেই লাগি না। অর্দ্ধেন্দুবাবুর কথাই ধর। ঐ যে পেটুক বামুন—গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ—করলেন, দেখলে একেবারে পিলে চমকে যায়। একটা কম্‌প্লিট ক্যারেক্টারাইজেসন।" (রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু প্রণীত 'শিশির সান্নিধ্যে', পৃ. ১৪৭)

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি, বুধবার থেকে ২১এ ফেব্রুয়ারি, বুধবার পর্যন্ত মিনার্ভার অভিনয়-তালিকা :—

৩রা জানুয়ারি—সংসার ও নসীব (বেলা দেড়টা থেকে)
৬ই „ —সিরাজউদ্দৌলা
৭ই „ —বাসর ও জাগরণ
১০ই „ —রিজিয়া ও নসীব
১৩ই „ —সিরাজউদ্দৌলা
১৪ই „ —বাসর ও রাণা প্রতাপ
১৭ই „ —প্রতাপাদিত্য ও গিরিশচন্দ্রের 'মণিহরণ'
২০এ „ —সিরাজউদ্দৌলা
২১এ „ —জাগরণ ও বাসর
২৪এ „ —সংসার ও নসীব
২৭এ „ —সিরাজউদ্দৌলা
২৮এ „ —জনা ও বাসর
৩১এ „ —রাণা প্রতাপ ও মণিহরণ
৩রা ফেব্রুয়ারী—সিরাজউদ্দৌলা
৪ঠা „ —প্রতাপাদিত্য ও বাসর
৭ই „ —সংসার ও জাগরণ
১০ই „ —সিরাজউদ্দৌলা
১১ই „ —দুর্গেশনন্দিনী

১৪ই „ —জনা ও নসীব
১৭ই „ —সিরাজউদ্দৌলা
১৮ই „ —দুর্গেশনন্দিনী
২১এ „ —শিবচতুর্দশী, সংসার ও হরগৌরী

২৮এ ফেব্রুয়ারি, বুধবার 'মিনার্ভা' মঞ্চে অভিনয় বন্ধ ছিল। কারণ, ঐদিন মিনার্ভা সম্প্রদায় খুলনার এগজিবিশনে 'বিল্বমঙ্গল'-এর অভিনয় দেখবার জন্য আহূত হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর 'সাধক' সেজেছিলেন এবং খুলনা জেলার ভাষায় তিনি সাধকের অংশ অভিনয় করেছিলেন। নানা অঞ্চলের নানা ভাষায় অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় করার অপ্রতিহত ক্ষমতা সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র লিখে গেছেন :

"এখন রঙ্গভূমিতে এমন কেহই নাই, যিনি কটকের ভাষা, কিম্বা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, কি ঢাকা বা চট্টগ্রামের ভাষায় লিখিত কোনও ভূমিকা নির্দোষভাবে অভিনয় করেন বা শিক্ষা দেন। আমরা অর্দ্ধেন্দুবাবুর সঙ্গে খুলনায় অভিনয় করিতে গিয়া দেখিয়াছি, অর্দ্ধেন্দুবাবু সাধক সাজিয়া প্রথমেই আরম্ভ করিলেন 'থাহ থাহ', এবং শেষপর্যন্ত ঐ ভাবে সাধকের অংশ অভিনয় করিয়া সে দেশের দর্শকবৃন্দকে মাতাইয়া তুলিলেন।...মেদিনীপুরে গিয়াও তিনি মেদ্নীপুরী ভাষায় সাধকের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের অনেক দেশজ ভাষার উপর তাঁহার প্রগাঢ় দখল ছিল; স্থান ও কাল বুঝিয়া তিনি অনেক সময়ে তাঁহার এই ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।...একদিন কোন ভূমিকা শিখিবার কালে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'সাহেব! আপনি যেমন দেখাইতেছেন, তেমনটিত আমার হইতেছে না, আপনার দেখিয়া অনুকরণ করিতে গিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার হইতেছে। কি করিলে ঠিক আপনার মতন অমনই করিতে পারি বলুন, নচেৎ মিথ্যা এ অনুকরণে কোন লাভই দেখিতেছি না।' সাহেব বলিলেন, 'আমি দেখি, তোমরা দেখিতে জান না, তাই তোমাদের শিখিতে এত কষ্ট হয়। অভিনয় শিক্ষা কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট হয় না—প্রকৃত অভিনয় সমাজের কাছে শিখিতে হয়। দেখিতে শিখিতে হয়—দেখিয়া বিচার করিতে হয়, নানাবিধ পুস্তক পাঠে নানা রসের আস্বাদন করিতে হয়; এবং উপযুক্ত অবসরে তাহার প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিতে হয়। অভিনেতার কার্য অতি গুরুতর,—কেবল মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করা নহে। সংসারে দেখিবে, পুত্র-হারা জননী কেমন করিয়া কাঁদেন, পিতা কেমন করিয়া কাঁদেন। মাতার ক্রন্দন ও পিতার ক্রন্দনে পার্থক্য কি। হঠাৎ আনন্দ-সংবাদ প্রাপ্তে লোক কেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। হঠাৎ রাগিলে লোকের মুখ-চোখ

কেমন হয়। আমায় কেহ অভিনয় শিখায় নাই। আমি সমাজ হইতে, পার্শ্বস্থ বন্ধুর নিকট হইতে এবং পুস্তক পাঠে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি,—সেগুলি আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত আছে এবং সেগুলির যথাস্থানে প্রয়োগে বরাবরই যত্ন করি—তাই বোধ হয় অনেকটা আমার হয়।' নূতন শিক্ষার্থী যাহারা, তাঁহাদের সাহেবের এই অমূল্য উপদেশ সর্বদা মনে রাখা উচিত। মনে রাখা উচিত যে, অর্দ্ধেন্দুশেখরের ন্যায় অভিনেতা অল্প আয়াসে হওয়া যায় না। মূর্খকে বাগ্বাদিনী না হয় কৃপা করিতেও পারেন ; কিংবদন্তী আছে, মূর্খ কালিদাসকেই সরস্বতী শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে সাদরে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন—কিন্তু অলসকে কখনও তাঁহার চরণচ্ছায়ায় বসিতে দেন নাই।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর' :'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ ১৩২১)

অপরেশচন্দ্র আরও লিখেছেন :

'...অর্দ্ধেন্দুশেখরের লক্ষ্য ছিল কিসে নাট্যশালার উন্নতি করিবেন,—আজীবন তিনি এই নিমিত্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। স্ফূর্তি করিবার জন্য, বিলাসবাসনার চরিতার্থতার জন্য, সস্তায় নাম করিবার জন্য তিনি থিয়েটার করেন নাই। তাঁহার আদর্শানুযায়ী অভিনেতা হইতে হইলে তাঁহার ন্যায় পরিশ্রমী হইতে হইবে, তাঁহার ন্যায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া বাগ্দেবীর একনিষ্ঠ পূজক হইতে হইবে, তাঁহার ন্যায় দেখিতে শিখিতে হইবে, তাঁহার ন্যায় ধ্যান করিয়া চরিত্রবিশেষের বা ভূমিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অভিনয়ের মূল সূত্র হইল অনুভব করিবার শক্তি (Learn how to feel) ; অভিনেতার প্রধান কার্য হইল নাট্যকারের লিখিত বাক্য-সমষ্টির সূত্র দিয়া নিজের হৃদয়ের বিনিময়ে দর্শকের হৃদয় আকর্ষণ করা। প্রতিভাশালী Macready বিলাতের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তাঁহার নাট্যজীবনের প্রারম্ভে Mrs. Siddonsএর সহিত কোন নাটকের নায়কের অংশ গ্রহণ করিতে হয়। Macready ভয়েই আকুল। প্রথম সিন্ একপ্রকার অভিনয় করিলেন। তৃতীয় দৃশ্যে Siddons-এর Co-actor স্বরূপ অভিনয়ার্থ তিনি দণ্ডায়মান, সম্মুখের দৃশ্যপট অপসারিত হইলে, Macready Siddons-এর ভাবভঙ্গী দেখিয়া নিজের ভূমিকা ভুলিয়া গেলেন, এক মিনিট নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া কোন কথাই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। Siddons Macready কে পুনঃপুনঃ তাঁহার কথা ধরাইয়া দিতে লাগিলেন ;—অভিনেতা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজ অংশ বলিয়া গেলেন। ক্রমশঃ Macreadyর দৌর্বল্য অন্তর্হিত হইল, নাটকের শেষভাগে তিনি এমন দক্ষতার সহিত অভিনয় করিলেন যে, সমগ্র দর্শক সমস্বরে এই নূতন অভিনেতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অভিনয়ান্তে Siddons Macreadyকে বলিলেন, 'তুমি

খুব ভাল অভিনয় করিয়াছ, তোমার ভবিষ্যৎ অতি সমুজ্জ্বল, কিন্তু আমার একটি কথা মনে রাখিও, কখনও অবহেলা করিয়া অভিনয় করিও না, জীবনে শিক্ষা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইও না, Study, study and study and don't marry before thirty।' অর্দ্ধেন্দুশেখরও নূতন শিক্ষার্থীকে পুনঃ পুনঃ বলিতেন —'পরিশ্রম কর, নিশ্চয়ই সফলকাম হইবে।' নিজের জীবনেও তিনি ইহার সার্থকতা দেখাইয়া গিয়াছেন।" (তদেব)

তারপর অপরেশচন্দ্র দুঃখে ও অভিমানে লিখেছেন :

"যে ক্ষমতা লইয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে ক্ষমতার সম্যক্ আদর এদেশে তিনি পান নাই। যদি এদেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর বিলাতে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নামের পূর্বে যে একটি Sir টাইটেল বসিত, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

"...দেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা অর্দ্ধেন্দুশেখর যে তাঁহার প্রতিভানুযায়ী আদর বা সম্মান পান নাই, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আমাদের দেশের থিয়েটারের অবস্থা অতি বিচিত্র। আমরা সমাজে আছি বটে, কিন্তু যেন কতকটা সমাজ-পরিত্যক্ত, আদরও নাই, শাসনও নাই। অর্দ্ধেন্দুশেখরের ন্যায় অভিনেতার আদরও দেখি নাই, আবার নাট্যশিল্পের ব্যভিচার যেখানে হইয়াছে, সেখানে তাহার তীব্র প্রতিবাদও দেখিলাম না। পৃষ্ঠপোষকও নাই, অন্যায় করিলে পৃষ্ঠে দু'এক ঘা প্রহার দেন, এমন আত্মীয় শাসকও কেহ নাই। যখনই থিয়েটারের কোন কথা হয়, দেখিয়াছি রুচিবাগীশ নাসিকাকুঞ্চন করেন, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সমাজের তথাকথিত বিজ্ঞ নেতৃসম্প্রদায় ব্যঙ্গের ভাষায় লেখেন 'থিয়েটারওয়ালা' যেমন আলুওয়ালা, পটলওয়ালা, টিকেওয়ালা, কেরাসিনতেলওয়ালা—কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, এই গৃহ-তাড়িত সমাজচ্যুত 'ওয়ালা'র দলই বঙ্গদেশে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া মাইকেল-দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকাবলী অভিনয় করিয়া সৎসাহিত্যের প্রচার করিয়াছেন। এই নাট্যশালা হইতেই একদিন বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের নাটক ধর্মের স্রোতে দেশকে মাতাইয়াছে,—তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, এই নাট্যশালাই প্রতাপাদিত্য, সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাসেম...প্রভৃতি অভিনয় করিয়া বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছে..."( তদেব )

কিন্তু অপরেশচন্দ্রের একথা ধ্রুবসত্য—

"যতদিন বাঙ্গালাভাষার আদর থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালা নাট্যশালার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন পাশ্চাত্য দেশে যেমন গ্যারিক, কীন, ম্যাকরেডি, কেম্বল প্রভৃতি

অভিনেতাগণ সাহিত্যের একটা দিক অধিকার করিয়া বসিয়াছেন—তেমনই অর্দ্ধেন্দুশেখরও বাঙ্গালার নাট্যশালায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া সাহিত্যের—সুকুমার শিল্পের একটা দিক অধিকার করিয়া থাকিবেন;—আমরা চাঁদা তুলিয়া তাঁহার প্রস্তরমূর্তি বা যাহা একটা কিছু করিতে পারি, আর নাই পারি।" (তদেব)

খুলনা থেকে ফিরে এসে অর্দ্ধেন্দুশেখর ৩রা মার্চ, শনিবার 'সিরাজদ্দৌলা'র 'মীরজাফর' সাজলেন।

পরবর্তী অভিনয়-প্রবাহ :—

৪ঠা মার্চ দুর্গেশনন্দিনী
৭ই „ সংসার ও নসীব
১০ই „ দুর্গেশনন্দিনী
১১ই „ বলিদান
১৪ই „ জনা ও আবুহোসেন
১৮ই „ দুর্গেশনন্দিনী, দোললীলা, শিব-চতুর্দশী
১৮ই „ বলিদান ও আলিবাবা
২১ এ „ রিজিয়া ও নসীব
২৪ এ „ দুর্গেশনন্দিনী
২৫ এ „ রাণাপ্রতাপ ও বাসর
২৮ এ „ সংসার ও নসীব
১লা এপ্রিল পাণ্ডবগৌরব

১৩ই এপ্রিল গুড্ ফ্রাইডের দিন বিপুল সমারোহে প্রফুল্ল ও চৈতন্যলীলার অভিনয় হয়। 'প্রফুল্ল'-তে গিরিশ যোগেশ আর অর্দ্ধেন্দু রমেশ সেজেছিলেন।

অর্দ্ধেন্দুর 'রমেশ' সম্পর্কে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"প্রফুল্ল নাটকের অভিনয়ে তাঁকে 'যোগেশ' সাজতে দেখেছি…'রমেশ' সাজতেও দেখেছি। যোগেশ-ভূমিকায় অবশ্য গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলাল মিত্রের মতো উঁচু ধাপে তিনি উঠতে পারেন নি। রমেশ চরিত্রের ভূমিকায় তাঁকে দেখেছি। এমন ধুতি পরে নেমেছিলেন…সে ধুতি হাঁটুর নীচে বেশি নামে নি। এ নিয়ে আমি তাঁকে জানিয়েছিলুম অনুযোগ। তিনি বলেছিলেন—থিয়েটারওয়ালা ঠিক ধুতি দিতে পারে নি—ধুতি সংগ্রহের অবকাশ ছিল না… কাজেই ঐ ধুতি পরেই নামতে হয়েছিল। তিনি সাধারণতঃ পেন্টুলেন পরতেন

…ধুতি তাঁকে বড় পরতে দেখি নি সহজ জীবনে…কাজেই নিজের ধুতি পরে নামবেন, সে উপায় তখন ছিল না…একথাও বলেছিলেন।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর': 'সচিত্র শিশির', চৈত্র ১৩৬৩)

১৫ই এপ্রিল বিবাহ-বিভ্রাট, ২১এ এপ্রিল দুর্গেশনন্দিনী ও বিবাহবিভ্রাট আর ২২এ এপ্রিল চৈতন্যলীলার পুনরভিনয় ও অভিমন্যু বধের revival। ২১ এ এপ্রিল তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এইভাবে :—

MINERVA THEATRE
6, Beadon Street
Saturday 21st April at 9 P M.
1. Bunkim Chandra's Masterpiece
DURGESHNANDINI
*Or*
the Chieftain's Daughter
The sensation—the triumph and the wonder of the Durgesh Nandini deserves a cordial welcome from all those who wish to see the stage rescued from the degradation into which it has been reduced by persons who regard a play a mere spectacle at the best.

BIBAHA-BIBHRAT
Jhi—Miss Tincowri Dasi
III—THE MINERVA BIOSCOPE
Next day Sunday at Candle light
By special request of the hundreds who had to return disappointed for want of seats on the Good Friday

CHAITANYALILA
Madhab—Girish Chunder Ghosh
Jogai—Mr. Mustafee
II. Followed by that martial Drama

AVIMANYU BADH
Avimanyu—Miss. Tincowri
In these degenerated days should not the story of the heroism of this boy of

sixteen be chronicled in letters of gold by all true sons of Bengal.

III. THE MINERVA BIOSCOPE

A. S. MUSTAFEE — Master
G. C. GHOSH — Manager

'চৈতন্যলীলা'-য় অর্দ্ধেন্দুশেখর 'জগাই' আর গিরিশচন্দ্র 'মাধাই' সেজেছিলেন। সেদিন যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়েছিল ; এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্। অমন চিত্তাকর্ষক অভিনয় দেখার সৌভাগ্য অল্পই ঘটে। অর্দ্ধেন্দু-গিরিশের অভিনয়-প্রতিভা এবং তাঁদের 'জগাই-মাধাই'-এর চিত্তগ্রাহী অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মনীষী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী মশাই-এর অভিনয় প্রথম দেখি নিতান্ত অল্পবয়সে, প্রায় শৈশবাবস্থায়। তবু মনে আছে। রবি বাবু, অবনীবাবু, ঠাকুর-বাড়ির মতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। 'এমনটি আর হয় না'—কবি বলতেন। (তাঁর আরেক fixation ছিল যথা বঙ্কিমবাবু আর যদুভট্ট) সমরবাবুর * কাছে মুস্তফী মশাই-এর এক 'প্রাকৃটিকাল জোক্'-এর গল্প শুনি। ঠাকুর বাড়ির এক (ঘর) জামাই খুব সাহেব হয়ে উঠেছিলেন। সকলে ব্যতিব্যস্ত। একদিন সকালে দেখা গেল নগ্নগাত্র, চটিধারী এক ব্রাহ্মণ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে পূর্ববঙ্গের ভাষায় চিৎকার করছেন। ব্যাপার কি ? ব্রাহ্মণ 'হালার পুত হালা'-র সঙ্গে দেখা করতে চান। ব্রাহ্মণের রাগ আর থামে না। শোনা গেল তাঁর ছেলে ঐ বাড়িতে লুকিয়ে আছে, ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে। সকলে মিলে তাঁকে ধরে বারান্দায় বসালে—সেখানে বসে পিণ্ডিদান আরম্ভ হোলো। ব্রাহ্মণের ছেলেটি শোনা গেল ঐ জামাইবাবুটি। তিনি তখন অন্দরমহলে গায়েব, লজ্জায় বাইরে আসতে পারছেন না। ব্রাহ্মণ খাওয়া-দাওয়ার পর অভিশাপ দিতে দিতে বিদায় হলেন। ব্রাহ্মণটি ছিলেন মুস্তফী মশাই আর ষড়যন্ত্রটি পাকিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির দুষ্টু ছেলেরা। জামাইবাবু শুধ্‌রেছিলেন কিনা জানা নেই।

"গিরিশবাবুর অভিনয় গগনবাবুরা পছন্দ করতেন না, দানীবাবুরও না। একটা কার্টুনেই প্রকাশ। তা না পছন্দ করুন, গিরিশবাবু মস্ত অভিনেতা ছিলেন। নীলধ্বজে গৈরিশী ছন্দের আবৃত্তির রেশ অনেকদিন কানে বাজত। আর চোখে ভাসত তাঁর চৌকো ভারী গাল দুটো যার প্রত্যেক পেশীটা তাঁর কথা শুনতো। প্রফুল্লর যোগেশ 'রানী মুদিনীর গলি' গাইছে। 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'

* গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের ভ্রাতা সমরেন্দ্রনাথ।—গ্রন্থকার

তিন বার তিন স্বরে উচ্চারণ করছে—এগুলো ভোলা যায় না। 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় মনে আছে।···জগাই-মাধাই গিরিশবাবু আর মুস্তফীমশাই। নন্দলাল-বাবুর (?) জগাই-মাধাই-এর রেখাচিত্র মনে হয় ওঁদেরই ছবি। কলসীর কানায় মহাপ্রভুর কপাল থেকে রক্ত ঝরছে, তবু কীর্তন চলছে, 'মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না'। জগাই-মাধাই-এর একজনের অনুতাপ এসেছে, অন্যের মুখে তখনও অসভ্য গালাগালি। মুখে গালি কিন্তু পা দুটো খোলের তালে তালে নাচতে আরম্ভ করেছে। নীচে থেকে যেন একটা ঢেউ উঠে শরীরটাকে দুলিয়ে দিলে, এ আমি দেখেছি। এবং একেই অভিনয় বলি।" ('মনে এলো' : 'দেশ', ২৪এ ডিসেম্বর, ১৯৫৫)

সমরেন্দ্রনাথ-কথিত অর্দ্ধেন্দুর 'প্র্যাক্‌টিকাল জোক্'-এর গল্পটি ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায় পাঠক পড়লেন। তাঁর 'প্র্যাক্‌টিকাল জোক্'-এর আর একটি গল্প কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। এবারের ষড়যন্ত্রটি পাকিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মহিমচন্দ্র-লিখিত গল্পটি পাঠক পড়ুন :—

"প্রায় ২২/২৩ বৎসর হইল, কলিকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে একটি ক্লাব ছিল—তাহার নাম ছিল 'খামখেয়ালী মজলিস'। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এক দিন করিয়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সুধীমহোদয়গণ বন্ধুবান্ধবসহ 'খামখেয়ালী-ভাবে' সাহিত্যালোচনা, সঙ্গীতচর্চা, নাটকাভিনয় ও হাস্যামোদে সন্ধ্যাযাপন করিতেন। প্রচ্ছন্নভাবে আর একটি উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল—বিলাতফেরতা-গণকে ইংরাজী পোশাক ছাড়াইয়া ধুতিচাদরে সুশোভিত করা—দেশীয় পরিচ্ছদ পরিয়া মেঝের উপর আসনে বসিয়া, করাঙ্গুলির সাহায্যে আহার করিতে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি দেওয়া। ঠাকুরবাড়ির সে সময়ের আহারের ঘটা এবং আহার্যস্থানের বাহার দেখিয়া স্বতঃই মনে হইয়াছিল, উহা ইংরেজি ডিনার এবং বিলাতি ডাইনিং টেবিলের মোহ অনায়াসেই বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে।

"একদিন খামখেয়ালী মজলিসের পক্ষ হইতে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম।

"যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, খামখেয়ালী মজলিসে গোল বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। রবিবাবু বিষণ্নমনে চিন্তাযুক্ত হইয়া বসিয়া আছেন—নিমন্ত্রিত অতিথিগণও সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া যাহা শুনিলাম তাহার মর্ম এই—

"রবিবাবু বঙ্গভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় স্বজাতীয়দিগের নিকট পত্র লেখেন

না। মিস্টার অমুক তখন একজন ঘোর সাহেব, তাঁহাকেও বাঙ্গালাতেই নিমন্ত্রণপত্র লিখিয়াছিলেন। সেই ভদ্রলোক এতদিন যে ঠিকানায় বাস করিতেন, কিছুদিন পূর্বে সে বাড়ি হইতে উঠিয়া অন্য বাড়িতে গিয়াছেন। মজলিসের খাতায় মিস্টার অমুকের যে ঠিকানা লেখা ছিল তাহা পরিবর্তিত হইয়াছে এ সংবাদ তাঁহার মজলিসে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা তিনি দেন নাই। যে দ্বারবান নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া বলিয়াছে, উক্ত ঠিকানায় এক ভদ্রলোক বাস করেন, তিনি নিমন্ত্রণপত্রখানি খুলিয়া তাহা পাঠ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—'ওঃ—রবীন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণ? বেশ বেশ। তিনি যে একজন খুব বড়লোক। কিন্তু সে বাবুটিত এখন এখানে থাকেন না, বাড়ি বদলেছেন। তা হোক্ গে, আমিই যাব এখন। আচ্ছা দারোয়ান, রবিবাবুকে বোলো, যে আমি ঠিক সময়ে আসবো।' দারোয়ানজী গোপনে আরও প্রকাশ করিয়াছে—বাবুটি বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিয়াছেন, এজন্য তথায় কোনও লোকের যাতায়াত পছন্দ করেন না। তাঁহার দ্বারবান ছাড়া অন্য কেহও বাড়ির হাতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না।

"রবিবাবু এইসকল কথা শুনিয়া, খোঁজ লইয়া তখন জানিতে পারিলেন যে মিষ্টার অমুক অন্য বাড়িতে আছেন। সেখানে পুনরায় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অদ্ভুত অপরিচিত বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে লইয়া কি করিবেন, এই ভাবিয়া অস্থির হইয়াছেন। যে লোক বিনা দ্বিধায় গায়ে পড়িয়া নিমন্ত্রণ লয়, সে কি রকম ভদ্রলোক? এবারকার মজলিসের আমোদটাই না মাটি হয়। এই আশঙ্কায় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণও বিষণ্ণ এবং কি উপায় হইতে পারে, তাহারই পরামর্শ হইতেছে।

"রবিবাবু তখন নিমন্ত্রিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যখন অমুক মহাশয় বাসস্থান পরিবর্তন সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে খামখেয়ালী মজলিসে জানান নাই, তখন এই আপদের জন্য তিনিই দায়ী। শাস্তিস্বরূপ আজ তাঁহাকে 'রবিবাবু' সাজিয়া, host-এর কার্য করিতে হইবে।

"অ-মহাশয় কিছু পূর্বেই আসিয়া পৌঁছাইয়াছিলেন, অগত্যা তিনি রবিবাবু সাজিয়া host-এর অভিনয় করিতে স্বীকৃত হইলেন।

"কিয়ৎক্ষণ পরে বারান্দার নিম্নে এক ছক্কর গাড়ি দাঁড়াইবার শব্দ পাওয়া গেল। আমরা উঠিয়া গিয়া গ্যাসের আলোকে দেখিলাম, তৃতীয় শ্রেণীর এক ভাড়াটিয়া গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ময়লা একখানা পুরাতন বালাপোষ মাথা হইতে পা পর্যন্ত দস্তুরমত মুড়ি দিয়া একজন তাহার মধ্য হইতে অবতরণ করিয়া, গ্যাসের আলোকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত পয়সা গণনা করিতেছে। সেই পয়সাগুলি

গাড়োয়ানকে দিবামাত্র তাহার সঙ্গে ঝগড়া বচসা বাধিয়া গেল। সে এক টাকার কমে লইবে না, ইনিও আটগণ্ডার বেশী দিতে চাহেন না। অবশেষে অনেক কথা-মাত্রার পর গলার জোরে পরাভূত হইয়া গাড়োয়ান আরও কিঞ্চিৎ পাইয়া প্রস্থান করিল। আমরা বুঝিলাম, সেই আপদ আঁসিয়া পৌছিয়াছে।

"চটিজুতা ফটাস্ ফটাস্ করিতে করিতে বৃদ্ধ তখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। আসিয়াই, তাঁহার ধূলিকণা-শোভিত ছেঁড়া চটিজুতা কোন্ স্থানে রাখিতে হইবে ইহাই উচ্চস্বরে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অমুকবাবু অর্থাৎ জাল "রবিঠাকুর" তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জুতাসুদ্ধই ভিতরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ এই সুশোভিত বৈঠকখানায় চটিজুতা লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন—'রাম বলেন রবি বাবু! এমন সাহেবী বৈঠকখানায় আমার চটিজুতা? ইহা কখনও হইতে পারে না।' অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির করিলেন, জুতাযোড়াটি দারোয়ানজীর হাওলা করিয়া রাখাই নিরাপদ।

"সভায় আসিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বসিয়া অর্থাৎ জাল 'রবিবাবুর' সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন, তোমারই নাম রবিঠাকুর? তা, তুমি বেশ পদ্য লেখ শুনেছি। আচ্ছা তোমার সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ হয়েছিল বল দেখি? আচ্ছা বোধ হয়—অমুক জায়গায় কি?—বলিয়া বৃদ্ধ কতকগুলি স্থানের ও ঘটনার নাম করিতে লাগিলেন যাহা কখনও রবিবাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল না—এমন কি তাঁহার জন্মিবার বহুপূর্বের ঘটনা। নিমন্ত্রিতগণ পরস্পরের মধ্যে গোপনে বৃদ্ধের আহাম্মুকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে লাগিলেন।

"তথাকথিত 'রবিবাবু'কে বৃদ্ধ 'ছিনাজোঁকের' মত ধরিয়া রহিলেন। তাঁহার সেকেলে রসিকতার প্রশ্নে ও মন্তব্যাদিতে অ—বাবুকে তো ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেনই, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা কেহ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিতেছেন, কেহ বা মুখ টিপিয়া টিপিয়া ঘৃণার হাসি হাসিতেছেন। হঠাৎ অ—বাবুর কিঞ্চিন্মাত্র পীত গেলাসটি (হুইস্কি পেগ কিনা জানি না) লইয়া বুড়ো ঢকঢক করিয়া গিলিয়া ফেলিলেন এবং আরও আনিবার জন্য পরিচারকগণকে আদেশ করিলেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই স্তম্ভিত।

"এতক্ষণে অ—বাবুর ধৈর্যচ্যুতি হইল। তিনি বিরাগভরে উঠিয়া গিয়া করযোড়ে আসল রবিবাবুকে বলিলেন,—'দোহাই আপনার, এ মুস্কিল হইতে আমায় আসান করুন। আমি আর পারিয়া উঠিতেছি না।' রবিবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'তাও কি হয়? আপনি যখন হোষ্ট সাজিয়াছেন, তখন এতদূর

আসিয়া সে দারিদ্র্য ঝাড়িয়া ফেলিবেন কি করিয়া? সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নাই।'

"অ-বাবু সেখান হইতে উঠিয়া বৃদ্ধের কাছে আর না গিয়া, গগনেন্দ্রবাবুর নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার আলবোলায় ধূমপান করিতে লাগিলেন। নাছোড়বান্দা বৃদ্ধ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নিতান্ত অশিষ্টভাবে আলবোলার নলটা অ-বাবুর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, 'এতক্ষণ তামাক না খেয়ে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে। আঃ—বেশ তামাকটি তো? গগনবাবু হাসিতে লাগিলেন। আর একটা আলবোলা আনাইয়া অ-বাবুকে দিলেন। ধূমপান করিতে করিতে বৃদ্ধের মাথাটি ঢুলিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম, আফিমখোর নিশ্চয়।

"ক্রমে 'আহার প্রস্তুত' বলিয়া পরিচারক আসিয়া উপস্থিত হইল। আহারের স্থান হইয়াছিল রবিবাবুদের বাড়িতে, ড্রইংরুমের পাশে। আমরা গগনবাবুর বাড়ি হইতে সিঁড়ি ভাঙিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়াছি। অ-বাবু বৃদ্ধের ভয়ে ভিড়ে মিশিয়া আগে আগে নামিতেছেন। তখন বৃদ্ধ ডাকাডাকি সুরু করিলেন—'ওগো রবিবাবু, আমাকে ফেলে তুমি যাচ্ছ কোথায়? আমি তোমাকে ধোরে ধোরে নীচে নামতে চাই। বুড়ো মানুষ সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে মরব?' সুতরাং অ-বাবুকে দাঁড়াইতে হইল। বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ধীরে ধীরে এই অবস্থায় চলিতে চলিতে, অ-বাবুর প্রতি বৃদ্ধ যেসকল 'বিদ্যাসুন্দরী' রসিকতা ঝাড়িতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া আমরা সকলেই মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বৃদ্ধ সহসা বাত্যাহত কদলীবৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। কেবল তাহা নহে। অ-বাবুর শালের অঞ্চল ধরিয়া, মিউনিসিপ্যালিটির রোলারের মত গড়াইতে গড়াইতে সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়া পৌঁছিলেন। কোনও মতে উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, আশ্রিত ব্যক্তিকে এরূপভাবে সিঁড়িতে গড়াইতে দেওয়ার জন্য অ-বাবুকে অতি করুণভাবে বিস্তর অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

"আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে আহারের স্থানে উপস্থিত হইলাম এবং স্ব স্ব স্থানে বসিয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ মহাশয় তখনও বারান্দায় দাঁড়াইয়া মুখ ধুইবার জল ফরমাইস করিতেছিলেন। জল পাইয়া সশব্দে মুখ ধুইয়া আহারের স্থানে আসিলেন। তথাকায় সজ্জা দেখিয়া তাঁহার মুখখানি আশ্চর্যরসের একটি প্রতিমূর্তির মত হইল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিলেন এবং জাল রবিবাবুকে (অ-বাবুকে) প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া অস্থির করিয়া তুলিলেন। কখনও

হাস্তরস, কখনও করুণরস এবং কখনও দর্পরসের অভিনয় চলিতে লাগিল। 'এত ফুল, এত পাতা, এত পাথরের বাটী, গ্লাসের বাটী আর এতখানা পাথরের ঝকঝকি, এসমস্ত জোগাড় করা কি সোজা কথা ?' এইরূপ নানা মন্তব্য প্রকাশের পর তিনি জাল রবিবাবুর পার্শ্বের আসনে আহারার্থ বসিয়া গেলেন।

"বসিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন 'গিন্নী বলে দিয়েছেন তাঁর জন্য ভাল খাবার কিছু ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেতে। একখানা সরা চাই মশাই—এখনই চাই, কারণ গিন্নী রোজ পূজো আহ্নিক করেন কি না।' অ-বাবু তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া এমনিভাবে কঠোর দৃষ্টিপাত করিলেন যে, আমার মনে হইল তিনি বুঝি চপেটাঘাত করিয়া বসেন।

"একজন পরিচারক একখানি সরা লইয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ উভয়পার্শ্বস্থ অতিথিগণের পাত হইতে টপাটপ মিষ্টান্ন তুলিয়া সরা বোঝাই করিতে লাগিলেন।

"সরাটি সামনে নামাইয়া রাখিয়া, বৃদ্ধ তখন নিজ গাত্র হইতে সেই ময়লা বালাপোষ খানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং যোড়হাতে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন —'মহাশয়গণ আমাকে মাপ্ করবেন। আপনাদের সকলকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছি— আর না। এবার নিজের প্রকৃত পরিচয় দিই—আমি আপনাদের সেই অর্দ্ধেন্দুশেখর।'

"আমরা সকলে দেখিয়া অবাক্—বুঝিতে পারিলাম, বৃদ্ধ আর কেহ নহেন, কলিকাতা রঙ্গমঞ্চের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। মেঘের পিছনে 'রবি' আমাদিগকে 'দিনকানা' করিয়া দিয়াছিলেন এবং খামখেয়ালী মজলিসকে আজ একটা অভিনব আমোদ দিবার জন্য তিনি অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই অপূর্ব অভিনয়টির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুবাবুর অপরিচিত অ-বাবুকেও, তাঁহার তদানীন্তন সাহেবীয়ানার জন্য একটু জব্দ করার উদ্দেশ্য ছিল। বিলাতফেরত ইঙ্গবঙ্গগণকে সুপথে আনয়নও খামখেয়ালী মজলিসের একটা কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত ছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

"...আমরা পাঠদ্দশায় মুস্তফী মহাশয়ের রঙ্গরসের সমুদ্রে অনেক ঢেউ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি। থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁহার নাম থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই উপস্থিত হইতাম। সেই মুস্তফীকে অদ্য সশরীরে পাওয়া গিয়াছে। তিনি অ-বাবুর নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিলেন; অ-বাবু তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং পদধূলি পর্য্যন্ত লইলেন বলিয়া আমার স্মরণ হইতেছে।

"সেদিন খামখেয়ালী মজলিসের কি বাহার যে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

আহারের ঘটা ছিল বাছা বাছা দেশীয় খাদ্য। কাশ্মীর, বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ রন্ধন ছিল এবং ছোট বড় গ্লাসে মাদকদ্রব্যের পরিবর্তে নানাদেশীয় সরবতে বরফ সহযোগে শীতল পানীয় ছিল। নানাদেশীয় পুষ্পপত্রের দ্বারা আহার স্থানের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র (miniature) একটি বাগান; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রপুষ্পে সুশোভিত।

"অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী আহারান্তে তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত 'ডাক্তারখানা' অভিনয় করিলেন।..."( 'অর্দ্ধেন্দু প্রসঙ্গ' : 'মানসী ও মর্মবাণী', পৌষ ১৩২৭ )

ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক-মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ একবার অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এতটা স্টেজ-ফ্রি অ্যাক্টরের সঙ্গে মঞ্চে নেমে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়, স্বচ্ছন্দে নিজের অভিনয় করার ব্যাঘাত হয়।'*

এই সময়েই অর্দ্ধেন্দুশেখরের সাধারণ মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' অভিনয় করবার জন্যে সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে তরুণ সৌরীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। সৌরীন্দ্রমোহন নগেন্দ্রনাথের দৌহিত্র, সেই কারণে তিনি নটচূড়ামণির স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলেন।

সৌরীন্দ্রমোহন এই সম্পর্কে লিখেছেন :

"সাহিত্যে আমার অনুরাগ এবং রবীন্দ্রনাথের উপর ভক্তির কথা শুনে তিনি আমাকে বলেছিলেন—রবির বই অভিনয় করতে আমার খুব ইচ্ছা। তা ছাখো, পারো তাঁর 'চিরকুমার সভা' বইটিকে নাটকের ছাঁচে দৃশ্য বিভাগ ক'রে link up ক'রে গেঁথে দিতে? শক্ত হবে না। নাটকের ধরণে বইটি লেখা...শুধু দৃশ্য বিভাগ করা link রেখে...পারো যদি ছাখো...আমি তাহলে তার অভিনয় করাবো মিনার্ভায়। রসিকের-এর ভূমিকায় নামবো...আমার ইচ্ছা।

"তাঁর এ-কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি খাতা বেঁধে 'চিরকুমার সভা'কে অভিনয়ের ছাঁচে দৃশ্যাদি সাজিয়ে কপি তৈরি করেছিলুম। প্রায় দু-তিন মাস সময় লেগেছিল। কাজ শেষ করে খাতা নিয়ে গেলুম তাঁর কাছে। দেখে তাঁর কি আনন্দ! খাতা রেখে দেওয়া নয়...বললেন, বসে পড়ো—আমি শুনি।

"তখনি বসে আমাকে পড়ে শোনাতে হলো। শুনে তিনি খাতাখানি রেখে দিলেন...বললেন—কর্তাদের দেখাবো...তাঁদের সঙ্গে কথা বলবো—তুমি পরের রবিবারে দুপুরবেলায় এসো। আমি তাঁর এ আদেশ পালন করেছিলুম। আমি

* এই তথ্যটি সংগৃহীত ইন্দ্রমিত্রের 'সাজঘর' থেকে। ইন্দ্রমিত্র তথ্যটির উৎস নির্দেশ করেন নি।

যেতে তিনি বললেন—ভাখো, আমি অনেক ভেবেছি…এ বই-য়ের অভিনয় হবে না। কেন না, নীরবালা, নৃপবালা, শৈলবালা—এ সব ভূমিকা কে অভিনয় করবে ? চেহারা—ভাবভঙ্গী—চলাফেরা…উঁহু, আমি অনেক ভেবেছি…এদের মানাবে না…এদের দিয়ে হবে না।

"আমি বললুম—আপনার শিক্ষায় হবে না ?

"—না। তিনি বললেন—জগত্তারিণী হতে পারে। কিন্তু অক্ষয়…কে গান গাইবে ? চন্দর—কে ও আত্মভোলা সরল মানুষটিকে রূপ দেবে ?* তার উপর এমন চেস্ট হিউমার…বাঙলার দর্শক এ সূক্ষ্মরস বুঝবে না। তারা মোটা কথা ছাড়া বুঝতে পারবে না। গ্যালারির উপর থিয়েটারের জান্, সে গ্যালারিতে লোক হবে না। Time has not yet come, my boy, তাঁর শেষের এ ইংরেজি কথাগুলি আমার আজো মনে আছে। তাঁর এ-কথা রবীন্দ্রনাথের কাছে বলেছিলুম—১৯১১ সালে,…" ( 'অর্দ্ধেন্দুশেখর' : 'সচিত্র শিশির', চৈত্র ১৩৬১ )

আবার মিনার্ভা থিয়েটারের কথায় ফিরে আসি। এই সময়ে মিনার্ভার প্রেক্ষাগৃহ বৈদ্যুতিক পাখায় সজ্জিত হয়। ২৮এ এপ্রিল তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় সংবাদটি পরিবেশন করা হলো। কর্তৃপক্ষ জানালেন—

For the convenience of the audience in this sultry weather the entire pavillion has-been fitted up with Electric fans at an enormous cost.

সেদিন ( ২৮এ এপ্রিল ) 'সিরাজউদ্দৌলা'-র অভিনয় হয়। ৯ই মে, বুধবার, পাণ্ডবগৌরব, দোললীলা আর রামনারায়ণ তর্করত্নের 'চক্ষুদান' অভিনীত হয়।

১ই জুন 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্র একটি বিশেষ সংবাদ ঘোষণা করেন—

---

* পরবর্তীকালে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এই আত্মভোলা সরল মানুষটিকে রূপ দিয়ে মঞ্চে জীবন্ত করে তুলেছিলেন (১৯৩০ খ্রীঃ)। এ সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহনই অন্যত্র লিখে গেছেন : "চন্দ্রবাবুকে তিনি প্রথম জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তুললেন—চিন্তাশীল দার্শনিক, ছোট বড় নানা বিষয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং ভয়ানক আত্মভোলা মানুষ অর্থাৎ রীতিমত cultured মেক আপে তাঁকে দেখতে হয়েছিল—দার্শনিক ব্রজেন্দ্র শীল টাইপের মতো। চন্দ্রবাবুর সে অভিনয় দেখে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অবনীন্দ্রনাথ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে শিশিরকুমারকে আলিঙ্গন করেছিলেন।" ('শিশিরকুমার' : 'গন্ধভারতী' আষাঢ়, ১৩৬৮ )

MINERVA THEATRE—We beg to draw the attention of the reader to the announcement made elsewhere that Messrs. Tilak and Khaparde will attend the performance at the Minerva Theatre this evening.

সে রাত্রে মিনার্ভায় 'সিরাজউদ্দৌলা'-র অষ্টাবিংশতিতম অভিনয়ে টিলক মহারাজ, খাপার্দে, ডঃ মুঞ্জে এবং অন্যান্য লোকবিশ্রুত ব্যক্তির বিশিষ্ট দর্শকরূপে উপস্থিত থাকার সংবাদ রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও 'বেঙ্গলী' কাগজে (৯ই জুন, ১৯০৬) নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়:—

The Minerva Theatre
6, Beadon Street, Calcutta
Saturday the 9th June at 9 P.M. sharp
The Twenty-Eighth performance of
G. C. Ghose's Historical Drama
SERAJUDDOWLA
Karim—Girish Chandra Ghosh
Next-day, Sunday, at Candle-light
I. Bunkim Chandra's grand master-piece

DURGESH NANDINI
OR
The Chieftain's Daughter
II. ALIBABA
III. THE MINERVA BIOSCOPE
All new pictures throughout

A. S. Mustaphi, Master. G. C. GHOSH Manager.

"In honour of the venerable Moharastra Patriots Srijut Balgangadhar Tilak of Poona, Sri Krishna Kaparde of Amraoti, Dr. Munje of Nagpore and other distinguished and renowned visitors who have kindly consented to grace our pavillion with their presence."

অপরেশচন্দ্র লিখছেন:

"যেদিন তিলক রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন সে দিনের দর্শক বোধ হয় বিস্মৃত হন

নাই—তিলক মহারাজ রয়েল বক্সে প্রবেশ করিবামাত্রই সমগ্র দর্শকের কণ্ঠোচ্চারিত 'বন্দেমাতরম্' শব্দে রঙ্গমঞ্চ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। দর্শকবৃন্দ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া, গিরিশচন্দ্র তখন রঙ্গমঞ্চের উপর করিমচাচার অভিনয় করিতেছিলেন, তিনি সেই অবস্থাতেই নতজানু হইয়া তিলককে অভিনন্দন করিলেন। তিনি সেদিন ইংরাজিতে এই মান্য অতিথির অভিনন্দনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কাহারও মনে আছে কিনা জানিনা, দুঃখের বিষয় তাঁহার কোন জীবনী লেখকও তাহা লিখিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করেন নাই।" ('রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর')

থিয়েটার প্রসঙ্গে টিলক মহারাজের কথা উঠলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের 'অর্দ্ধেন্দু-কথা'-ও মনে প'ড়ে যায়। শাস্ত্রী মশায় উক্ত স্মৃতিকথায় অর্দ্ধেন্দুশেখর সোলো অ্যাক্‌টিং-এ যে কি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তার পরিচয় দিয়ে লিখছেন :

"একবারের একটা কথা বড়ই মনে পড়িতেছে—সেটা আলবার্ট হলে। তিলক আসিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আলবার্ট হলে সভা বসিয়াছে, স্টেজ হইয়াছে, নানারূপ আমোদপ্রমোদ ও কৌতুক হইতেছে। অর্দ্ধেন্দুবাবু একাই একটা ডিস্‌পেন্সারী সাজিয়াছেন। অতি কাতরস্বরে ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁচিঁ করিতে করিতে ডাক্তারের কাছে গিয়া আপনার কষ্টের কথা বলিতেছেন, আবার ডাক্তার হইয়া ভঙ্গী করিয়া রোগী দেখিতেছেন, রোগীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর টেবিল হইতে কাগজ লইয়া প্রেস্কৃপ্‌শন লিখিতেছেন; আবার কম্পাউণ্ডার হইয়া 'এস' বলিয়া রোগীকে ডাকিতেছেন আর ঔষধ দিতেছেন—বলিতেছেন, 'এ কাগজখানি হারিও না, আবার যখন আসবে কাগজখানি হাতে করে এস।' ঔষধ দিতেছেন সেই এক ক্যাস্টর অয়েল। একজন রোগী চিৎকার করিতে করিতে আসিল, দাঁত কট্‌কটানিতে সে মারা যাইতেছে, সে কখন মুখে হাত দেয়, কখন কাঁদে, কখন যন্ত্রণায় বসিয়া পড়ে। ডাক্তার হাত দেখিলেন, পেট টিপিলেন, আর ক্যাস্টর অয়েল ব্যবস্থা করিলেন। কম্পাউণ্ডার বলিলেন —এস। খানিক ক্যাস্টর অয়েল একটা শিশিতে ঢালিয়া দিলেন। রোগী বলিল, 'আমার হয়েছে দাঁতে শূল, আপনি জোলাপ দিলেন যে?' কম্পাউণ্ডার খাদে গলা তুলিয়া বলিলেন' 'ওতেই আরাম হবে।' এইরূপ কত রোগী আসিল —সবই একসুর, একই রকম চিকিৎসা, একই রকম ঔষধ। হলসুদ্ধ লোক হাসিয়া অস্থির।

"ডিস্পেন্সরী কাণ্ড শেষ হইয়া গেলে অর্দ্ধেন্দুবাবু তিন তোতলার নকল করিতে বসিলেন। একটা তেমাথার পথে একটা রকের উপর দুই তোতলা

বসিয়া আলাপচারী করিতেছে, এমন সময়ে আর একজন তোতলা আসিয়া তাঁহাদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ম-ম-মশায়, মাঝের পাড়ার ম-ম-মহিম চক্রবর্তীর বাড়ি কোথায় যাব ?' সে লোকটা 'ম'-এ তোতলা। ম বলিতে গেলেই ম-ম-ম-মকার। দুজনের মধ্যে একজন বলিল, 'এই যে বাঁ-আ দিকের রা-রাস্তা দেখছেন, ঐ রাস্তা ধ'রে শুঁ-উঁ-উঁ-ড়ীদের পুকুর দেখতে পাবেন। সে পুকুরের বাঁ-আঁ-দিকে সি-ই-ইংগিওয়ালা বাড়ি চ-অ-অক্রবর্তী মশায়ের।' এ লোকটা আনুনাসিকে তোতলা, আর তালব্য বর্ণে তোতলা। যে আসিয়াছিল, সে লোকটা মনে করিল আমায় ভেঙাইতেছে। সে বড়ই রাগ করিয়া উঠিল, আর বলিল, 'ম-ম-শায়, আমা-মারই যেন গলার দোষ আছে। তাই বলে কি ম-মশায়ের তামা-মা-আসা করা উচিত ?' তাই শুনিয়া তৃতীয় তোতলা মধ্যস্থ করিতে আসিয়া বলিল—'মশায় র্‌ র্‌ র্‌ রাগই ক র্‌র্‌ রেন কেন। আপনার-র-রও যেমন একটু গলার র্‌ র্‌ দোষ আছে, এনার্‌রও তেমনি একটু আছে।' হলসুদ্ধ লোক ত হাসিয়া অস্থির।" ('মানসীও মর্মবাণী', কার্তিক, ১৩২৭)

১৬ই জুন গিরিশচন্দ্রের 'মীরকাশিম' খোলা হয়। ঐদিনের বেঙ্গলী' সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য :—

The Minerva Theatre
6, Beadon Street, Calcutta.
Proprietor—Babu Manmohan Pande.
Saturday, the 16th June, at 9 P.M. Sharp
The grand opening performance of
G. C. Ghose's new Historical Drama
MIR KASIM
on a scale unprecedented in the
annals of the Indian Stage.
Mir Zafar—Girish Chunder Ghosh
(my humble self)

The years which followed the occasion of Mir Kasim to the throne of Bengal from the most wonderful and stirring period in the history of our country. I have spared no pains to do full justice to the character and achievements of the great personages who played such prominent parts on the political stage of the period. I leave it to my countrymen—Hindus and

Mussalmans to judge how far I have succeeded in my attempt.

The full strength of the Company will appear.

Next day, Sunday at Candlelight

I. DURGESH-NANDINI

II. ALIBABA

III. THE MINERVA BIOSCOPE

A. S. Mustaphi — Master

G. C. GHOSH — Manager

মীরজাফরের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র আর মীরকাশিমের ভূমিকায় তাঁর পুত্র দানীবাবু নেমেছিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর এ-নাটকে একাই তিনটি চরিত্রে রূপদান করেছিলেন—হলওয়েল, হে ও মেজর অ্যাডাম্‌স্‌। শেষোক্ত ভূমিকাভিনয় সম্পর্কে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"গিরিশচন্দ্রের 'মীরকাশিম' নাটকে মেজর অ্যাডাম্‌স্‌-এর ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে তখনকার ইংরেজের দর্প মূর্ত হয়ে উঠেছিল। মীরজাফরকে সামনে রেখে ইংরেজের চক্রান্ত কি করে সিদ্ধ হয়েছিল···নাট্যকার যেমন নির্ভীক তুলির লেখায় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তেমনি সে ইঙ্গিত রূপ পেয়েছিল অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে। ইংরেজের আইন বাঁচিয়ে এ ইঙ্গিত—অর্দ্ধেন্দুশেখরের এ অভিনয়ে তার মর্ম চিন্তাশীল দর্শক চমৎকার উপলব্ধি করেছিলেন।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর' : 'সচিত্র শিশির', চৈত্র ১৩৬৩)

৯ই সেপ্টেম্বর অতুলকৃষ্ণ মিত্রের অপেরা 'শিরী-ফরহাদ' খোলা হয় আর ১২ই সেপ্টেম্বর বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নবরূপে মঞ্চস্থ হয়। শেষোক্ত নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুখুয্যে মশায় সেজেছিলেন। ৮ই ডিসেম্বর ডি. এল. রায়ের 'দুর্গাদাস' এর প্রথম অভিনয়। তারপর বড়দিনের বড় আসর বসে। প্রোগ্রাম ছিল এই রকম :—

২৩ এ ডিসেম্বর—সংসার

২৪ এ ডিসেম্বর—সিরাজউদ্দৌলা

২৫ এ ডিসেম্বর—দুর্গেশনন্দিনী, আলিবাবা ও বেল্লিকবাজার

২৬ এ ডিসেম্বর—মীরকাশিম

২৮ এ ডিসেম্বর—শিরী-ফরহাদ

২৯ এ ডিসেম্বর—দুর্গাদাস

৩০ এ ডিসেম্বর—বলিদান ও আলিবাবা

১৯০৭ খ্রীঃ। ইংরেজি নববর্ষে (১লা জানুয়ারি ১৯০৭; ১৭ই পৌষ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ) গিরিশচন্দ্রের 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' দিয়ে মিনার্ভার আসর জমে ওঠে। সে রাতে কর্তা হারাধনের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর নামলেন। দ্বিতীয় রাত্রি থেকে (৬ই জানুয়ারি) দানীবাবু হারাধন সাজতে লাগলেন। ১৮ই মে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'লুলিয়া' খোলা হয়। অতুলবাবুর এই সব অপেরার রিহার্সালের ভার থাকত অর্দ্ধেন্দুশেখরের ওপরই। তাঁরই শেখানোর গুণে এই সব পালা আসর জমিয়ে দিত।

অতঃপর ১লা জুনের অমৃত বাজার পত্রিকার পাতায় স্টার আর মিনার্ভার বিজ্ঞাপন দেখে নাট্যজগৎ সরগরম হয়ে উঠল। দুই থিয়েটারেই 'প্রফুল্ল'; স্টারে ১লা জুন আর মিনার্ভায় ২রা জুন। পত্রিকার পাতা থেকে উভয় থিয়েটারের বিজ্ঞাপন উদ্ধার ক'রে দিই:—

A Sudden Surprise
A Rich Revival
after
more than 14 years!
STAR THEATRE
Saturday, 1st June, at 9 P.M.
The best original Domestic Tragedy
of
Girish Babu's Prafulla
Impressive than sermon and speech
Lecture and Lesson, essay and Aphorism
is
A powerful Dramatic Representation!
come yourselves!
Bring your Mothers and Wives, Sisters
and Daughters, Brothers and Sons, Friends
and Foes (if possible)
To see and show
The vividly Living convincingly sparkling
Pictures of Men and Women in various shades.

of circumstances and situations, sentiments and action ! ! !

The play is artistically realistic !

| | |
|---|---|
| Jogesh Babu | Amritalal Mitter |
| Romesh ,, | Amrita Lal Bose |
| Suresh ,, | Kashinath Chatterjee |
| Bhaja Hari | Amarendro Nath Dutta |
| Pitamber | Mohendro Master |
| Prafulla | Sm. Kusum Kumari |
| Uma Sundari | Sm. Khetter Moni |

Nextday, Sunday at Candlelight

Last Night ! Last Night !

of

CHANDRASEKHAR

| | |
|---|---|
| Chandrasekhar | —Babu Amrita Lal Mittra |
| Pratap | —Amarendro Nath Dutta |
| Mr. Foster | —Amrital Lal Bose |
| Biswas | —Kashi Nath Chatterjee |

AMRITALAL BOSE
Manager.

* * *

Great sensation—Happy news—Grand revival
Appearance of G. C. Ghosh after a long time

MINERVA THEATRE

6, Beadon Street
Proprietor Babu Manmohan Pande
Saturday the 1st June at 9 P.M. Sharp
The third grand performance of Babu Atul Krishna Mittra's highly successful Opera

LULIA

Superbly staged—Magnificently mounted

LULIA

The first spectacular opera represented on the Indian Stage.

The splendid and magnificent scenery and the gorgeous and beautiful dances the like of which

has enchanting songs, set to tune by Prof. Deb Kanto Bagchi and novel and fascinating dances arranged by Sreeman Nripendro Chunder Bose, and a combination of all the leading artists of the day, have all contributed towards making our performance

A Phenomenal Success

N. B. The entire pavillion including the Zenana seats, have been fitted with electric fans.

Nextday—Sunday—at candle light

For one night only

A most agreeable surprise—A most unexpected Combination—

A most extraordinary Programme ! ! !

I. G. C. Ghose's highly admired social Tragedy

PRAFULLA

A thrilling performance of a genuine drama by a unique combination of the veterans of the Calcutta Stage

Jogesh—Girish Ch. Ghose (my humble self)
Romesh—Mr. Ardhendu Sekhur Mustafee
Suresh—Sreeman Surendra Nath (Dani Babu)
Sibnath—Preonath Ghosh
Bhojohari—Akhoy Kumar Chakravorty
Kangali Charan—Nripendro Ch. Bose
Jnanada—Miss. Tincowri
Prafulla—Miss. Sushilabala
Uma Sundari—Miss. Prokashmony.

I take this opportunity of informing my numerous patrons and well-wishers that thanks to their benevolent wishes, and grace of our Almighty Father, I have full (y) recovered from the illness from which I had been suffering more or less for the last eight months, and shall appear, after a long time in the role of Jogesh on Sunday evening.

That evergreen Comic Opera

ALIBABA

Abdala—Nripendro Ch. Bose

A. MUSTAFI — Master

G. C. GHOSH — Manager.

মাস দু'য়েক আগেকার ঘটনা। এপ্রিল মাসে গোপাললাল শীল এস্টেটের ক্লাসিক থিয়েটারের বাড়ি প্রকাশ্য নিলামে ওঠে। একলক্ষ আট হাজার টাকায় শরৎ রায় সে বাড়ি কিনে নিয়ে সেখানে কোহিনুর থিয়েটার খুলেছেন।

অপরেশচন্দ্র তখন অবৈতনিক হিসেবে স্টারের সঙ্গে যুক্ত। তিনি সহকারী ম্যানেজার হয়ে কোহিনুরে চলে এলেন। দলগঠন ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে শরৎবাবু আর অপরেশবাবু স্টারের অন্যতম অংশীদার অমৃতলাল বসুর কাছে গেলেন। অমৃতলাল বললেন—নতুন লোক শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে দল তৈরি কর।

অপরেশবাবু বললেন—তাহলে আপনিই আমাদের আচার্য হয়ে দল তৈরির ভার নিন্।

অমৃতলাল ছ'মাসের সময় চাইলেন।

শরৎবাবু বললেন—আমরা ছ'মাস অপেক্ষা করতে পারব না, যদি একমাসের নোটিশ্ দিয়ে আসতে রাজি হন, ছ'হাজার টাকা বোনাস্ আর আপনার মর্যাদার অনুরূপ অ্যালাওয়েন্স দিতে প্রস্তুত আছি।

অমৃতলাল বললেন—দেখুন এতগুলো টাকা একসঙ্গে পেলে আমার খুব উপকার হয় বটে কিন্তু হঠাৎ স্টার কি ক'রে ছেড়ে যাই? আপনারা যদি অপেক্ষা করতে না পারেন তো অন্য চেষ্টা দেখুন।

যাওয়া হলো গিরিশচন্দ্রের কাছে। তিনি বললেন—একা গিয়ে নতুন দল গড়বার মতো স্বাস্থ্য ও বয়েস আমার নেই, আর সে-ভাবে নতুনদল গড়তে সময়ও লাগবে বছরখানেক, খরচও হবে বড় কম নয়। তার চেয়ে তোমরা অন্য সব থিয়েটার থেকে বেছে বেছে লোক ভাঙিয়ে আনো। আর, আমি একা গেলেও, আমার হাতে কোন বই মজুদ নেই—আমার ছত্রপতি মিনার্ভায় রিহার্সালে পড়েছে—সে বই ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই।

গিরিশবাবুর ইঙ্গিত গ্রহণ করা হলো। শরৎবাবু দু'হাতে টাকা ছড়াতে

লাগলেন। লোক ভাঙাবার পালা শুরু হলো। ক্ষেত্রা মিত্তির তো আগেভাগেই এসে জুটেছেন; তিনি তখন কোনও থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ক্ষীরোদ-প্রসাদ তখন স্টারের নাট্যকার, তাঁকে সেখান থেকে ভাঙানো হলো। ন্যাশনাল থেকে রানুবাবু ও তারাসুন্দরীকে; মিনার্ভা থেকে দানীবাবু, হাঁদুবাবু, মণ্টুবাবু, তিনকড়ি আর কিরণবালাকে। দানীবাবুকে ভাঙিয়ে আনতে তিনহাজার টাকা বোনাস লাগল। তিনকড়ি আর তারা প্রত্যেকে হাজার টাকা ক'রে নিয়েছিলেন। সর্বশেষে গিরিশচন্দ্রকে দশহাজার টাকা বোনাস ও মাসিক পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে আনা হলো।

মিনার্ভা টলমলায়মান। পাঁড়েমশায় বেসামাল। মহেন্দ্র মিত্র গিরিশবাবুর কাছে ধর্ণা দিলেন। গিরিশবাবু বললেন—এতগুলো টাকার মায়া কেমন ক'রে ছাড়ি বল? তোমরা তার চেয়ে এক কাজ কর। এ সময় যদি কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারে, তো সে একমাত্র অমর। তোমরা তাকে স্টার থেকে ভাঙিয়ে আনো।

গিরিশবাবুর উপদেশে মহেন্দ্রবাবু অমরদত্তকে ধ'রে পড়লেন। অমরবাবু ছ'হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে ১৪ই জুলাইয়ের পর কুসুমকে সঙ্গে নিয়ে স্টার থেকে মিনার্ভায় চলে এলেন।

২০এ জুলাই তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় মিনার্ভার তরফ থেকে নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো—

A most welcome news—A most agreeable surprise
A rare combination of all the talents and veterans of the Indian Stage who have won their laurels in hundred fields

We have great pleasure in announcing to the public that Babu Amarendro Nath Dutt who requires no introduction at our hands and that versatile and well known actress Sm. Kusum Kumari have joined our theatre from this week under a permanent arrangement and will henceforth regularly continue to entertain our patrons and friends from the boards of the

MINERVA THEATRE
6, Beadon Street
Proprietor—Babu Manmohan Pande

Saturday the 20th July at 9 P.M. sharp
The tenth grand performance of Babu Atul Krishna Mittra's highly successful opera

LULIA

Whose unprecedented success and Undying charms is the talk of the whole town
Nextday—Sunday at candle light

SIRAJUDDOWLA

*OR*

The last independent Nawab of Bengal
Siraj—Amarendro Nath Dutt
Johara—Miss. Kusum Kumari
Lutfunnisha—Miss. Sushilabala

II: Followed by G. C. Ghose's latest pantomime

JAISA-KA-TAISA

*OR*

Rightly served
Sparkling Wit and genial humour from start to finish

A. N. Dutt — Asstt. Manager
G. C. Ghosh — Manager

২৭ এ জুলাই-এর পর গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দিলেন। ৩১ এ জুলাই থেকে অমর দত্তর নাম ম্যানেজাররূপে বিজ্ঞাপিত হতে থাকে।

১১ই অগাস্ট ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' নাটক দিয়ে মহাসমারোহে কোহিনুর থিয়েটারের উদ্বোধন হলো।

এদিকে মিনার্ভায় অমর দত্তর যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ ক'রে বাড়িতে বসে রইলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে, শিক্ষকের পদে সাদরে বরণ ক'রে, ২৪ এ অক্টোবর থেকে তাঁকে মিনার্ভায় নিয়ে এলেন। অর্দ্ধেন্দু-অমর মিলন-কাহিনী অমরেন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই পাঠক পড়ুন:—

"আত্মীয়-স্বজনের উপরোধ অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া, আপনার উন্নতি অবনতির প্রতি একেবারে অমনোযোগী হইয়া, ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল পথ কণ্টকাবৃত করিয়া যখন নাট্যভূমির উন্নতিকল্পে আত্মসমর্পণ করিলাম, তখন একে একে সকল নাট্যরথীর সহায়তা আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। কেবলমাত্র

অর্দ্ধেন্দুবাবুর সংস্রবে আমি আসি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আমার একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল—তিনিও আমার চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা প্রাণের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছিলেন। গত বৎসর মিনার্ভার বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী সুহৃদপ্রবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের সাদর আহ্বানে আহূত হইয়া যেদিন মিনার্ভার অধ্যক্ষের পদ, আসিয়া গ্রহণ করিলাম, সেইদিন শুনিলাম অর্দ্ধেন্দুবাবু মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাড়িতে বসিয়া আছেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম, তিনি নাকি আমার ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। একথা শুনিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলাম; একটা অবসাদের ছায়া আসিয়া সমস্ত প্রাণটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার কিছুদিন পরেই বন্ধুবর মনোমোহনবাবুকে সঙ্গে লইয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম; সেদিনের কথা আমি সারা জীবনেও ভুলিতে পারিব না। তিনি তখন স্নান করিতেছিলেন, আমি কলের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলাম,—'সাহেব! আমি এসেছি!' তিনি আমার দিকে চাহিলেন, একটু হাসিলেন, পরে বলিলেন, —'কে অমর! আজ আমার কি ভাগ্যি!' তারপর সকলে আসিয়া আমরা তাঁহার বসিবার ঘরে একত্রিত হইলাম। মনোমোহনবাবু বলিলেন,—'সাহেব! অমরবাবু আপনাকে নিতে এসেছেন, আজ থেকে আপনাকে থিয়েটারে যেতে হবে।' আর কথা নাই, আর তর্ক নাই, আর বাদানুবাদ নাই, সরলতার আধার, শিশুহৃদয়ের পরিচায়ক অর্দ্ধেন্দুশেখর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তখনি বলিলেন,— 'তার আর কথা কি? অমর যখন এসেছে, তখন নিশ্চয় যাব।' সেই দিন হইতে অর্দ্ধেন্দুবাবুর সহিত আমার কর্মজীবনের প্রারম্ভ হইল। যে কয়মাস উভয়ে একত্র ছিলাম, কখনও একদিনের জন্য বিন্দুমাত্র মনোমালিন্য ঘটে নাই, চিত্তে কোনওরূপ বিকার উপস্থিত হয় নাই, পরস্পরের সহানুভূতির এতটুকুও ব্যতিক্রম হয় নাই; আমিও মুক্তকণ্ঠে বারংবার তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছি, 'সাহেব! আপনার মত সরলপ্রাণ খুব অল্পই দেখিয়াছি।' তিনিও বহুবার আমায় বলিয়াছেন,— 'অমর! তোমার মত বন্ধুর সংস্রবে কখনও আসি নাই।' (১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ; দ্রঃ রমাপতি দত্ত প্রণীত 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ', পৃ. ৪২৮-৪২৯)

অর্দ্ধেন্দুশেখর ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ২৪এ অক্টোবর তারিখে মিনার্ভায় পুনরায় যোগদান করলেন এবং ২৭এ অক্টোবর যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

২৪এ অক্টোবর তারিখের 'বেঙ্গলী' কাগজে মিনার্ভা থিয়েটারের তরফ থেকে নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় :—

MINERVA THEATRE

6, Beadon Street

Saturday, the 26th October, at 9 P. M.

for one night only

Babu Atul Krishna Mitra's fine Opera

SEREE FARHAD

Hamjad—Mr. N. Bose Gulbahar—Miss Kusum

II. ALIBABA

Abdala—Mr. N. Bose Morjina—Miss. Kusum

Next day, Sunday at 7 P. M.

Babu G. C. Ghose's Grand Tragedy

I. PROFULLA

Jogesh—Babu Ardhendu Sekhar Mustafi

Kangali Charan—Mr. N. Bose

Profulla—Miss. Kusum Kumari

II. HIRANMOYEE

Amala—Miss. Kusum Kumari

A. MUSTAPHI

Master

A. N. Dutt
Manager

M. M. PANDE
Proprietor

২রা নভেম্বর তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, ৩রা নভেম্বর 'দুর্গাদাস' নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমরেন্দ্রনাথ সংযুক্ত হয়ে অভিনয় করেন। অর্দ্ধেন্দু রাজসিংহ ও অমরেন্দ্রনাথ দুর্গাদাস সাজেন।

Utmost Attraction ! !

MINERVA THEATRE

6, Beadon Street

Saturday, the 2nd November 1907, at 9 P. M.

Babu G. C. Ghose's Sensational National

Drama

CHHATRAPATI

The greatest Hero of Hindusthan !
Strong Caste, Splendid Songs and Situation,
Superfine Songs and Dances
History histrionically depicted, artistically
reproduced and meritoriously represented
Shivaji—Amarendro Nath Dutt
To be followed by that evergreen comic Opera

ALIBABA

Abdala—Nripendro Chunder Bose
Marjina—Miss. Kusum Kumari
Nextday, Sunday, at Candle-light
Mr. D. L. Roy's historical drama

DURGADAS

Durgadas—Amarendro Nath Dutta, Raj Singh—Mr. Mustafi, Aurangzeb—Preonath Ghosh, Tahabar Khan—Nripendro Ch. Bose, Dileer Khan—Tarak Nath Palit (amateur),
Rajeeah—Miss. Kusum Kumari
To be followed by that excellent Opera

SHIREE FARHAD

Songs and Dances—from top to toe
come early and enjoy
A. MUSTAPHI
Master

A. N. Dutt
Manager

M. M. PANDE
Proprietor

১৭ই নভেম্বর 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর মীরজাফর আর অমরেন্দ্রনাথ সিরাজ সাজেন। ১৫ই নভেম্বর তারিখের 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য :—

MINERVA THEATRE

6, Beadon Street
Saturday the 16th November at 9 P. M. sharp
The grand thirteenth performance of
G. C. Ghose's Sensational Drama

I. CHHATRAPATI

Shivaji—Amarendro Nath Dutt

II. HIRANMOYEE

Amala—Miss. Kusum Kumari

Chapal—Mr. Nripendro Ch. Bose

Nextday, Sunday at Candle-light

I. SIRAJUDDOWLA

Siraj—Amarendro Nath Dutt

Mir-Zafar—Mr. Mustaffi

Johara—Miss. Kusum Kumari

II. NANDABIDAYA

A. N. Dutt
Manager

M. M. Pande
Proprietor

A. Mustaphi
Master

৩০-এ নভেম্বর অমরেন্দ্রনাথের লেখা একটি নতুন নাটিকা 'দলিতা-ফণিনী' মঞ্চস্থ হয়। এর প্রথম অভিনয়-রজনীর ভূমিকালিপি :—নরেন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ, বিশ্বনাথ রাও—তারকপালিত, সোরাব্‌জী—অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, মোহন—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, রমাবাঈ—কুসুমকুমারী, বিলাসবতী—হরিসুন্দরী ( ব্ল্যাকী ), মোহিনী—তিনকড়ি ( ছোট )

বৎসরের শেষ দিনে ( ৩১ ডিসেম্বর, ১৯০৭ ) কোহিনুর থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শরৎকুমার রায়ের মৃত্যু হয়। শরৎবাবুর ছোটভাই শিশিরবাবু কোহিনুরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন।

১৯০৮ খ্রীঃ। বুধবার নববর্ষের দিন মিনার্ভায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন 'প্রায়শ্চিত্ত' তৎসহ অমরেন্দ্রনাথের 'দলিতা-ফণিনী' অভিনীত হয়। সেদিনের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন :—

MINERVA THEATRE

6, Beadon Street

Wednesday, New year's Day at Candle-light

Mr. D. L. Roy's new laughable sketch

I. PRAYASCHITTA

Mr. Champati—Amarendro Nath Dutt
Mrs. Rebeka—Miss. Kusum Kumari
The sixth performance of Amarendro N.
Dutta's highly successful melo-drama

*II. DALITA-FANINI*
*Or*
The serpent in woman
A gallantry of Oriental Beauties
A Phantasmagoria of Beauty
The main role will be taken by your
humble servant the author

A N Dutt — A Mustafi
Manager — Master

২২এ জানুয়ারি বুধবার 'বলিদান' নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখর করুণাময় সাজলেন। সেদিনের 'বেঙ্গলী' কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো—

Minerva Theatre
6, Beadon Street
Wednesday, the 22nd January at 9 P M
G C Ghose's latest social Drama

*BALIDAN*

A grim tragedy in five acts
In which it has been painted in dark
but realistic colours some of the harrowing
results of that commercial transaction which
now goes on under the sacred name of marriage.
Karunamoy. Babu Ardhendu S Mustafi

*II. ALIBABA*
and
The Forty Robbers
Songs and Dances from begining to end.

A. N Dutt — A. S. Mustafi
Manager — Master

এদিকে শরৎ রায়ের মৃত্যুর পর কোহিনূরে ভাঙনের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গিরিশবাবুর সঙ্গে নতুন মালিক অপ্রীতিকর আচরণ করছেন। বিচ্ছেদ আসন্ন।

ব্যাপার টের পেয়ে পাঁড়ে মশায় গিরিশবাবু আর দানীবাবুকে আবার মিনার্ভায় আনবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের ঘোরতর আপত্তিতে পাঁড়ে মশায় সে যাত্রা নিরস্ত হলেন। পরে নানা কারণে বিরক্ত হয়ে অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভায় যাওয়া বন্ধ করলেন। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' নাটকের রিহার্সাল চলছিল। অমরেন্দ্রনাথের 'জাহাঙ্গীর'-এর ভূমিকা। তিনি সে-ভূমিকাটি ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। ১৪ই মার্চ 'নূরজাহান' মঞ্চস্থ হয়। জাহাঙ্গীর সাজলেন প্রিয়নাথ ঘোষ। ২০এ এপ্রিল অর্দ্ধেন্দুশেখর 'বলিদান'-এ করুণাময় সাজলেন। ২২এ এপ্রিল পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথের নাম মিনার্ভার ম্যানেজাররূপে বিজ্ঞাপিত হয়। ২৫এ এপ্রিল থেকে অমরেন্দ্রনাথ স্টারে অভিনয় করতে লাগলেন। ২৪এ এপ্রিল 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রে 'স্টার' বিজ্ঞাপন মারফৎ জানালেন—

BABU AMARENDRANATH DUTT

has come to stay with us

STAR THEATRE

Chastened by Chastisement from Heaven.
We have wiped out tears, shaken off our lethargy
and stand ready for action.

*NEW BLOOD*

has been infused into the company by the
enlistment of performers both male and
female of proved ability and youthful energy.

*THE CAST OF*

*CHANDRASEKHAR*

*On*

Saturday, the 25th April 1908 (9 P. M.)
Will show what a lot of leading actors
and actresses we possess.

| | |
|---|---|
| Chandrasekhar— | Mr. A. L. Bose |
| Protap— | „ A. N. Dutt |
| Mir Kasim— | „ U. N. Mitter |
| Biswas— | „ Kashi N. Chatterji |
| Dalani— | Sm. Narisundari |
| Saibalini— | „ Kusum Kumari |

Nextday, Sunday at Candle light

*SARALA*

Nilkamal—A. L. Bose ; Bidhubhusan—A. N. Dutt
Sarala—Kusum Kumari

To be followed by

*ALADIN*

AMRITALAL BOSE
MANAGER

সেদিন ( ২৫এ এপ্রিল ) মিনার্ভায় 'নূরজাহান'-এর অভিনয় হয়। তারপর ৪ঠা মে লুলিয়া, নবীন তপস্বিনী আর য্যায়সা-কা ত্যায়সা-র অভিনয়ের পর ১৬ই মে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের নতুন অপেরা 'তুফানী' খোলা হলো। এ-পালায় অর্দ্ধেন্দুশেখর জাফর সাজলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতার গুণে 'তুফানী' এমন জমে গেল যে মিনার্ভা পড়তে পড়তেও উঠে দাঁড়াল।

৯ই মে তারিখের 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রে 'মল্লিক ব্রাদার্স' কর্তৃক বিজ্ঞাপিত নতুন গ্রামোফোন রেকর্ডের তালিকায় শিল্পী হিসেবে অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাম দেখতে পাচ্ছি। সেই বিজ্ঞপ্তিটি—

*NEW RECORDS*

*GRMOPHONE, 10-INCH, Rs. 2 each*

মিষ্টর মুস্তফি ( মিনার্ভা থিয়েটার )

( হাস্যোদ্দীপক কথোপকথন )

2—11066 নীলদর্পণ দ্বিতীয় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক

2—11067 নবীনতপস্বিনী ১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক

2—11068 দাতব্য ঔষধালয়ের কথা ১নং

2—11069 ঐ ঐ ২নং

4—1252 হাস্যোদ্দীপক গীত মাণিকপীরের গান

শেষের রেকর্ডটি অসম্ভব বিক্রি হয়েছিল। গ্রামোফোন কোম্পানির বড়কর্তা তখন বলেছিলেন, It is splendid and the record has an unusual sale.

১৬ই মে তারিখের 'বেঙ্গলী' কাগজে 'তুফানী' পালার শুভ উদ্বোধনের বিজ্ঞাপন :—

New Drama and New pantomime on
Saturday
Minerva Theatre
6, Beadon Street.
Saturday, the 16th May at 9 P. M. sharp
The tenth grand performance of Mr. D. L. Roy's
Sensational Drama

*NURJAHAN*

Whose splendid success and magnificent reception by the public have admittedly created an epoch in the annals of the Indian Stage. To be preceded by the grand opening performance of Babu Atul Krishna Mittra's splendid sketch

*TUFANI*

*Or*

The Blunderer

adapted by the veteran author from "L'E tourdi ou Les contri Temps" the best comedy of Moliere that prince of French Comedians. Jafar Mr. Ardhendu Sekhar Mustaphi. Comic songs and comic duets set to tune by our veteran Professor Babu Deb Kanto Bagchi.

Comic scenes, Comic dresses, Comic Wits and Comic situations from start to finish.

Next day, Sunday at Candlelight

I. G. C. Ghose's grand historical Drama

SIRAJUDDOWLA

Our performance of which is simply inimitable That thrilling social Tragedy

II. PRAFULLA

III. MINERVA BIOSCOPE

All new pictures

A. MUSTAFI, Master | M. M. PANDE Proprietor

২৭-এ জুন, রবিবার, সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

১লা জুলাই অভিনীত হ'ল আলিবাবা, য্যায়সা-কা-ত্যায়সা আর দোললীলা। সেদিনের 'বেঙ্গলী' কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন—

MINERVA THEATRE

6, Beadon Street

Wednesday, the 1st July at 9 P. M.

That evergreen Melo-drama

I. ALIBABA

and

the forty thieves

G. C. Ghose's latest pantomime

2. JAISA-KA-TAISA

*Or*

Rightly served

Sparkling wit and Genial humour

from Start of finish.

That sublime Mythological opera

3. DOLE LILA

4. THE MINERVA BIOSCOPE

All new Pictures.

A. Mustaphy
Master

M. M. Pande
Proprietor

৪ঠা জুলাই তুফানী ও নূরজাহান আর ৫ই জুলাই সিরাজউদ্দৌলা ও রাণা প্রতাপ অভিনীত হয়। ৩রা জুলাই তারিখের 'বেঙ্গলী' কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন—

MINERVA THEATRE

6, Beadon Street

Saturday, the 4th July, at 9 P. M. sharp

The grand eighteenth performance of Babu

Atul Krishna Mittra's splendid sketch

TUFANI

Or

The Blunderer
Adapted from the best comedy of Moliere
Jafâr—Mr. Ardhendu Sekhar Mustafy.
Comic songs—comic dances—comic scenes—
Comic dresses—Comic hits—and comic situations
from start to finish
Followed by the seventeenth performance
of Mr. D. L. Roy's sensational Drama
NURJAHAN
The Light of the World
Next day Sunday, at Candle light
I. SIRAJUDDOWLA
The last independent Nabob of Bengal
II. RANA PRATAP
The most glorious name on the pages
of history
Please book early to avoid rush
and disappointment

A. Mustaphy
Master

M. M. Pande
Proprietor

এবার কোহিনুর থিয়েটারের ভেতরকার খবর নেওয়া যাক। আগেই বলেছি সেখানে ভাঙন ধরেছে। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শরৎবাবুর ভাই শিশিরবাবুর বনিবনাও হচ্ছে না। কোহিনুরে আসার পর থেকেই গিরিশচন্দ্র প্রায়ই হাঁপানির আক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়েন; ফলে না পারছেন থিয়েটারে নিয়মিত হাজিরা দিতে, না পারছেন নতুন নাটক দিতে। শিশিরবাবু গিরিশবাবুর বেতন আটকে দিলেন। গিরিশবাবু তাঁর পাওনা তিনমাসের বেতন ও বোনাসের বাকি চারহাজার টাকা আদায়ের জন্যে হাইকোর্টে মামলা রুজু করলেন। বিচারে গিরিশচন্দ্রের জয়লাভ হলো। তিনি পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে কোহিনুর ছেড়ে মিনার্ভায় চলে এলেন। এখানে তাঁর মাসিক পাঁচশো টাকা বেতন ও লাভের এক-পঞ্চমাংশ হিস্যা ধার্য হলো। ১৯এ জুলাই থেকে গিরিশচন্দ্রের নাম মিনার্ভার ম্যানেজাররূপে বিজ্ঞাপিত হতে থাকে। সেদিন মিনার্ভায় 'সিরাজউদ্দৌলা' অভিনীত হয়।

এই সময়ে অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল, ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ আর অপরিমিত মদ্যপান তাঁর দেহকে ভেতরে ভেতরে ক্ষয় ক'রে ফেলছিল। তাঁর শরীরের অবস্থা বিবেচনা ক'রে মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাময়িক অবসর গ্রহণ করবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কপট সুহৃদের দল তাঁকে বুঝোলেন যে কর্তৃপক্ষ তাঁকে আর রাখতে চান না, সুতরাং মিনার্ভার সঙ্গে অবিলম্বে তাঁর সম্পর্ক ত্যাগ করাই উচিত। অর্দ্ধেন্দু তাদের মিথ্যাবাক্য বিশ্বাস ক'রে ৬ই জুলাই থেকে মিনার্ভা ছেড়ে দিলেন। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র এইরকম লিখেছেন :

"অর্দ্ধেন্দু বহু সদ্‌গুণবিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাহা বিকাশ হইবার এক প্রবল বাধা ছিল। যে কেহ আসিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্দ্ধেন্দুর আত্মীয় হইবার ইচ্ছা করিত, তৎক্ষণাৎ সে আত্মীয় হইতে পারিত এবং সেই শঠ যেদিকে লওয়াইবার চেষ্টা করিত, অর্দ্ধেন্দুকে সেইদিকে লইয়া যাইতে কৃতকার্য হইত।...অর্দ্ধেন্দুর অভিনেতৃগণের প্রতি বিশেষ মমতা ছিল, যাহারা অকর্মণ্য, কর্তৃপক্ষীয়ের নিকট ভৎর্সিত হইয়া অর্দ্ধেন্দুর আশ্রয় গ্রহণ করিত তাহারা কতৃপক্ষীয়ের নিন্দা রচনা করিয়া অর্দ্ধেন্দুকে শুনাইত। কর্তৃপক্ষীয় হইতে অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে এ কথা উঠিয়াছে, ও কথা উঠিয়াছে, কর্তৃপক্ষ অর্দ্ধেন্দুকে অযোগ্য জ্ঞান করে, নানাবিধ নিন্দা করে, 'সাহেব, আর এখানে তোমার থাকা উচিত নয়'—এইরূপে অর্দ্ধেন্দুর মনোভঙ্গ করিত। অর্দ্ধেন্দুও তাহার বিশেষ তত্ত্ব না করিয়া, সেইসকল মিথ্যাকথা প্রত্যয় করিতেন। মিথ্যাকথা বলিবারও তাহাদের কৌশল ছিল। হয়তো কার্যস্থলে বলা হইয়াছে, সাহেব অমন বলেন, উঁহার মতে সকল কার্য করা চলে না। সে অবজ্ঞা নয়, কথার উত্তরে কথা, তাহা অবজ্ঞারূপে ব্যাখ্যা করিয়া অর্দ্ধেন্দুর ক্রোধ উৎপাদন করিত এবং অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া নতুন দল বসাইবার প্রয়াস পাইত। এরূপ অনেকবার হইয়া গিয়াছে। প্রতিবারই শেষে অর্দ্ধেন্দু বুঝিতেন, কিন্তু বুঝিয়াও কোন ফল হয় নাই, আবার তাহাই হইত। অর্দ্ধেন্দুর সহিত আমার রঙ্গমঞ্চে মিলন হওয়া অবধি ক্রমান্বয়ে সুহৃদ্‌ভেদকারী বহু ব্যক্তি জুটিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে চিনিয়াও চিনিতেন না। ইহাতে তিনি বহুবিধ কষ্ট পাইয়াছেন। তাঁহার গুণবিকাশে বিস্তর বাধা হইয়াছে ; কিন্তু ইহা দৈববিড়ম্বনা। যখন শেষ অসুখের সূত্রপাত হয়, উক্তরূপ সুহৃৎ জুটিয়া মিনার্ভা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করে। কোহিনুরে গিয়া পীড়ার যতদূর সাহায্য করিতে হয় করিয়াছে। মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পূর্বে এ সুহৃৎ নিকটে ছিল।" ('নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী')

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

### কোহিনুর থিয়েটারে নটলীলার অবসান ( ১৯০৮ )

মিনার্ভা থেকে অর্দ্ধেন্দুশেখর কোহিনুরে চলে এসে ১৫ই জুলাই, বুধবার 'সংসার'-এ নবখুড়ো ও 'জেনানা যুদ্ধ'-য় কর্তা আর ১৯এ জুলাই 'দুর্গেশনন্দিনী-'তে বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকায় নামলেন। কোহিনুরের ম্যানেজাররূপে গিরিশ চন্দ্রের নাম তখনও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। প্রমাণপত্র হিসেবে ১৫ই জুলাই তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি দাখিল করছি—

KOHINOOR THEATRE
68, Beadon Street
Wednesday the 15th July at 9 p. m.

I. Successful Society Drama
SANSAR
Naba Khuro—Sj A. S. Mustaffi (Saheb)
Bama —Miss Tarasundari

II. Kohinoor of Kohinoor
ALIBABA

III. Laughable Farce—
ZANANAJUDHA !!!

G. C. GHOSE
Manager.

২২-এ জুলাই তারিখের 'বেঙ্গলী' কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে সেদিনেও কোহিনুরে 'জেনানা যুদ্ধ'-র অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর কর্তা সেজেছেন আর কাগজে-কলমে ম্যানেজাররূপে গিরিশচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। বিজ্ঞাপনটি তুলে দিলাম—

KOHINOOR THEATRE
68, Beadon Street, Calcutta.
Wednesday, the 22nd July at 9. P. M.

I. G. C. GHOSE's mythological drama
I. SITAHARAN
II. BALIBADHA
III. ALIBABA

A thing of beauty is joy for ever

IV DOLE-LILA

V. HIRARPHUL

VI. ZENANAZUDHA

Karta—A. S. Mustaffi Saheb.

G. C. GHOSH
Manager.

২৬এ জুলাই 'সংসার'-এ নবখুড়ো ও ২৯এ জুলাই 'আবুহোসেন'-এর সংজ্ঞাংশে অভিনয় করার পর অর্দ্ধেন্দুশেখর ১লা অগাস্ট 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে বিদ্যাদিগ্‌গজ ও ২রা অগাস্ট 'নীলদর্পণ'-এ তোরাপ সাজলেন এবং ৫ই অগাস্ট 'জেনানা যুদ্ধ'-র পূর্ববৎ কর্তার ভূমিকাভিনয় করলেন। ১লা অগাস্ট তারিখের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন :—

KOHINOOR THEATRE

68, Beadon Street, Calcutta

Sunday the 1st August 08-at 9 P. M.

I. The fourth performance of Khirode Babu's successful drama

BARUNA

The piece has the grandeur of drama
as well as the charm of opera
Melodious songs and Graceful dances
throughout

II. Bankimchandra's immortal drama

DURGESH NANDINI

Ahayasa—Miss Tarasundari
Bimala—Miss Kusum Kumari

Next day Sunday at 7-30 p. m.

I. Dinobondhu's society drama

NILDARPAN

Sabitri—Miss Tarasundari
Torap—A. S. Mustaffi Saheb
Aduri—Miss. Kusum Kumari

II. Bankimchandra's

KAPALKUNDALA
Mati Bibi—Miss. Tarasundari
III. Khirode Babu's fairy opera
BASANTI-MELA
Fairy songs and dances start to finish

সেদিন রবিবার, ৯ই অগাস্ট। 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে :—

KOHINOOR THEATRE
68, Beadon Street, Calcutta
Sunday at 7-30 p. m.
G. C. Ghose's grim tragedy
PRAFULLA
To be followed by
Roy Dinobondhu's grand comedy
NABINTAPASHWINI
Jaladhar—A. Mustaphi
D. D. Soor, Stage Manager

কিন্তু শনিবার থেকেই অর্দ্ধেন্দুশেখর বেশ অসুস্থ। তাই তাঁকে বিনীত অনুরোধ করা হলো—আপনার কাল সেজে আর কাজ নেই। প্রবোধবাবু 'প্রফুল্ল'-তে যোগেশ সাজবেন আর 'নবীন তপস্বিনী'-তে অন্য কেউ জলধর সাজবে না। ও বই বদলে দিলেই চলবে। কিন্তু অভিনয়ের দিন বিকেলে দেখা গেল, পাছে আর কেউ যোগেশ সাজে এই আশঙ্কায় তিনি ড্রেসারকে ডাকিয়ে বিকেল চারটে থেকে যোগেশ সেজে বসে আছেন; অথচ রাত সাড়ে সাতটায় বই আরম্ভ। অপরেশবাবু অর্দ্ধেন্দুশেখরকে বললেন—'আপনার অসুখ, ক'দিন কিছু খান নি, আজ যদি সমস্ত রাত জাগেন তাহ'লে অসুখ বেড়ে যাবে।'

অর্দ্ধেন্দুশেখর বললেন—'বাধা দিও না বাবা, আমি যতক্ষণ দাঁড়াতে পারব আর কথা কইতে পারব, ততক্ষণ সাজব, সাজতেই আমি এসেছি। অভিনয় করতে করতে স্টেজেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে জানব আমার গঙ্গালাভ হয়েছে, আমার আর অন্য গঙ্গার প্রয়োজন নেই।'

অর্দ্ধেন্দুশেখর যোগেশ সাজলেন, জলধরও সাজলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণে আর অত্যধিক পরিশ্রমে পরদিন সকালে তাঁর আর ওঠবার ক্ষমতা রইল না।

শয্যাশায়ী অর্দ্ধেন্দুশেখরকে তাঁর আদেশে তাঁর প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ( থাকোবাবু ) বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি নিজের বাড়িতে যেতে চাইলেন না, বললেন—'না, বাড়িতে টিকতে পারব না, থাকোর ওখানে তবু পাঁচটা থিয়েটারের কথা হবে, থাকব ভাল।'

কোহিনুর থিয়েটারে 'জলধর' ও 'যোগেশ' ক'রে অর্দ্ধেন্দুশেখর নাট্যমঞ্চ থেকে শেষ বিদায় নিলেন। দীর্ঘ একচল্লিশ বছর আগে যে নটজীবনের সূত্রপাত হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি হলো যুগের নটচূড়ামণিরূপে।

আশ্চর্য সমাপত্তি! মঞ্চে তাঁর প্রথম অভিনয়ের দিনে মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন সেই বাল্যবন্ধু ধর্মদাস আর তাঁর শেষ অভিনয়ের দিনেও মঞ্চাধ্যক্ষ সেই ধর্মদাস।

প্রসঙ্গক্রমে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মনোজ্ঞ মন্তব্য স্মর্তব্য :—

"এক দিনে, এক সময়ে, একই নাট্যে নায়ক-নায়িকা বেশে দর্শকের সম্মুখে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেইদিন তাঁহাদের জীবনেও প্রথম নট-লীলার দিন আর সেই দিন হইতেই অর্দ্ধেন্দুবাবু 'নটকুলগুরু', শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং সেই দিন হইতেই ধর্মদাসবাবু নাট্যমঞ্চ-নির্মাতা, নাট্যশীর্ষ-চিত্রকর, নাট্যপীঠের অধ্যক্ষ এবং নেপথ্যবিধাতা বলিয়া মাইকেল মধুসূদনাদির ন্যায় ব্যক্তিবর্গের অশেষ প্রশংসা লাভ করেন। কার্যের আরম্ভ দিনে—সঙ্কল্প মুহূর্তেই এমন অবিতর্কিত প্রশংসা লাভ কয়জন কর্মবীর, কয়জন সাধকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? ভগবানের অনুগ্রহে যে দিন এই দুই মনীষী, এই মহতী কলাবিদ্যার প্রতিভাবান শিল্পী বলিয়া প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করেন, বাঙ্গালার নাট্যশালার ইতিহাসে, সে দিনটি একটি স্মরণীয় দিন,—একটি পবিত্র দিন—সে দিনটি সকলেরই স্মরণ করিয়া রাখা কর্তব্য—সে দিনটি ১২৭৪ সালের ১৭ই কার্তিক ১৮৬৭, ২ নভেম্বর, শনিবার।" ('রঙ্গমঞ্চ', শ্রাবণ ১৩১৭ )

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

### অর্দ্ধেন্দুরী টিপ্‌নি*

অভিনয়কালে নিজের অভিনেয় অংশের মধ্যে কখনো স্বরচিত প্রক্ষিপ্ত সরস সংলাপ যোজনা ক'রে, কখনো ভঙ্গী বা অভিনয় দিয়ে, কখনো বা ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করার শক্তি অর্দ্ধেন্দুশেখরের মধ্যে অপরিমেয়ভাবে বিদ্যমান ছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সংলাপ-রসিকতাকে গিরিশচন্দ্র বলতেন 'অর্দ্ধেন্দুরী টিপ্‌নি'। এ ব্যাপারে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার একটু অনুযোগের সুরে বলেছেন :

"প্রত্যেক বড় অভিনেতাই অভিনয়কালে gag ব্যবহার করেন, অবশ্য playকে disturb না ক'রে। অর্দ্ধেন্দুবাবু কিন্তু playকে disturb করতেন।" (দ্রঃ রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু প্রণীত 'শিশির সান্নিধ্যে', পৃ. ২৮)

কিন্তু গিরিশচন্দ্র বলেছেন :

"এরূপ করায় কখনও যে ক্ষতি হইত না, তাহা নয়, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু দর্শকের নিকট এতদূর প্রিয় ছিলেন, যে ক্ষতিবৃদ্ধি গণ্য হইত না। আমোদের স্থলে আমোদই হইত।" ('নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী')

তবে গিরিশচন্দ্র সাবধান ক'রে দিয়েছেন :

"সামান্য অভিনেতার অর্দ্ধেন্দুকে এস্থলে অনুকরণ করিতে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক। অর্দ্ধেন্দুর নিকট শিক্ষিত না হইয়া তাঁহার ন্যায় ঢং করিতে গেলে ভাঁড়াম হইয়া উঠে।" (তদেব)

অর্দ্ধেন্দুশেখরের মূর্তিতেই হাস্যরস প্রত্যক্ষ হ'ত। এই বিদগ্ধ রসিক পুরুষটির রঙ্গ-ব্যঙ্গের বহু গল্প আমাদের রঙ্গলোকে কিংবদন্তীতে পরিণত। উদাহরণস্বরূপে, ছাব্বিশটি গল্প এই পরিচ্ছেদে সংকলিত হলো।

ন্যাশনাল থিয়েটারে দীনবন্ধুর 'লীলাবতী নাটক অভিনয় হচ্ছে। হরবিলাসের বৈঠকখানায় জাল অরবিন্দকে নিয়ে হুলস্থুল পড়েছে। 'হরবিলাস'-রূপী অর্দ্ধেন্দু বলছেন,—'ভোলানাথবাবু, তুমি পাপাত্মার মুণ্ডপাত করো, তারপর কপালে যা থাকে তাই হবে।' নদেরচাঁদ বলল, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, এখনি পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আসবে, এলেই তাঁতীর শ্রাদ্ধ হবে।' এমন সময়ে পুলিস ইন্‌স্পেক্টর,

* এই পরিচ্ছেদ রচনায় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা' (আশ্বিন, ১৩৩০) পুস্তক থেকে বিশেষ সাহায্য নিয়েছি। অন্যান্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

যজ্ঞেশ্বর, হেমচাঁদ ও তুজন কনস্ট্যাবলের মঞ্চে প্রবেশ করবার কথা। সকলেই এল, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের আসতে দেরি হচ্ছে। দর্শকরা সাগ্রহে প্রতি মুহূর্তে তার আসার অপেক্ষায় আছে, অথচ যজ্ঞেশ্বরের দেখা নেই। স্টেজ dull হয়ে যায় দেখে 'হরবিলাস'-রূপী অর্দ্ধেন্দু পুলিস ইন্‌স্পেক্টরকে বললেন,—'জমাদার সাহেব, তোমার আসামী সট্‌কেছে, এখন তুমিই আসামী আর জমাদার তুই হয়ে দাঁড়াও, আমাদের কাজ চলুক; (দর্শকদের দেখিয়ে) বাবুরা সব ব'সে আছেন।' এই সময় দর্শকদের মধ্যে যথার্থই বিরক্তির লক্ষণ ফুটে উঠছিল, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর এই রসিকতায় সমস্ত চাপা পড়ে গেল।

নিউ ইয়ার্স ডে উপলক্ষে আলিপুর জোঅলজিক্যাল্ গার্ডেনে তখন প্রতি বছর 'ফ্যান্সি ফেয়ার' হ'ত। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি 'লুইস্ থিয়েটার' সেখানে অভিনয় দেখাবার জন্যে তাঁবু ফেলেছে। সেবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও সেখানে 'নীলদর্পণ' অভিনয় করে। লুইস্ থিয়েটার নানা প্রলোভন দেখিয়ে দর্শক সংগ্রহের চেষ্টা করছে। সাহেব, মেম ও অনেক শিক্ষিত বাঙালী লুইস থিয়েটারেই ভিড় জমাচ্ছে। অর্দ্ধেন্দু দেখলেন, লুইস থিয়েটার জাঁকজমক দেখিয়েই দর্শক টানছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লাউন সেজে, হাতে একটি ঘণ্টা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং সাহেব, মেম—সামনে যাকেই দেখতে পেলেন বলতে লাগলেন: A merry band has just come down from the moon in yonder camp. Come one—come all! অর্দ্ধেন্দুর সাজসজ্জা এবং চলন, বলন ও অভ্যর্থনার অদ্ভুত ভঙ্গিমায় কৌতূহলী হয়ে দলে দলে সাহেব, মেম আর বাঙালী গ্রেট ন্যাশনালের তাঁবুতেই আসতে লাগলেন।

জাস্‌টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্রের অগ্রজ উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটক সে সময়ে গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হচ্ছে। কর্তার ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর। কর্তা dispeptic, খিদে হয় না, খাওয়ায় রুচি নেই। ডাক্তার বলেছেন, প্রতিদিন রকমারি ক'রে খেলে, একটু একটু ক'রে খিদেও বাড়বে, খাওয়াতেও রুচি ফিরে আসবে। এক রাত্রির কথা। খেতে ব'সে 'কর্তা'-রূপী অর্দ্ধেন্দু গিন্নীকে বলছেন, 'রোজ রোজ একঘেয়ে খাবার না ক'রে পাঁচ দিন পাঁচ রকম কর্তে পার না?' বলা দরকার, একথা নাটকে নেই। গিন্নীও বানিয়ে বললেন, 'কি রকম করবো বল?' 'কর্তা'-রূপী অর্দ্ধেন্দু বললেন, 'হ'লো পরমান্নে একদিন একটা কইমাছ ছেড়ে দিলে।'

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে হরলাল রায়ের 'হেমলতা,' নাটকে নায়ক 'সত্যসখা'র ভূমিকা মহেন্দ্রলাল বসু অভিনয় করতেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর একদিন ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। যে সময়ে 'সত্যসখা' পাগলের ছদ্মবেশে কারাগারে ঢুকে নিজের পোশাক পরিবর্তন ক'রে চিতোরের রাণা বিক্রমসিংহকে কারাগার থেকে মুক্ত ক'রে দেন, সে সময়ে সত্যসখার কপট উন্মাদাবস্থা নাট্যকার এই ভাবে বর্ণনা করেছেন—সত্যসখা যেন আকাশে মিস্ত্রী খাটিয়ে বাড়ি তৈরি করাচ্ছেন। মিস্ত্রীদের উদ্দেশে পাগলামির ঝোঁকে কখনও বলছেন,—'খাট্, খাট্,—বক্‌শিশ পাবি, আকাশে বাড়ি,—রাজা বেটারও নেই, মন্ত্রী বেটারও নেই, কাজ কর, কাজ কর, দেখি কেমন কাজ করিস।' তারপর বলছে 'এত চূণ গায়ে মেখে নষ্ট?' এই কথাটি বলবার সময় অর্দ্ধেন্দু দেখেন, উইংসের পাশে তাঁদেরই একজন বিশিষ্ট বন্ধু সাদা মোজা পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখছেন। অর্দ্ধেন্দু তৎক্ষণাৎ তাঁকে মঞ্চের ওপর হিড় হিড় করে টেনে এনে তাঁর পায়ে সাদা মোজা দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'এত চূণ পায়ে মেখে নষ্ট?' দর্শকরা হো হো করে হেসে উঠলো। বন্ধুটি দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। উইংসের পাশে দাঁড়ালে অভিনেতাদের মঞ্চে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধে হয়, এজন্যে তাঁকে বহুবার ও বহুদিন প্রেক্ষাগৃহে বসে অভিনয় দেখতে অনুরোধ করা হয়েছে, কিন্তু তিনি তা শুনেও শুনতেন না। অর্দ্ধেন্দু সেদিন সুযোগ পেয়ে রঙ্গচ্ছলে তাঁকে শিক্ষাদান করলেন।

গ্রেট ন্যাশনালে গোড়া থেকে স্ত্রী-অভিনেত্রী নেওয়া হয়নি। শেষকালে বেঙ্গল থিয়েটারের দৃষ্টান্তে গ্রেট ন্যাশনালেও স্ত্রী-অভিনেত্রী নেওয়া হয়। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯এ সেপ্টেম্বর, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী—এই পাঁচজন স্ত্রী-অভিনেত্রী নিয়ে, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী?' গীতিনাট্য খোলা হয়। বেলবাবু ক্ষেত্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রমুখ যাঁরা ইতিপূর্বে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করতেন, তাঁরা প্রয়োজনমত স্ত্রী-ভূমিকাগুলো এঁদের সঙ্গে সময়ে সময়ে ভাগাভাগি ক'রে অভিনয় করতেন। 'সতী কি কলঙ্কিনী?' খোলবার পরে অর্দ্ধেন্দু কলকাতায় এসে কিছুদিন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন। একদিন 'সতী কি কলঙ্কিনী?' অভিনীত হচ্ছে। অর্দ্ধেন্দু 'জটিলা' সেজেছেন। 'রাধিকা'র ভূমিকায় গায়িকা যাদুমণি যমুনা থেকে সহস্র ছিদ্রযুক্ত কলসী পূর্ণ ক'রে এনেছেন এবং সেই জলস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন। নন্দালয় আনন্দে পরিপূর্ণ। যশোদা নিজের কোলে শ্রীকৃষ্ণ ও

রাধিকাকে বসিয়েছেন। সখিরা গান ধরেছে—'আঁখি ভরি দেখ্‌লো সই—আঁখি ভরি দেখ্‌লো।' জটিলা ও কুটিলা মুখটি নীচু করে এই সময়ে চলে যায়। 'জটিলা'-বেশী অর্দ্ধেন্দু যখন মঞ্চ থেকে নিস্ক্রান্ত হচ্ছেন, সখিরা তখন ঘুরে ফিরে নাচছে। অর্দ্ধেন্দু কপট ক্রোধে যেমন একটি ছোট সখীর বেণী ধরে টেনেছেন, অমনি সখাটির ছেঁড়া খোঁপা থেকে লম্বা বেণীটি খুলে এল। অর্দ্ধেন্দু মেয়েটির চুলের এমন অবস্থা জানতেন না। তিনি আর কি করেন, বেণীটি হাতে ক'রে দর্শকদের দিকে চেয়ে বললেন—'খোলস খুলে এল।' দর্শকরা হো হো ক'রে হেসে উঠল, কিন্তু লজ্জা ও অভিমানে সখীটির চোখ দুটি অশ্রুতে ভেসে যেতে লাগল। সেদিনের সেই বালিকাটি ছিল গঙ্গামণি—উত্তরকালে তিনি গঙ্গাবাই নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর বিল্বমঙ্গল নাটকে 'পাগলিনী', নসীরামে 'সোনা', হারানিধিতে 'কাদম্বিনী', বিজয়-বসন্তে 'শান্তা' ইত্যাদি ভূমিকার অভিনয় দেখে সেকালের দর্শক মাতোয়ারা হতেন।

এই গল্পটি গিরিশ-পুত্র দানীবাবুর মুখ থেকে শুনেছিলেন 'সীতা'-র নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী মশায়। গিরিশবাবু তখন ন্যাশনাল থিয়েটারে। দানীবাবু থিয়েটার দেখতে গেছেন। মঞ্চের সামনে বসে দানীবাবু থিয়েটার দেখছেন। 'আগমনী' পালা অভিনয় হচ্ছে, অর্দ্ধেন্দু অভিনয় কচ্ছেন। অভিনয় করতে করতে অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহসা দৃষ্টি পড়লো দানীবাবুর ওপর। তখন দানী খুবই ছোট। অর্দ্ধেন্দু এক নিমিষে দর্শকদের ভেতর থেকে বালক দানীকে কোলে ক'রে ফুটলাইটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর ঐ ছোট ছেলেটিকে তাঁর Co-actor ক'রে অভিনয় আরম্ভ কল্লেন। অর্দ্ধেন্দু দানীকে খুব আদর ক'রে সেই উজ্জ্বলিত নাট্যশালার আলোকমালা দেখিয়ে বল্লেন—'তোমার বিয়ে হবে—এইরকম রোশনাই ক'রে। বাজনা বাজবে—নতুন বৌ রাঙা টুকটুকে বৌ আসবে, আমরা সব কত লোক বরযাত্রী যাব—নেমন্তন্ন খাব—তারপর একদিন তোমার বাবা মরবে.—আমরা সব ঘটা ক'রে পোড়াতে যাব কাশীমিত্রের কিম্বা নিমতলার ঘাটে, তারপর আরও ঘটা ক'রে তোমার বাপের শ্রাদ্ধ হবে। কেমন ?' বালক অপ্রতিভ, দর্শকেরা হেসে গড়িয়ে পড়ে।*

বাগবাজারে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (তিনকড়ি বাবু) 'অভিমন্যু বধ' সখের যাত্রা একসময়ে কলকাতায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। গিরিশচন্দ্র

* দ্রঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 'দানীবাবুর নাট্যজীবন' শীর্ষক প্রবন্ধ : 'নাচঘর', ২৭ আষাঢ় ১৩৩১।

এই পালায় কয়েকখানি গান বেঁধে দিয়েছিলেন। একদিন এক বড়লোকের বাড়িতে 'অভিমন্যু বধ' পালার অভিনয় হচ্ছে। অভিনয় খুব জমে উঠেছে, এমন সময় খবর এল, যিনি অর্জুন সাজবেন, তিনি আসতে পারবেন না। কে এখন অর্জুন সাজবে? অর্দ্ধেন্দু সে আসরে উপস্থিত আছেন। সকলে তাঁকে ধরে বসলেন। অর্দ্ধেন্দু বললেন, 'আমার একবর্ণ মুখস্থ নেই, কেমন ক'রে হঠাৎ আসরে নামি?' সকলে কিন্তু নাছোড়বান্দা—অগত্যা তিনি অর্জুনের ভূমিকায় নামলেন। সংশপ্তক-যুদ্ধরত কৃষ্ণার্জুনের কাছে যখন দূত এসে অভিমন্যুর মৃত্যু-সংবাদ জানাল—'অর্জুন'-রূপী অর্দ্ধেন্দু অভিনয় আরম্ভ ক'রেই বুঝলেন—প্রমটার সেরকম পাকা নয়। এর ওপর নির্ভর করে অভিনয় চালান দুরূহ। এই সঙ্কটে কি করা উচিত, যখন তিনি ভাবছেন—এমন সময়ে অদূরে 'ভিয়ান্-ঘর' থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখে সহসা শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গুলীসঙ্কেতে সেই ধোঁয়া দেখিয়ে বললেন, —'সখা, পুত্র-শোকে আমি সব ধূমে-ধূমাকার দেখছি। আমার আর বাক্য নিঃসরণ হচ্ছে না।'

একবার এমারেল্ড থিয়েটারের দল নৌকোয় ক'রে মফঃস্বলে অভিনয় করতে যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে দেখা গেল, দূর থেকে একখানা ছিপ নৌকোর দিকে সোঁ সোঁ ক'রে ছুটে আসছে। মাঝিরা সভয়ে বলল—'হুজুর ওরা ডাকাত।' নৌকোয় যে ক'জন অভিনেতা ছিলেন, ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। অর্দ্ধেন্দুও সেই নৌকোয় ছিলেন, তিনি গম্ভীর হয়ে সঙ্গীদের বললেন, 'চ্যাচাস্‌নি, যা বলি তাই চট্‌পট্ কর। নৌকোয় ড্রেসের বাক্স আছে। সাহেবের আর পুলিসের পোশাকগুলো বের করে ফ্যাল্।' ড্রেসার সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের বাক্স খুলে অর্দ্ধেন্দুর কথামত তাঁকে সাহেব আর তাঁর সঙ্গী ক'জন অভিনেতাকে পুলিসের সাজে সাজিয়ে দিল। একটা নকল বন্দুকও ছিল, অর্দ্ধেন্দু সেই বন্দুক হাতে পুলিসবেশী অভিনেতাদের নিয়ে নৌকোর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এদিকে ডাকাতদের ছিপও কাছাকাছি এসে পড়েছে। সাহেববেশী অর্দ্ধেন্দু মিলিটারি কায়দায় বন্দুক তুলে হাঁকলেন—Who comes there? ডাকাতরা জল-পুলিস ভেবে নিমেষে ছিপ ঘুরিয়ে নিয়ে চম্পট দিলে। ডাকাত পালালে নৌকোর মধ্যে হাসির হর্‌রা পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে এই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে দেখে মাঝিরা অবাক হয়ে অর্দ্ধেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

একদিন এক এ্যামেচার অ্যাক্‌টার এমারেল্ড থিয়েটারে ভর্তি হবার জন্যে

এসেছেন। অর্দ্ধেন্দু তাঁকে বললেন, 'আপনি আর কোথাও অভিনয় করেছেন'? অভিনেতাটি বললেন, 'হ্যাঁ, ক-ক-ক ক'রেছি বৈকি, প্রাইভেট থিয়েটারে মে-মে-মে মেঘনাদবধে রা-রা-রা রাবণ সেজেছি।' অর্দ্ধেন্দু বললেন, 'দেখছি আপনি তোৎলা, কি করে অভিনয় করবেন?' তিনি বললেন, 'অ-অ-অ অভিনয় করবার সময় ঠেকে না।' অর্দ্ধেন্দু বললেন, 'আচ্ছা আপনার রাবণেরই acting একটু করুন দেখি।' আগন্তুক acting আরম্ভ করলেন। 'নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা' থেকে আরম্ভ করে বেশ গড়গড় ক'রে বলে যেতে লাগলেন। পরে যখন 'বনের মাঝারে যথা শাখা দলে আগে, একে একে কাঠুরিয়া কাটি'-তে এসে উপস্থিত হলেন তখন 'কাঠুরিয়া'-র 'ক'-এ এমন রামঠেকা ঠেকে গেল যে, ভদ্রলোকটি মুখে ক্রমাগত 'কা কা কা' করতে লাগলেন, অবশেষে কুড়ুল হাতে কাঠুরিয়ার কাঠ কাটবার ভঙ্গিতে এমন দ্রুতবেগে হাত দুটি চালাতে লাগলেন যে, তাঁর সে সময়কার রক্তবর্ণ চক্ষু ও বিকৃত মুখভঙ্গিতে সকলে হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগলেন। পরবর্তীকালে অর্দ্ধেন্দুশেখর এই তোৎলা রাবণের অভিনয় নকল করে দেখাতেন।

এমারেল্ড থিয়েটারে একদিন অর্দ্ধেন্দুশেখর, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, প্রিয়নাথ ঘোষ, কুমুদবিহারী সরকার, এমারেল্ডের স্টেজ ম্যানেজার কাশীনাথ বোস প্রভৃতি গল্পগুজব করছেন, এমন সময়ে মতি সুর সেখানে এসে অতুলবাবুকে বললেন, 'কিহে—তুমি এখানে? আমি তোমাকে সমস্ত দিন গোরু খোঁজা করে খুঁজছি।' অর্দ্ধেন্দু বললেন—'গোরু হলে খুঁজে পেতে; গোরুত নয়, তাই খুঁজে পাও নি।'

মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'মুকুল-মুঞ্জরা' অভিনয় হচ্ছে। 'বরুণচাঁদ'-রূপী অর্দ্ধেন্দু রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ সুষেণকে রাজার সামনে টেনে এনে বলছেন, 'প্রাণনাথকে প্রেমডুরিতে বেঁধে টানাটানি করছি।' রাজা জয়সেনকে বললেন, 'আরে এ কি বলে, ভাঁড় না কি?' অর্দ্ধেন্দু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, ভাঁড়—অতবড় নই, আমি একখানি ছোট খুরি।' শোনামাত্র হাসির রোল উঠল।

আর একদিন মিনার্ভা থিয়েটারে 'মুকুল-মুঞ্জরা'-র অভিনয় হচ্ছে, আফিংখোর 'বরুণচাঁদ'-বেশী অর্দ্ধেন্দুশেখর ভজনরামের সঙ্গে অভিনয় করছেন, এমন সময়ে একটি বেড়াল এক উইংস্ দিয়ে ঢুকে আরেক উইংস্ দিয়ে বেগে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ এই দৃশ্যে দর্শকরা হো হো করে হেসে উঠল। তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধেন্দু 'ভজনরাম'-রূপী অভিনেতা বিনোদবিহারী সোমকে (পদবাবু) বললেন, 'ওরে ভজন,

বুঝি সর্বনাশ হ'ল, একে আমি আফিংখোর মানুষ—দুধটুকু বুঝি হতভাগা বেড়ালে সব খেয়ে গেল।' আগে প্রেক্ষাগৃহে হাসির ঢেউ উঠেছিল, এবারে হাসির বান ডাকল।

মিনার্ভা থিয়েটারে 'আবুহোসেন' অভিনয় দেখতে এসেছেন ম্যাজিস্ট্রেট আমীর হোসেন। তিনি রয়্যাল বক্সে বসেছেন। 'আবুহোসেন'-রূপী অর্দ্ধেন্দু-শেখর স্টেজে ঢুকেই দর্শকদের দিকে চেয়ে বললেন, 'আজ অভিনয় হবে কি—আবু হোসেন।' মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'এই চুল দিয়েছে কে—বাবু হোসেন।' 'আর আজ অভিনয় দেখতে এসেছেন কে—আমীর হোসেন।' এই ব'লে রয়্যাল বক্সের দিকে চেয়ে সুকৌশলে ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিবাদন জানালেন।

আর একদিন মিনার্ভা থিয়েটারে 'আবুহোসেন' অভিনয় হচ্ছে। প্রহরীরা আবুহোসেনকে বেঁধে পাগলাগারদে নিয়ে যাচ্ছে। আবুর মা 'ও বাপ্‌রে—আমার কি হ'লো রে' বলে কাঁদছে। কয়েকজন দর্শক রঙ্গ ক'রে এই কান্নার সুরে সুর মিলিয়ে কাঁদতে লাগল। 'আবুহোসেন'-রূপী অর্দ্ধেন্দু যেতে যেতে মাকে ফিরে বললেন, 'মা, আর কাঁদিস নে, আর কাঁদিস নে, তোর কান্না শুনে শেয়াল কুকুরে কাঁদচে।'

অর্দ্ধেন্দুশেখর স্টেজে ঢুকলেই দর্শকরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। একদিন অর্দ্ধেন্দুশেখর অভিনয় করে স্টেজ থেকে বেরিয়ে যাচ্চেন, এমন সময় একজন দর্শক হেঁচে ফেলে। আর একজন দর্শক অর্দ্ধেন্দুকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে, 'যাবেন না, হাঁচি পড়েছে।' অর্দ্ধেন্দু ঘুরে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'কিছু নয়, ও গো-হাঁচি, নাকে খড় আটকেচে।'

একদিন অর্দ্ধেন্দু কি একটা নাটকে অভিনয়ের সময়ে 'হরে' চাকরকে ডাকছেন। কিন্তু 'হরে'-র আর দেখা নেই। অতএব অর্দ্ধেন্দু কপট ক্রোধে 'হরে হরে' বলে নেপথ্যের দিকে চেয়ে চিৎকার করছেন। এমন সময়ে একজন 'বক্কেশ্বর' দর্শক গ্যালারি থেকে সাড়া দিল—'আজ্ঞে যাই।' অমনি অর্দ্ধেন্দু গ্যালারির দিকে মুখ ফিরিয়ে তার প্রতি লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'ও শুয়োর ব্যাটা, তুমি ওখানে বসে আছ?' সমবেত দর্শক হো হো ক'রে হেসে উঠল। 'বক্কেশ্বর' দর্শকটি চুপ।

ঐতিহাসিক নাটকে প্রায়ই সৈন্যদের সমবেতকণ্ঠে 'হরহর মহাদেও' বা 'আল্লা আল্লা হো' ধ্বনি দেওয়ার দরকার হয়।' কিন্তু দু'চারজনমাত্র সৈন্য মঞ্চ বা নেপথ্য থেকে ঐ রকম শব্দ করলে অভিনয় তেমন জমাটি হয় না। মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন অর্দ্ধেন্দুশেখর অভিনেতৃদের ডেকে বললেন, "যখন 'আল্লা আল্লা হো' করবার দরকার হবে, তখন থিয়েটারে যে যেখানে যে অবস্থায় থাক, 'আল্লা' শব্দ কানে গেলেই 'আল্লা আল্লা হো' বলে উঠবে, যে না করবে, তাকে আমার কঠিন দিব্যি রইল।" তারপর থেকে সৈন্যদের জয়ধ্বনিতে বাড়ি কেঁপে উঠত। থিয়েটারের ভেতর কেউ হুঁকো হাতে 'আল্লা আল্লা হো' করছে, কেউ মুখের খাবার ফেলে 'আল্লা আল্লা হো' করছে, কেউ জলের গ্লাস হাতে, কেউ বেঞ্চিতে শুয়ে, কেউ তন্দ্রাবস্থায়, কেউ বা পাইখানা থেকে 'আল্লা আল্লা হো' করছে। উপায় নেই, সাহেবের কঠিন দিব্যি।

একদিন অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা থিয়েটারে তেল মেখে স্নান করতে চৌবাচ্চার দিকে আসছেন এমন সময়ে এক ভদ্রলোক তাঁকে দেখে বললেন, 'কেমন আছেন মশায়?' অর্দ্ধেন্দু তৎক্ষণাৎ সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত ক'রে বিকৃতমুখে এবং ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'উঃ—বড় জ্বর।' ভদ্রলোকটি অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি মশায়, ভালো না থাকলে কেউ তেল মেখে স্নান করে? জ্বর কি বলচেন?' অর্দ্ধেন্দু তক্ষুনি সহজভাবে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি ত কিছু বলিনি মশায়, আমি তোকা স্নান করতে যাচ্ছি, আপনিই এসে বল্লেন,—কেমন আছেন।'

তখন সারা রাত ধ'রে অভিনয় হ'ত। একদিন ভোর হয়ে আসছে, এমন সময়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা থিয়েটারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন। সামনে থিয়েটারের এক পানওয়ালা ছোকরা তাঁকে জিগ্যেস্ করলে, 'বাবু, এইবার কি প্লে শেষ হবে?' অর্দ্ধেন্দু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, 'না, আবার নতুন ক'রে বসবে। লেমোনেড পান সিগারেট ব'লে তোকে আর হাঁকতে হবে না। এইবার ভেতরে গিয়ে হাঁক—তেল, গামছা, জলখাবার।'

মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন অর্দ্ধেন্দুশেখর থিয়েটারের একজন চাকরকে খাবার জল দিতে বলেছিলেন। চাকর জলের গ্লাস এনে দিয়েছে। অর্দ্ধেন্দু যখন জল খেতে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন—জলে কি একটা ভাসছে। তিনি ভয়ানক রেগে গিয়ে চাকরকে বকতে লাগলেন। চাকরটি কাঁচুমাচু হয়ে বলল 'মাপ

করুন বাবু।' ঠিক সেই সময়ে সেখানে থিয়েটারের দর্জি ঢুকছে। অর্দ্ধেন্দু তক্ষুনি তার হাত থেকে 'গজকাঠি' কেড়ে নিয়ে কপট ক্রোধে বলে উঠলেন, 'তবে আয় বেটা, তোকে মাপ করি।' চাকর হাতজোড় ক'রে বলল, 'দোহাই বাবু, ওরকম মাপ করবেন না।'

একদিন অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা থিয়েটারের সামনে গম্ভীরমুখে বসে আছেন। এক পরিচিত ভদ্রলোক এসে শুধোলেন, 'কি মশায়, এত কী ভাবছেন?' অর্দ্ধেন্দুশেখর বললেন, 'না, এমন কিছু ভাবছি না, কী ভাবব, তাই ভাবছি।'

একদিন অর্দ্ধেন্দুশেখর পীরুর হোটেলে দুটো হাফ-বয়েল্ড হাঁসের ডিমের অর্ডার দিয়েছেন। হোটেলের ছোকরা ডিম নিয়ে এল। অর্দ্ধেন্দু জিগ্যেস্ করলেন, 'ডিম দুটোর দাম কত?' ছোকরা বললে, 'আজ্ঞে, দু-আনা।' অর্দ্ধেন্দুশেখর বললেন, 'দু-আনা? এত দাম কেন? ডিমের জোড়া তো চারপয়সা।' ছোকরা বললে, 'আজ্ঞে, আজকাল ডিম বড় মাগ্‌গি হয়েছে।' অর্দ্ধেন্দু বললেন, 'কেন? হাঁসেরা আজকাল সব পরমহংস হয়ে উঠেছে নাকি?'

সেকালে সলোমন নামে একজন নাট্যরসিক ইহুদী সাহেব একটি ফুলের বাসকেট সঙ্গে নিয়ে থিয়েটার দেখতে আসতেন। সাহেব বাংলা বেশ বুঝতেন এবং বাংলা থিয়েটারের অনুরাগী ছিলেন। ঠিক সামনের সারির আসনে বসতেন এবং যেসব অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয় দেখে ভাল লাগত, বাসকেট থেকে ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া বের ক'রে তাঁদের দিকে ছুঁড়ে দিতেন। তাঁর নাট্যানুরাগ ও সহৃদয়তার জন্যে অভিনেতৃবৃন্দ তাঁকে প্রীতির চোখে দেখতেন এবং তাঁর উপহার সাদরে গ্রহণ করতেন। নাগেন্দ্রবাবুর মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয় হচ্ছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর 'জলধর' সেজেছেন এবং জলধর পত্নী 'জগদম্বা' সেজেছেন গুলফম্‌হরি। দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে স্বামী-চরিত্রে সন্দিগ্ধা 'জগদম্বা'-রূপিনী গুলফম্‌হরি, মুড়ো ঝাঁটা হাতে মঞ্চে ঢুকে, 'আজ তোমারি একদিন, কি আমারি একদিন।' আমি ঘোমটা দিয়ে চুপ ক'রে বসি, যদি ধর্তে পারি, আজ মালতী মল্লিকেকে 'মা' বলিয়ে নেব, তবে ছাড়বো' ইত্যাদি বলে স্বামীর আসার প্রতীক্ষায় ঘোমটা দিয়ে বসলেন। এই অংশের অভিনয় দেখে সলোমন সাহেব মুগ্ধ হয়ে গুলফমের উদ্দেশে এক ছড়া গ'ড়ে মালা ছুঁড়ে দিলেন। গুলফম্‌হরি সসম্মানে মালাটি গ্রহণ করলেন এবং সেটি গলায় পরে ঘোমটা দিয়ে বসে রইলেন। তারপর 'জলধর'-রূপী অর্দ্ধেন্দু মঞ্চে ঢুকে জগদম্বার

হাতে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হলেন। যে সময়ে জগদম্বা মাথার ঘোমটা খোলেন এবং তাঁর গলার মালা স্পষ্ট দেখা যায়,—সে সময়ে জলধর'-রূপী অর্দ্ধেন্দু ব'লে উঠলেন, 'আমায় তো কথায় কথায় সন্দেহ করো, বলি, এই যে গলায় বাহারের মালা দুলছে—মালাটি ঝোলালে কে? বল্ দিলে কে?' গুলফম্‌হরি তৎক্ষণাৎ দর্শকের আসনে উপবিষ্ট সলোমন সাহেবকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এই আমার নন্দাই।' দর্শকরা হো হো করে হেসে উঠলেন এবং অর্দ্ধেন্দুর যোগ্য সহ-অভিনেত্রীর ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে সকলে একবাক্যে গুলফম্‌হরির প্রশংসা করতে লাগলেন।

মিনার্ভা থিয়েটারে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'শিরী-ফর্‌হাদ' গীতিনাট্যের রিহার্সাল চলছে। নৃত্য-শিক্ষক সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়ি বাবু) 'মহবুব'-এর পার্ট করবেন। মহবুবকে একটা দৃশ্যে 'হো হো' ক'রে হাসতে হাসতে স্টেজে ঢুকতে হবে। কড়িবাবু সেই হাসিটি ঠিক আনতে পারছেন না, হাসিতে যেন প্রাণ নেই। কড়িবাবু অর্দ্ধেন্দুকে ধরে বসলেন,—'সাহেব, যাতে আমার হাসি প্রাণের সঙ্গে বোরোয় সেইরকম আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে।' অর্দ্ধেন্দুশেখর 'আজ নয় কাল' এই বলে পাশ কাটিয়ে যান। কড়িবাবু রোজই অনুরোধ করেন আর অর্দ্ধেন্দুর রোজই এক কথা। কড়িবাবু হতাশ হয়ে আর অনুরোধ কর্তেন না। সেকালে বাংলা থিয়েটারে নতুন নাটকের প্রথম অভিনয় রাত্রে অভিনেতৃরা আচার্য ও বিশিষ্ট অভিনেতাদের নমস্কার না ক'রে মঞ্চে উঠতেন না। 'শিরী-ফর্‌হাদ'-এর প্রথম অভিনয় রাত্রে অভিনেতৃরা নামবার আগে প্রচলিত প্রথামত বড়দের নমস্কার করলেন। কিন্তু কড়িবাবু অভিমানবশতঃ অর্দ্ধেন্দুশেখরকে নমস্কার করলেন না। অর্দ্ধেন্দু কড়িবাবুর এই বিপরীত আচরণের কারণটি বুঝলেন কিন্তু কিছু বললেন না। যে মুহূর্তে কড়িবাবু স্টেজে ঢুকে সেই 'হো হো' হাসিটি হাসতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে উইংসের পাশে তিনি একটা শব্দ শুনে চাইলেন, দেখলেন অর্দ্ধেন্দু উলঙ্গ হয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। কাড়বাবু সেই দৃশ্য দেখে হো হো ক'রে হাসিতে ফেটে পড়লেন এবং সেই রকম হাসতে হাসতেই অভিনয় ক'রে যেতে লাগলেন। হাসির অভিনয়টি হ'ল অসাধারণ। অভিনয় শেষে কড়িবাবু সাজঘরে গিয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখরের পায়ের ধুলো নিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর কড়িবাবুর পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে বললেন, 'কেমন, প্রাণের হাসি শিখলি তো, বড় যে অভিমান করেছিলি!' উত্তরকালে কড়িবাবু বলতেন—'সে ছবি আজও পর্যন্ত আমি ভুলতে পারি নি এবং এমন নতুন রকমের শিক্ষাও কারুর কাছে পাই নি।'

গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সেকালের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাক্‌চির 'সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেব'-এর চিত্রটি সে সময়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। শিল্পী সেই চিত্রে মহাদেবকে দীর্ঘজটাসহ দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গুম্ফে ভূষিত করেছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের একজন চিত্রকর (আর্টস্কুলের ভূতপূর্ব ছাত্র) সেই চিত্রখানি অর্দ্ধেন্দুশেখরকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন মশায়, আমাদের গুরুদেব কি স্বাভাবিক (Natural) মহাদেবের ছবি এঁকেছেন। এ পর্যন্ত যে সব বিখ্যাত শিল্পী মহাদেবের ছবি এঁকেছেন, তাঁরা সকলেই মহাদেবের বড় বড় জটা ও গোঁফ দিয়েছেন, কিন্তু কেউই দাড়ি আঁকেন নি। এটা Unnatural নয় কি?' অর্দ্ধেন্দুশেখর বললেন, 'বাপু, তোমরা কেউ কিছু সূক্ষ্মভাবে বোঝ না, কেবল natural, natural ক'রে চিৎকারে দেশটার সর্বনাশ করলে। বাপু, তোমার গুরুদেব তো বড় বড় দাড়ি দিয়েছেন, কিন্তু মহাদেবের হাতে বড় বড় নখ দেননি কেন, তাহলে তো আরও natural হ'ত। বিলিতিভাবে আর্টস্কুলের শিক্ষায় তোমাদের এই natural ভাব দাঁড়িয়েছে। আরে আহাম্মক, তোরা সব কি বুঝবি, আমাদের দেবতারা সব চিরযৌবন, সেইজন্যে কোন দেবতার দাড়ি নেই। পুরুষের যৌবন-লক্ষণ গোঁফের রেখায় এবং স্ত্রীলোকের যৌবন-লক্ষণ পীনোন্নত স্তনে, কেউ তলিয়ে দেখেও না, বোঝেও না, কেবল একটা পড়া বুলি শিখেছে—natural, natural!'

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

### বাংলা রঙ্গালয়ে অভিনয়ের ধারা : অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়

আধুনিক ভারতীয় অভিনয়-শিল্পের ত্রিকূটগিরি অর্দ্ধেন্দুশেখর-গিরিশচন্দ্র-শিশিরকুমার।

"বিগত একশত বৎসরে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ দেশকে যে অমিত ঐশ্বর্য দিয়াছে তাহার আদিপ্রান্তে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, মধ্যপ্রান্তে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও আধুনিক অধ্যায়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী, এই তিনটি নামই সমুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের মতো চিরদিন দ্যুতি বিকিরণ করিবে।...চলতি বাজারে গিরিশচন্দ্রের ধারাই দীর্ঘকাল চলিয়াছে। শিশিরকুমারই তাঁহার স্রোত ভিন্নমুখে প্রবাহিত করেন।" *

অর্দ্ধেন্দুশেখর-গিরিশচন্দ্র-শিশিরকুমার। দেশে সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও গঠন এবং তার উন্নতিবিধানের চিন্তা ছাড়া এই তিন যুগন্ধর পুরুষের অন্য চিন্তা, অন্য ধ্যান ছিল না। সেকালের সামাজিকবর্গ অভিনেতৃসম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না, পদে পদে নিন্দা, বিদ্রূপ ও বিরোধিতা করেছিলেন। বিস্তর সামাজিক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাঁদের সহ্য করতে হয়েছিল। তবু এই তিন মহাপুরুষ তাঁদের আরব্ধ কর্ম থেকে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হন নি। এঁদেরই আত্মত্যাগে নাট্যাভিনয় বৃত্তিটি আজ সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে। এঁদের অতুলনীয় সৃজনীপ্রতিভা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করেছে। এই তিন মহারথেরই ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও শিশিরকুমারের কৃতিত্ব একমাত্র নাট্যক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু গিরিশচন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। গিরিশচন্দ্র একাধারে কবি, নিবন্ধকার ও নাট্যকার। স্বয়ং শিশিরকুমার ( ১৮৮৯-১৯৫৯ ) তাঁর পূর্বসূরীদের সম্পর্কে লিখেছেন : "অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী দুরন্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।...অর্দ্ধেন্দুশেখর অভিনেতা হিসাবে গিরিশচন্দ্রের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। শিক্ষকহিসাবে তিনি গিরিশচন্দ্রের চেয়ে অধিকতর কৃতকার্য হয়েছিলেন।...অর্দ্ধেন্দুর কাছে শিক্ষালাভ করেছেন এমন নট ও নটী বাংলার রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য।...নিজে খুব বড় অভিনেতা না হোলে, অভিনয় সম্বন্ধে খানিকটা তত্ত্বজ্ঞান না থাকলে (theoretical knowledge), কেউই একটা অভিনেতৃমণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন না। গিরিশচন্দ্র অভিনয়কলায় theory ও practice দুই বিষয়েই তাঁর সহযোগীদের মধ্যে

* 'যুগান্তর' সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য, বুধবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৬৬।

ছিলেন দক্ষতম। অনেকের ধারণা উচ্চশ্রেণীর অভিনয়নৈপুণ্য অর্জন করতে হলে লেখাপড়া জানার বিশেষ প্রয়োজন নেই। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। লেখাপড়া ও পঠিত বিদ্যা নটের বিশেষ প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্রের বিদ্যার পরিধি ছিল সুবিস্তৃত। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে বহুবিস্তৃত ইংরাজি সাহিত্য তার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পরিচয় সামান্য ছিল না। ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস ও নাট্যসমালোচনার প্রায় সকল বিভাগেই তিনি লব্ধপ্রবেশ ছিলেন। সমসাময়িক ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসও তাঁর অজানা ছিল না। বহু প্রবন্ধে তিনি তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। সাহিত্যের দর্শন বিভাগেও তাঁর অধিকার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার লাভ করে।"*

শিশিরকুমার অন্যত্র বলেছেন :

"অভিনেতা হিসাবে অর্দ্ধেন্দুবাবু গিরিশবাবুর চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু গিরিশবাবুর ছিল realism, ছিল দর্শক-বিচারের ক্ষমতা। আরও একটি কথা, গিরিশবাবুই বাংলা মঞ্চকে লাইফ দিয়েছেন, মঞ্চকে বাঁচাবার জন্যে compromise করেছেন।...অর্দ্ধেন্দুবাবু কিন্তু ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত।"**

অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্র অনেক সময়ে একত্রে ও অনেক সময়ে বিরোধী থিয়েটারে কাজ করেছেন তবু উভয়ে উভয়ের অনুরাগী বন্ধু ছিলেন, দুজনেই দুজনের প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতেন; মতের বিরোধ থাকলেও বাহ্যত মনের বিরোধ ছিল না।

মিনার্ভায় 'বলিদান'-এর রিহার্সাল চলছে, একদিন গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুকে বললেন, 'দ্যাখ্ অর্দ্ধেন্দু, তুই যদি আগে মরিস্ আমি বুঝবো থিয়েটারের কি ক্ষতি হলো, আর যদি আমি আগে মরি তুই বুঝবি কি অনিষ্ট হলো, আর সকলে মুখে কেবল আহা করবে।'†

গিরিশচন্দ্র লিখেও গেছেন : "...কাহারও কাহারও ধারণা আমরা উভয়ে উভয়ের বিরোধী ছিলাম। এ ভুল অর্দ্ধেন্দুর একটি কথায় দূর হইবে। অর্দ্ধেন্দু অনেকবার বলিয়াছেন, যে গিরিশ ঘোষ যদি আগে মরে, তাহা হইলে আমি ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই, আর আমি যদি আগে মরি, সে ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই।"‡

* 'বাংলা রঙ্গমঞ্চের উৎপত্তি ও গিরিশচন্দ্র' : 'গল্পভারতী', ভাদ্র ১৩৬৫।

**. দ্র. রবিমিত্র ও দেবকুমার বসু প্রণীত 'শিশির সান্নিধ্যে', পৃ. ২৮।

† দ্র. অপরেশচন্দ্রের '৺অর্দ্ধেন্দুশেখর' : 'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ ১৩২১।

‡ দ্র. 'নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী'।

অর্দ্ধেন্দুশেখর অমরদত্তকে একবার বলেছিলেন, 'গিরিশ ঘোষের মত নাট্যকার আমিও কখন পাব না এবং তার নাটক উজ্জ্বল করতে আমার মত অভিনেতা গিরিশ ঘোষও কখনও পাবে না।'*

সেকালের অভিনয় ও নাটক-প্রযোজনা সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেষণ ক'রে অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় ও অভিনয়-শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কে সমসাময়িকদের সাক্ষ্য উপস্থাপিত করবো।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বলছেন :

"গিরিশবাবুরা চরিত্রের সমগ্রতার ধারণা করে অভিনয় করতেন বটে, কিন্তু (নাটকের) সমগ্রতার ধারণা রাখতেন না। দৃশ্য থেকে দৃশ্যেই অভিনয় করতেন। Production-এর সমগ্রতার ধারণা নিয়ে প্রথম নাটক আমরাই করি—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।** ..." (রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু প্রণীত—'শিশির সান্নিধ্যে', পৃ ৫৬)

অভিনয়শিক্ষকরূপে শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের ঊর্ধ্বে অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্থান নির্দেশ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের মহলা দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাক-শিশিরযুগের অভিনেতা হীরালাল দত্ত 'নাচঘর'-এ লিখেছিলেন : "মহলা দিবার সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, অমৃতলাল বসু মহাশয়, অমৃতলাল মিত্র মহাশয় প্রমুখ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাও সকলেই উপস্থিত থাকতেন।...নটগুরু গিরিশচন্দ্রই মহলা দেওয়াতেন এবং প্রায়শঃ তাঁহার শিষ্য, সহকর্মী এবং বন্ধু অমৃতবাবুদ্বয়ের যে কেহ উপস্থিত থাকতেন তাঁকেই 'ওহে অমৃত, বল বল' ব'লে স্বয়ং নিবৃত্ত হ'তেন। শুধু যে নির্বাচিত নাটকখানিরই মহলা হ'ত তা নয়, সেই সঙ্গে নাট্যোল্লিখিত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক উক্তির বিশদ আলোচনা ও ব্যাখ্যা হ'ত। এমনকি রঙ্গালয়ের ব্যবহার্য দ্রব্যাদির দ্বারা সাধনীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও হ'ত।" [হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার' (১৩৬১) পুস্তক থেকে পুনরুদ্ধৃত, পৃ. ৬৭]

অমৃতলাল বসুর মহলা দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন : "তিনি নিজে ছিলেন রসিক পুরুষ, মহলাতেও নিযুক্ত থাকতেন রসালাপ করতে করতে। যে যেমন দরের শিল্পী তাকে সেইভাবেই শেখাবার

* দ্রঃ রমাপতি দত্ত প্রণীত 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ', পৃ. ৪২৭।

** ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ষ্টার থিয়েটারে Old Club কর্তৃক অভিনীত। শিশিরকুমার প্রয়োগকর্তা ছিলেন।

চেষ্টা করতেন। কিন্তু কারুকে নিয়ে সমানভাবে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকতে তাঁকে দেখি নি, যে গুণ নাকি গিরিশচন্দ্রেরও ছিল না। আগেকার দিনে এই গুণ ছিল অর্দ্ধেন্দুশেখরের এবং আজকের দিনে এ গুণ আছে শিশিরকুমারের।' (তদেব, পৃ. ৬৮)

অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র জানাচ্ছেন :—

"বাঙ্গালায় অর্দ্ধেন্দুশেখর একজন বড় অভিনেতা ছিলেন। যাঁহারা ইউরোপে নানা দেশীয় রঙ্গমঞ্চে বড় বড় অভিনেতার অভিনয় দেখিয়াছেন, আর বাঙ্গালায় অর্দ্ধেন্দুশেখরকেও অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ইউরোপে জন্মিলে তিনি ইউরোপের নট-তালিকায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। অথচ অর্দ্ধেন্দুশেখরের এই অপূর্ব অভিনয়ভঙ্গি কেমন, তাহা লিখিয়া জানান অসম্ভব কতকগুলি বাছা বাছা বিশেষণ ছাড়া নটের অস্তিত্বের আর কোন চিহ্নই থাকে না, এবং সেসব বিশেষণ পড়িয়াও সাধারণ পাঠকের বা রঙ্গজীবীরও বিশেষ কোন লাভ হয় না। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, অর্দ্ধেন্দুশেখর কেবল নট ছিলেন না, তিনি ছিলেন নাট্যাচার্য; শিক্ষকতায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। সুতরাং নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখরকে বুঝিবার বা জানিবার সুযোগ এখন আর না থাকিলেও আচার্য অর্দ্ধেন্দুশেখরকে তাঁহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি হইতে অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। আমি সৌভাগ্যবশতঃ বহু বর্ষ ধরিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখরের রিহারস্থাল দেওয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, এবং তাঁহার নিকট কিছু শিখিবারও চেষ্টা করিয়াছিলাম। কাজেই কিভাবে তিনি প্রথম শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন, সংক্ষেপে আমি আজ তাহাই বলিব। ইহাতে সাধারণের না হউক, প্রথম শিক্ষার্থিগণের কিছু উপকার হইতে পারে।

"প্রথম শিক্ষার্থীর প্রথম শিক্ষণীয়—সু-আবৃত্তি করা। আগে এই আবৃত্তির কথাই কিছু বলিব।

"উচ্চারণের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।* চরিত্রভেদে তিনি উচ্চারণের তারতম্য করিতেন। উচ্চারণের বিশুদ্ধতা—লঘু, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরের প্রয়োগ তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া শিখাইতেন। হ্রস্ব দীর্ঘের মাত্রা বজায় রাখিয়া তিনি

* সেকালের অভিনেতাদের উচ্চারণ সম্বন্ধে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বলেছেন : "গিরিশবাবুর উচ্চারণ মোটামুটি ভালোই ছিল। দু'একটা উচ্চারণের ভুল এখনো মনে আছে। একটা হল মুন্ত্রী—মন্ত্রী উনি কিছুতেই বলতে পারতেন না, বলতেন মুন্ত্রী। আর একটা—কুহক। ওটাতে আমারই গোলমাল হয়, কুহকীর কুহকে পড়ে গেছি আর কি। উচ্চারণ ভালো করতেন অমৃতমিত্তির আর অর্দ্ধেন্দুবাবু। অর্দ্ধেন্দুবাবুর তো কোনই দোষ ছিল না।" (দ্রঃ রবিমিত্র ও দেবকুমার বসু প্রণীত 'শিশির সান্নিধ্যে', পৃ. ১৪০)

যাহা পাঠ করিতেন, তাহা বড়ই শ্রুতিমধুর হইত, কোন মতে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইত না। কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি, অর্দ্ধেন্দুশেখরের মুখে এই উচ্চারণ-ভঙ্গি যেমন মিষ্ট লাগিত, অনেক সময়ে তাঁহার শিষ্য বা শিষ্যার মুখে তেমনটি মিষ্ট লাগিত না। তাঁহার মুখে যাহা সহজ ও স্বাভাবিক, অন্যের মুখে অনেক সময়েই তাহা শ্রুতিকটু ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত। ছন্দ কাটিয়া যাইত, কিন্তু উচ্চারণের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখিতে গিয়া ভাব-বেচারী মাঠে মারা যাইত।

"এই উচ্চারণ 'দুরস্ত' করিবার নিমিত্ত তিনি প্রথম শিক্ষার্থীকে স্তব-স্তোত্র পাঠ করিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন, ইহাতে জিভের আড় ভাঙ্গে; আর উচ্চ কণ্ঠে ছন্দ ও মাত্রা বজায় রাখিয়া সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করায়,—নটের আর একটা বড় লাভ হয়—তাহার দম বাড়ে। মহাকবি গিরিশচন্দ্রকেও বলিতে শুনিয়াছি, বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাস্তোত্র প্রভৃতি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিলে নটের ইহকালে প্রত্যক্ষ লাভ হয়—তাহার দম বাড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর ছেলের পরকালের জন্য কিছু পুণ্যসঞ্চয় হইতে পারে।

"প্রত্যেক শব্দটির প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন, আবৃত্তি এমনই হইবে যেন প্রত্যেক কথার অর্থ, রস ও প্রয়োগের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। অনেক নট মোটামুটি আবৃত্তি করেন মন্দ নয়, কিন্তু নাটককার প্রত্যেক কথাটি ভাবিয়া চিন্তিয়া ওজন করিয়া যেমনভাবে বসাইয়াছেন, তাহার প্রতি অনেক সময়েই আবৃত্তিকারীর লক্ষ্য থাকে না। ইহাতে নাট্যকারের শব্দপ্রয়োগের উদ্দেশ্য 'মাঠে-মারা' যায়। ব্যষ্টিকে লইয়া সমষ্টি, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ভাব প্রকাশও হয় না। কিন্তু এইরূপ বিশুদ্ধ উচ্চারণের ও প্রত্যেক কথার অর্থ ও রসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আবৃত্তি করায় আর একটি বিপদ আছে। বলিবার অভ্যাস স্বভাবে পরিণত না হইলে এই আবৃত্তি অনেক সময় শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে।

"অভিনয়-কালে, দীর্ঘ বক্তৃতা করিবার সময়, অনেক অভিনেতাকেই হাঁপাইয়া পড়িতে দেখা যায়। অনেকে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ করেন—কিন্তু প্রত্যেক ছেদের পূর্বের কথা দমের অভাবে ডুবিয়া যায়, শ্রোতারা শেষের কথাগুলি শুনিতে পান না; এবং শেষের কথাগুলি এত তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলেন, মনে হয় যেন তিনি মোট ফেলিয়া বাঁচিলেন। আবৃত্তির পক্ষে ইহা অতি নিন্দনীয়। অর্দ্ধেন্দু-শেখর শিক্ষার্থীকে প্রথমেই বলিতেন,—'দেখ বাপু, লোকে পয়সা খরচ ক'রে তোমার কথা শুনতে এসেছে। গ্যালারীর যে দর্শক আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে সকলের শেষ বেঞ্চে বসে, সে যদি তোমার সব কথা শুনতে না পায়, তাহ'লে

মনে রেখো তুমি তাকে আট গণ্ডা পয়সা ঠকালে। এরূপ জুয়াচুরি করবার কোনো অধিকার তোমার নেই; প্রত্যেক কথাগুলি সুস্পষ্ট হবে, আর তা অডিটরিয়মের সকল স্থান থেকেই শোনা যাবে, এমনি ভাবে বলা অভ্যাস কর।, বলিতে বলিতে যাহাতে বেদম না হয়, এই নিমিত্ত তাঁহার উপদেশ ছিল, একটা দীর্ঘছত্র বলিবার পূর্বে এক পেট নিঃশ্বাস টানিয়া লওয়া, এবং ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ছত্রটি শেষ করা। ছত্র সুদীর্ঘ হইলে বা আবৃত্তিকারীর দমে না কুলাইলে মাঝে মাঝে চোরা দম লইবার ব্যবস্থাও ছিল। এই চোরা দম্ খুব বেশী অভ্যাসের কাজ। চুরির বাহাদুরী, যদি না পড়ে ধরা। অনেক কাঁচা চোর এই চোরা দম লইতে গিয়া আপনাদের অক্ষমতাকে সুস্পষ্ট করিয়া শ্রোতাকে ধরাইয়া দেন। তাঁহারা যখন আবৃত্তি করেন, তখন দম লইবার সময় তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে—এমনি বোমা বসাইলে 'কোঁক্' বাহির না হইলেও—'কোঁক্—কোঁক্' করিয়া একরূপ বিকৃত শব্দ বাহির হয়। এইরূপ আবৃত্তি করাকে 'গুণটানা' বলে। নাক দিয়া নিশ্বাস না লইয়া মুখ দিয়া তাড়াতাড়ি নিশ্বাস টানিতে গেলেই—এই গুণটানার গুণ জাহির হইয়া পড়ে। অর্দ্ধেন্দুশেখর এই গুণটানা আবৃত্তির উপর খড়্গহস্ত ছিলেন।

"শিক্ষাদান-কালে অনেক সময় অনেক শিক্ষার্থীকে লইয়া হাসির হর্‌রাও উঠিত। নীলদর্পণে এক পূর্ববঙ্গীয় কবিরাজের ভূমিকা আছে। কবিরাজ বলিতেছেন, 'ডাক্তারী চিকিৎসা বড় ব্যয় বাহুল্য'। এই 'ব্যয় বাহুল্য' কথাটা পূর্ববঙ্গীয় ধরণের উচ্চারণ শিখাইবার সময় তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অতি হাস্যজনক। অভিনেতা কিছুতেই বলিতে পারিতেছেন না—'ব্যাবাহুল্য'। অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহাকে বলিলেন, 'পাঁঠা কি করিয়া ডাকে?' উত্তর—'ব্যা-ব্যা।' 'আচ্ছা, এইবার বল ব্যা-ব্যা-হুল্য।' শিখানও হইল, হাসিরও রোল উঠিল।

"শিক্ষাদান-কালে উচ্চারণের প্রতি তিনি কিরূপ লক্ষ্য রাখিতেন, তাহা বলিলাম। কিন্তু কেবল উচ্চারণই অভিনয়ের সবটা নহে। চরিত্রের conception (অনুধ্যান) এবং তদাশ্রিত রসের বিকাশই অভিনয়ের প্রাণ। সুমিষ্ট স্বর—যে স্বর ইচ্ছামত ও সহজে উচ্চ ও নিম্নগ্রামে আনা যায়, সেই স্বরই বহু রস বিকাশের উপযোগী। এইরূপ গলা তৈয়ারি করিতে রীতিমত সাধিতে হয়। সংস্কৃত স্তবাদি পাঠ ও আবৃত্তি করিয়া, যেমন দম বাড়াইতে হয়, তেমনি উচ্চৈঃস্বরে—মেঘনাদ বধ, পলাশীর যুদ্ধ বা ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা কোনও নাটক হইতে, উত্তেজনাপূর্ণ কোন অংশ লইয়া নিয়মিতরূপে নির্দিষ্ট সময়ে আবৃত্তি করিতে হয়।

এবং এইরূপ আবৃত্তি করিবার সময় ভাব ও সু-উচ্চারণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করিলে, গলাও সহজে তৈয়ারী হইয়া যায়।

"স্বর তৈয়ারি হইলে অভিনয়কালে স্বর-সংযম অভ্যাস করিতে হয়। এই স্বর-সংযম কি? অভিনয় কালে প্রতি অভিনেতা যদি উচ্চকণ্ঠে অভিনয় করিয়া যান, তাহা হইলে অভিনয় নিতান্ত অস্বাভাবিক হয়। প্রত্যেক অভিনেতার উচিত চেষ্টা করা,—যতটা সম্ভব স্বাভাবিক স্বরে অভিনয় করা। গলা গম্ভীর না হইলে নিম্নস্বরের উচ্চারিত কথা গ্যালারী পর্যন্ত পৌঁছায় না। ইচ্ছা করিলে প্রয়োজন-অনুসারে স্বর গম্ভীর ও উচ্চ করিবার নামই স্বর-সংযম। অনেকে বড় অভিনেতার অভিনয় অনুকরণ করিতে গিয়া—স্বর-সংযমের অভ্যাস বা শক্তি না থাকায়, অভিনয় এমন শ্রুতিকটু করিয়া ফেলেন যে তাহা দর্শকের নিকট নিতান্ত একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর হইয়া উঠে। অর্দ্ধেন্দুশেখর এইরূপ বিকৃত ও অস্বাভাবিক অভিনয়ের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। তাঁহার বরাবরই চেষ্টা ছিল, তাঁহার নিকট যাঁহারা শিখিবেন, তাঁহারা যেন অভিনয় করিতেছি—এমন একটা বিকট ভঙ্গীর সহিত অভিনয় করিয়া রসের বিপর্যয় না করেন। কিন্তু ইহার ফলে—অনধিকারীর হাতে পড়িয়া এইরূপ শিক্ষার একটা বিপত্তিও হইত। অভিনয়কে স্বাভাবিক করিতে গিয়া অনেকে এমন স্বাভাবিক করিয়া ফেলিতেন যে, অনেক সময় তাহাদের অভিনয় ডাল-ভাত খাওয়ার মত অত্যন্ত ভ্যাদ্‌ভেদে হইয়া পড়িত। শুধু আবৃত্তি ও উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অভিনয়কে এইরূপ স্বাভাবিক করিতে গেলে অভিনয় প্রাণশূন্য হইয়া পড়ে। অভিনেতাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় দুইটি দল আছে। একদল স্বাভাবিক অভিনয়ের পক্ষপাতী; আর একদল একটা-না-একটা বিশেষ ভঙ্গীর সহিত অভিনয় করিয়া থাকেন। এই স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের পক্ষপাতী দলের লড়াই চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। কোন্‌টা যে ঠিক তাহা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারেন এবং দর্শকরাও যে, যেটি ঠিক, অভিনয়কালে তাহার মূল্য ধরিয়া দেন না, তাহাও নহে।

"মহাকবি গিরিশচন্দ্র বলিতেন, 'অভিনয় জিনিসটাই ঠিক স্বাভাবিক নহে। ইহা—as if natural।' * বঙ্কিমবাবুর ভাষায় ইহাকে 'স্বভাবানুকারী অথচ

* আর অর্দ্ধেন্দুশেখর বলতেন, "বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি (যদি ঐ নামের কেউ থাকেন)। রঙ্গমঞ্চ ঐ পৃথিবীর অনুকরণে মানুষের সৃষ্টি। এখানে জগতের সুখদুঃখময় ঘটনার ছায়া দেখাইয়া আমরা আনন্দ উপভোগ করি। দর্শকেরও আনন্দ, অভিনেতারও আনন্দ। আমি নরহরি ভট্টাচার্য। থিয়েটারে সিরাজদ্দৌলার অভিনয় করিলাম। নানা মণিরত্নখচিত রাজপরিচ্ছদ, নানা রত্নখচিত

স্বভাবাতিরিক্ত' বলিতে পারা যায়। নাটকে বাস্তবও আছে, স্বভাবাতিরিক্তও আছে। যাহা বাস্তব, তাহার অভিনয়ে স্বাভাবিকতার প্রয়োজন ; যাহা স্বভাবাতিরিক্ত, কাল্পনিক,তাহার সুর বস্তুতন্ত্রের ঊর্ধ্বে বাঁধা। স্বাভাবিক কান্না, নাটকের কান্না নহে ; কারণ উভয়ের ভাষায় বিভিন্নতা বর্ত্তমান। নাটকের পাত্র-পাত্রী বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে ফুটিয়া উঠে। লিয়রের অভিশাপ প্রদান, আর রাম-শ্যামের স্বাভাবিকভাবে অভিশাপ প্রদানের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। অভিশাপ-দানের উপলক্ষ্য স্থান ব্যক্তি ও ভাবকে আশ্রয় করিয়া মহাকবির লেখনী যে ভাষা প্রসব করিয়াছে,—অভিনয়ে তাহার রস ফুটাইতে হইলে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকতা দুইএরই মিশ্রণ প্রয়োজন। এইরূপ মিশ্রণে যে অভিনয় হয়, তাহাতেই art ফুটিয়া উঠে।

"অর্দ্ধেন্দুশেখর সুর-বর্জিত আবৃত্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন, যাহাতে Blank Verse, গদ্যের ন্যায় উচ্চারণে অভিনীত হয়। গুণ-টানা বা সুরেলা অভিনয় তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। পাঠক দেখিবেন—ইহাও ঐ স্বাভাবিক অভিনয়ের ঝোঁকের ফল। আজিকালি এই সুর-বর্জিত অভিনয়ের দিকে অনেক অভিনেতার ঝোঁক অধিক। ইহা অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রবর্ত্তন। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার দিকেও অর্দ্ধেন্দুশেখরের দৃষ্টি ছিল প্রখর। তিনি শিক্ষাদানকালে ক্রমাগত Expression ও অঙ্গাদির সুষ্ঠু চালনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতেন। কলের পুতুলের মত একস্থানে গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় করাকে তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। সু-আবৃত্তি ও সু-অঙ্গ চালনার দিকে তাঁহার সমানই দৃষ্টি থাকিত। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অত্যধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনার পক্ষপাতী ছিলেন না। অত্যধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা অভিনয়কে হাস্যজনক করিয়া তুলে। মেঘনাদবধের—

নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা !
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর—

রাজমুকুট,, পদে বহুমূল্য ( সত্যকার বহুমূল্য নহে ) পাদুকাযুগল। দর্শককে কত হাসাইলাম, কত কাঁদাইলাম—আমার রাজ্য গেল, ঐশ্বর্য গেল, আত্মীয়-বন্ধু-স্ত্রী-পুত্র সবই গেল, শেষে ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিলাম। শোকের অবধি রহিল না। কিন্তু তাহাতে আমার কি আসে যায় ? আমি যে নরহরি, সেই নরহরি। ইহাই অভিনয়। কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত—নট কখনো প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। বাহ্যিক ও আন্তরিক সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য হয় না ; যে অংশ অভিনয় করিবে তাহা নট বুঝিতে পারে না।" ( মণি বাগচি প্রণীত 'শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার' পুস্তক থেকে পুনরুদ্ধৃত—পৃ ৭৬-৭৭। তথ্যের উৎস অনুল্লেখিত )

রাবণের এই অংশের অভিনয় তিনি অত্যধিক অঙ্গ-ভঙ্গীসহকারে এমন করিয়া বলিতেন যে, তাহা যে শুনিত সে হাসিয়া লুটাপুটি খাইত।" ('শিক্ষক অর্দ্ধেন্দু-শেখর' : 'রূপ ও রঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রিকা, কার্তিক, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

সমকালীন সাক্ষ্যে জানা যায় যে, গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষাপ্রণালীতে পার্থক্য ছিল। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় নট-নটীর বাচন হ'ত সুরেলা। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের এবং সামাজিক নাটকে নায়ক-নায়িকার ভাববিহ্বল মুহূর্তের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের শিষ্য-শিষ্যারা সুর দিয়ে flow দিতেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষায় নট-নটীর বাচনে সুর থাকত না—কেটে কেটে তাঁরা কথা বলতেন। একটি গিরিশচন্দ্রের স্কুল, অপরটি অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্কুল। এ ব্যাপারে ব্যোমকেশ মুস্তফীর সাক্ষ্য নেওয়া যাক্—

"আমাদের দেশে অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কোন নাট্যশালার সংস্রবে বিদ্যালয়বৎ কোন অনুষ্ঠান নাই বা 'লেকচার' দিয়া কোন কিছু শিখাইবার ব্যবস্থা নাই। অভিনেতা হইতে হইলে, প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়াদি কি, তাহা সাধারণভাবে অর্থাৎ এ বিদ্যার বর্ণ-পরিচয় হিসাবে,—শিখাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। অভিনয়-উদ্দেশ্যে কোন পুস্তক-বিশেষ যখন কোন নাট্যশালায় মহলা দেওয়া হইতে থাকে, তখনই যাহাদের ভাগ্যে যে যে ভূমিকা শিখিবার ভার পড়ে, সেই সেই ব্যক্তিকে তদ্গত বিষয়ের প্রয়োজন অনুসারে, যতটুকু কলা-কৌশল শিখাইবার আবশ্যক, ততটুকু শেখান হয়। অপর সকলকে উপস্থিত-মাত্র থাকিয়া দেখিতে-শুনিতে হয়। এই প্রথায় আজকাল যাহা ফল হইতেছে, আমাদের বিবেচনায়, তাহা আদৌ শিক্ষা নামেরই যোগ্য নহে। অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় এবং গিরিশবাবুর শিক্ষায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ৺মহেন্দ্রলাল বসু, ৺মতিলাল সুর, ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, ৺শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় স্বনামখ্যাত অভিনেতৃগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সকল অভিনেতার পর শিক্ষাদান-কার্যের ব্যবস্থা পরিবর্তিত হওয়ায়, গত বিশ-বাইশ বৎসরের মধ্যে যাঁহারা অভিনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অভিনয়-বিদ্যার মূলসূত্রগুলি কিছুই ধরিতে পারেন নাই এবং শিখিতেও পারেন নাই।...

"সাবেক 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার' ও 'বেঙ্গল থিয়েটারের' প্রতিযোগিতায় অভিনেতৃবর্গের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি ছিল। তখনকার শিক্ষকেরা স্ব স্ব শিষ্যবৃন্দকে প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের সাহচর্যে জয়লাভ করিতে চেষ্টা পাইতেন; কিন্তু যেদিন হইতে 'স্টার থিয়েটার' জন্মগ্রহণ করিল, 'ন্যাশনাল থিয়েটার' মারা গেল; স্টারে ও বেঙ্গলে প্রতিযোগিতা দাঁড়াইল, সেই দিন হইতে বঙ্গীয় নাট্যশালাম্বারা

একটি সুকুমার কলাবিদ্যার উন্নতি ও পুষ্টির দিক হইতে অধ্যক্ষগণের দৃষ্টি বিচ্যুত হইল এবং নাট্যশালাকে কেবল আনন্দপ্রদ, অর্থকর ব্যবসায়ের দিকে পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় অর্দ্ধেন্দুবাবু কলিকাতায় থাকিতেন না, একা গিরিশবাবু নাট্যবিদ্যার শ্রেষ্ঠ-শিক্ষকরূপে অবস্থান করিয়া স্টার থিয়েটারের অভিনেতৃদলকে এক নূতন প্রথায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু-দ্বারা ঐ সময়ে যে নবীন শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই গুণে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি স্টারের বর্তমান প্রবীণ অভিনেতৃগণের উদ্ভব হইল। ঐ প্রণালীর শিক্ষাতেই শিক্ষিত হইয়া উত্তরকালে মিনার্ভা থিয়েটার হইতে শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ, শ্রীযুক্ত অনুকূল বটব্যাল-প্রভৃতি অভিনেতৃবর্গের উদ্ভব হইয়াছে। এই সময়ে সহরের নানা স্থানে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নাট্যসম্প্রদায় স্থাপিত হইতে থাকে এবং সেই সকল সম্প্রদায়, উপযুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে গিরিশবাবুর প্রতিষ্ঠিত এই নবীন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, অনেকগুলি নাট্যামোদী যুবক-অভিনেতার দল বর্ধিত করে। এই সকল অভিনেতার মধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারের বর্তমান অভিনেতা শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু), শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীকুঞ্জ-বিহারী চক্রবর্তী, শ্রীতারকনাথ পালিত, ক্লাসিক থিয়েটারের শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি-এ, শ্রীগোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅহীন্দ্রনাথ দে প্রভৃতির নাম করা যায়।

"আমরা পূর্বে বলিয়াছি, গিরিশবাবুর প্রতিষ্ঠিত নবীন শিক্ষা-প্রণালী বঙ্গীয় নাট্যশালাকে কেবল অর্থকর ব্যবসায়ের পদবীতে আরোহণ করাইবার বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই ইহার প্রতি নাট্যসম্প্রদায়ের অধিকারীরা স্বার্থবশে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে স্টার, এমারল্ড্, মিনার্ভা, বেঙ্গল প্রভৃতি সকল নাট্যশালাতেই অভিনয়ের উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি নষ্ট হইয়া আর্থিক উন্নতির প্রতি পড়িল। এমারল্ড্-থিয়েটার ও মিনার্ভা-থিয়েটার স্থাপনের সময় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী আবার আসিয়া শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন স্টার থিয়েটারের দ্বাদশ-বর্ষব্যাপিনী চেষ্টায় নাট্যশালা হইতে পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীর ভাব এক প্রকার উন্মূলিত হইয়া গিয়াছিল, কাজেই অর্দ্ধেন্দুবাবু শিক্ষার ভার লইলেও একেবারে পুরাতন প্রথার পুনঃ-প্রবর্তন করিবার অবসর পাইলেন না। এমারল্ড্ থিয়েটারের প্রথম অভিনীত পুস্তক 'পাণ্ডব-নির্বাসন' একা অর্দ্ধেন্দুবাবুর

শিক্ষায় পুরাতন প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছিল। এই সময়ে অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইহলোকে নাই, কেবল কোহিনুরে সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুক্তপূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও ন্যাশন্যালে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় আছেন। দর্শকেরা লক্ষ্য করিবেন, ইঁহাদের অভিনয় প্রণালীই অপর সকল ব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্র এবং কত সহজ, কত সুন্দর ও কত মনোরম! তৎপরে একমাস পরেই গিরিশবাবু আসিয়া এমারল্ডে অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহার 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি তাঁহার স্টার থিয়েটারক্ষেত্রে দ্বাদশ-বর্ষের সুপরীক্ষিত নূতন শিক্ষাপ্রণালী এমারল্ডেও প্রবর্তিত করিলেন। তদবধি অর্দ্ধেন্দুবাবুর শতচেষ্টার বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাই প্রবলবেগে প্রচলিত হইল। গিরিশবাবু এই প্রণালী চালাইবার আর একটি সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজরচিত পদ্যছন্দের নাটক। প্রাচীন ন্যাশন্যাল থিয়েটারের শেষ দশা হইতে অর্থাৎ গিরিশবাবুর অধ্যক্ষতার সূত্রপাত হইতেই গিরিশবাবু গদ্যনাট্য-কাব্যের অভিনয় একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ছন্দের ঝঙ্কার রাখিতে গিয়া গিরিশবাবু যে সুরপ্রধান, সহজসাধ্য, অভিনয়প্রথা প্রবর্তিত এবং নিজে শিক্ষা দান করিয়া যাহার আদর্শ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা এই দ্বাদশবর্ষ পরে অর্দ্ধেন্দুবাবুর একার চেষ্টায় আর পরিশোধিত হইল না। মিনার্ভা থিয়েটারের স্থাপনাবধি গিরিশবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবু একত্র থাকিলেও গিরিশবাবুর নবীন শিক্ষাপ্রণালীতে সংস্কারবদ্ধ অভিনেতৃবর্গকে লইয়া অর্দ্ধেন্দুবাবু এখানেও পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই, কাজেই এখন এই নবীন শিক্ষা-প্রণালীরই প্রাধান্য রহিয়াছে। তবে শতবাধার মধ্যেও তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় কোন কোন অভিনেতাতে বেশ সুফল ফলিয়াছে দেখা যায়। শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), শ্রীযুক্ত কার্তিক চন্দ্র দে প্রভৃতি অভিনেতারা এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী সুশীলাবালা, শ্রীমতী সরোজিনী, শ্রীমতী হেনা, শ্রীমতী কিরণবালা, শ্রীমতী প্রকাশমণি, শ্রীমতী ভূষণকুমারী ( ছোট ), শ্রীমতী চপলা প্রভৃতি অভিনেত্রীরা অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় বিশেষ পটুতালাভ এবং কলাকৌশলের অনেকগুলি সূত্র শিক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেব, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রভৃতির অভিনয় প্রথাও অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) তাঁহার আদি শিক্ষক শ্রীঅমৃতলাল মিত্রের মত

একজন 'আড়ষ্ট' অভিনেতা ছিলেন। স্বীয় পিতা গিরিশবাবুর শিক্ষাতেও তাঁহার এই আড়ষ্টভাব ও সর্ব্বত্র করুণ ( যেন কান্নার মত ) স্বরে অভিনয়ের ঢঙ্ বদলায় নাই। শুনিয়াছি, তিনি রঙ্গমঞ্চে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দুবাবুর নিকট অভিনয় প্রণালীর কোন উপদেশ লইতেন না; কিন্তু 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'বলিদান' প্রভৃতির অভিনয়ে আমরা তাঁহার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছি। এই পরিবর্তন অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষায় শিক্ষিত পারিপার্শ্বিক অভিনেতৃবর্গের অভিনয়-প্রভাবে ঘটিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন আর আড়ষ্টভাব ও কান্নার স্বর ততটা নাই, তবে অস্থানে চীৎকার করা এখনও তিনি ছাড়িতে পারেন না।

"আজকাল যে প্রণালীতে নাট্যশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার উদ্ভাবনার ও প্রচারের ইতিহাস আমরা নাট্যশালার বাহিরে থাকিয়া যতটা অনুমান করিতে পারিয়াছি, তাহা এইস্থানে বিবৃত করিলাম। এক্ষণে গিরিশবাবুর এই নূতন প্রথাটি কি এবং তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, যথাজ্ঞান তাহার আলোচনা করিব।

"এই নবীন শিক্ষায় শিক্ষিত অভিনেতৃবর্গকে আমরা যেভাবে অভিনয় করিতে দেখি, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, ইঁহাদের মধ্যে অনেক অভিনেতারই এই বিদ্যার প্রথম-শিক্ষা অর্থাৎ 'বর্ণপরিচয়' পর্যন্ত হয় নাই। এই সকল অভিনেতা নাট্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া কথা বলিবার সময় মনে করেন, দর্শকেরাই তাঁহাদের কথোপকথনের পাত্র, সহযোগি-অভিনেতারা তাঁহাদের কেহই নহেন। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা কথা কহিবার সময় দর্শকগণের দিকে চাহিয়া, তাঁহাদের দিকেই হাত-মুখ নাড়িয়া মনোভাব প্রকাশ করেন, আর তাঁহাদের সহযোগী অভিনেতৃগণ অনাবশ্যক পাত্র-পাত্রীর ন্যায় দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণমাত্র করেন। 'স্বগত-বাক্য' অভিনয়ের সময়ে এই ব্যাপারটি বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। অনেকে আবার এতটা বিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন যে, কথোপকথনের মধ্যকালে কোন স্বগতবাক্য বলিবার সময় সহযোগী-অভিনেতাকে ছাড়িয়া নাট্যমঞ্চের সম্মুখপ্রান্তে সরিয়া আসিয়া স্বগতবাক্যের কথাকয়টি দর্শক-গণের দিকে চাহিয়া বলিয়া পুনরায় সহযোগীর নিকট ফিরিয়া যান। এরূপ করাটা যে দোষের, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু, গিরিশবাবু, অমৃতবাবু প্রভৃতি শিক্ষকগণও ইহা স্বীকার করিবেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, প্রত্যেক নাট্যশালায় প্রত্যহ-আচরিত এই দোষের নিবারণে কেহই যত্ন করেন না। সেদিনকার অভিনীত টাটকা নূতন নাটক 'মীরকাসিম' এবং 'উলুপীর' অভিনয়েও

আমরা এই দোষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, গিরিশ-বাবুর উদ্ভাবিত নূতন শিক্ষাপ্রণালীতে এই দোষ তিনি ইচ্ছা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, তবে একথা অবশ্যই বলিব যে, নাটামঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনেতা দর্শক-গণের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবেন, ভুলিয়া ভুলিয়া যাইবেন, কেবল অভিনেতব্য অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আপনাতে আরোপ করিয়া কথা বলিবেন, সহযোগী-অভিনেতার সহিতই আলাপের ভঙ্গীতে কথা কহিবেন, তাহার দিকে চাহিয়াই মুখ-চোখের ভঙ্গী দ্বারা বাক্যার্থ প্রকাশে চেষ্টা করিবেন,—অভিনয়ের এই মূল সূত্র, বোধ হয়, এখনকার কোন অভিনেতাকে শিখাইয়া দেওয়া হয় না বা শিখাইয়া দিলেও, তাহারা তাহা হৃদয়ঙ্গম ও তদনুসারে কার্য করিল কিনা, তাহা কেহ লক্ষ্য করেন না। অভিনেতার নিকট দর্শকগণের অস্তিত্বের এতটুকু পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে, তাঁহারা আছেন আর তাঁহাদিগকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া শুনাইতে হইবে। এই স্পষ্ট করিয়া শুনানর অর্থ ইহা নহে যে, অভিনেতারা প্রাণপণে সকল কথাই চীৎকার করিয়া উচ্চারণ করিবেন এবং কেবল দর্শক-গণকেই সম্বোধনের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া কথা কহিবেন। এই মূল-সূত্র উপদেশ দিতে এবং তাহা শিখাইয়া অভ্যাস করাইয়া দিতে, শিক্ষকের যে যত্ন ও পরিশ্রমের আবশ্যক, আমরা বহুকাল হইতে কোন নাট্যশালায় কোন শিক্ষককে তাহা করিতে দেখি না।

"অভিনয়-বিদ্যার 'বর্ণপরিচয়'-কালের শিক্ষণীয় আর একটি বিষয়ের প্রতি এখনকার অনেক অভিনেতার ঔদাসীন্য দেখা যায়। অনেক অভিনেতাই আজকাল রঙ্গমঞ্চে যাতায়াত করিতে ও দাঁড়াইতে জানেন না। চারি পাঁচজনে আসিতে হইলে, সকলেই সারি গাঁথিয়া আসেন, সারি গাঁথিয়া দাড়ান, আবার সারি গাঁথিয়া চলিয়া যান। ইহা এতই বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক বোধ হয়, যে এই প্রথার স্বপক্ষে বলিবার কিছুই নাই; বরং সময়ে সময়ে মনে হয়, ইঁহারা বুঝি কলের পুতুল অথবা বরযাত্রার রোশনাইর আলোকদণ্ডে দড়িবাঁধার ন্যায়, ইঁহাদেরও বুঝি কোমড়ে দড়ি বাঁধা আছে। এইরূপ দল বাঁধিয়া যাতায়াতের প্রয়োজন যদি কোন নাটকে পুনঃ পুনঃ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, আরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে জগৎশেঠ-রায়দুর্লভাদির পুনঃ পুনঃ আসা-যাওয়ার ব্যাপার এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।…গিরিশবাবুর নাটকগুলিতে দৃশ্য-সংস্থানের বেশ সুবন্দোবস্ত নাই। তাঁহার সমস্ত নাটকেরই অধিকাংশ দৃশ্য দাঁড়াইয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি এই দোষটি একপ্রকার অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজদ্দৌলার মধ্যে মধ্যে একমাত্র

সিংহাসনে উপবেশন ব্যতীত আর কোন দৃশ্যে কাহারও বসিয়া অভিনয় করিবার সুযোগ নাই এমন কি, শয়ন-গৃহের দৃশ্যে, দরবারে, বৈঠকখানাতেও কেহ বসে না। 'মীরকাসিম' নাটকে বক্সারের শিবির মধ্যেও শাহ্‌জাদার বসিবার ব্যবস্থা নাই। রণস্থল, পথ, বনপ্রান্ত, দুর্গদ্বার প্রভৃতি দৃশ্যে বসা যায় না, তাহা আমরা জানি, কিন্তু শিবির, কক্ষ, প্রাসাদ, রাজসভা, মন্ত্রণাগৃহ ইত্যাদি দৃশ্যে বসিবার ব্যবস্থা করিলে, এই দোষ যে প্রশমিত হইত না, এমন কথা গিরিশবাবু বলিলেও আমরা গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। এই সকল দৃশ্যে বসিবার ব্যবস্থা করিলে, পটপরিবর্তনাদির কিছু অসুবিধা হয়, এরূপ কৈফিয়ৎ আমরা মোটেই গণ্য করিব না, কারণ অপর গ্রন্থকার সে বাধা অতিক্রমের কৌশল না জানিতে পারেন; কিন্তু আবাল্য-নাট্যমঞ্চবিহারী, নাট্যমঞ্চভেদজ্ঞ গ্রন্থকার গিরিশবাবুর গ্রন্থে দৃশ্য-যোজনায় সে সকল বিষয়ে কোন গোলমালের আশঙ্কা আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি না। কাজেই গিরিশবাবুর নাটকাদিতে এরূপ দৃশ্যযোজনার জন্য উপবেশ-নাদির অসুবিধাজনিত অভিনয়কলার যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা গিরিশবাবুরই একপ্রকার অমনোযোগিতার ফল বলিতে হইবে।

"গিরিশবাবুর প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালীতে আর একটি দোষ আমরা বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। পদ্যময় নাটকের অভিনয়েই সে দোষ বেশী চোখে পড়ে। সেটি একঘেয়ে একটানা একসুরে আবৃত্তি। নব্য অভিনেতৃবৃন্দের অধিকাংশ ব্যক্তিই এই দোষে দোষী। অর্থ বুঝিয়া বচনীয় বিষয়ের উপযুক্ত স্বরভঙ্গী অনেকেই করেন না। গিরিশবাবু স্বরচিত পদ্যময় নাটকের অভিনয়ে ছন্দের ঝঙ্কার রক্ষার দিকে একটু বেশী দৃষ্টি দেওয়ায়, কালে অনুকরণ-দোষে তাহাও একটি সংক্রামক দোষে পরিণত হইয়াছে। এই দোষটি এমনই দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃ অর্থবোধের জন্য যে সকল যতি বা ছেদ লক্ষ্য করিয়া আবৃত্তি করা আবশ্যক, সে সকলের প্রতি লক্ষ্য মোটেই করা হয় না। আমরা দেখিয়াছি, অনেক অভিনেতা পাদচ্ছেদ, অর্ধচ্ছেদ এমনকি পূর্ণচ্ছেদের প্রতিও দৃকপাত করেন না। নব্য অভিনেতৃগণের অনেকের কাছে শুনা গিয়াছে, তাঁহারা একটা সুরের প্রবাহ (flow) রক্ষা করাকে বেশি আদর ও প্রাধান্য দিয়া থাকেন। কোন কোন বুদ্ধিমান অভিনেতাকে অর্থসঙ্গত ছেদ লক্ষ্য করিয়া আবৃত্তির প্রভেদ দেখাইয়া দিয়া এবিষয়ের ঔচিত্যানৌচিত্যের কথা বলিলে, তাঁহারা অন্য কোন যুক্তি তর্ক না তুলিয়া বলিয়া থাকেন,—অমুক অভিনেতা এরূপ অভিনয় করিয়া যখন সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তখন ইহাকে দোষের বলিয়া পরিত্যাগ করিলে, আমরাই আদর্শের নিকট পৌঁছিতে পারিব না এবং

দর্শকের তৃপ্তিবিধান করিতে পারিব না। এরূপ যুক্তি যে যুক্তিই নহে, তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। এই সকল অভিনেতার অভ্যাস এমনই বিপথে চালিত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাদিগের পক্ষে গদ্যাংশ অভিনয় করা কষ্টকর এবং দর্শকের শ্রবণের পক্ষে আরও হাস্যকর ব্যাপার হইয়া পড়ে। স্টার থিয়েটারে সাবিত্রীর অভিনয়ে এইরূপ হাস্যকর অভিনয় আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি।...

"এখন একটি কথার কৈফিয়ৎ আমাদিগকে দিতে হইবে। আমরা নবীন-শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তন গিরিশবাবুদ্বারা হইয়াছে বলিয়া একপ্রকারে গিরিশবাবুকে এই সকল দোষের উদ্ভাবক ও পরিপোষক বলিয়া তাঁহার কাছে হয়ত অপরাধী হইয়াছি, কিন্তু এ অপরাধের জন্য আমরা দণ্ডিত হইতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, যখন হইতে এই নবীন অভিনয়-প্রথা প্রচলিত হইল, তখন গিরিশবাবুর হাতে নাট্যসমাজ করামলকবৎ ঘুরিতে-ফিরিতে ছিল। তিনি যদি সে সময় স্বীয় শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া এই সমাজকে সুপথে চালিত করিতে চেষ্টা করিতেন, অর্দ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষা-প্রণালীকে বজায় রাখিয়া অভিনেতৃগণকে কেবল সুরে আবৃত্তি শিক্ষা না দিয়া অভিনয়-বিদ্যার মূল-সূত্রগুলি বুঝাইরা শিক্ষা দিতেন, তাহা হইলে, কখনই এ সকল দোষ নাট্যসমাজে প্রবেশ করিবার পথ পাইত না। যে ভাবে শিক্ষা দিয়া তাঁহারা নিজে থিয়েটারের আদিম অবস্থায় 'সধবার একাদশী' এবং 'লীলাবতী' অভিনয় করাইয়াছিলেন, যে ভাবে শিক্ষা দিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবু 'নীলদর্পণ', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই-বারিক' প্রভৃতি অভিনয় করাইয়াছিলেন ; সে ভাবে শিক্ষা দিবার কৌশল বা ক্ষমতা যে ৺প্রতাপচাঁদ জহুরীর অধিকারে ন্যাশানাল থিয়েটারের সময়ে বা স্টার থিয়েটার স্থাপনের সময়ে গিরিশবাবু ভুলিয়া গিয়াছিলেন বা তাঁহার পক্ষে অবলম্বন করা অসাধ্য হইয়াছিল, একথা আমরা তো স্বীকার করিবই না এবং এ মোকদ্দমায় জিতিবার ইচ্ছা থাকিলেও গিরিশবাবু করিবেন না। আরও একটা কথায় আমরা গিরিশবাবুর এই ইচ্ছাকৃত অপরাধের প্রমাণ দিতে পারি,—সেটা তাঁহার নিজকৃত অভিনয়। তিনি নিজে তাঁহার নিজের পুস্তকের অভিনয়ে, রাম, মেঘনাদ, দক্ষ, প্রভৃতি সাজিয়া, কখনও সুরটানা, একঘেয়ে কমা-ফুলস্টপ্-হীন অভিনয় করেন নাই অথচ তাঁহারই সম্মুখে অপরে বিপরীত-ভাবে অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রতিবাদ করেন নাই। প্রতিবাদ করিয়া ফল পান নাই বলিলে, আমাদের কথার একটা জবাব মাত্র হইবে, কিন্তু মীমাংসা হইবে না। তিনিই অধ্যক্ষ, তিনিই নেতা, তিনিই শিক্ষক ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, যত্ন করিলে, চেষ্টা করিলে, পরিশ্রম করিলে এ

সকল নবোদ্ভাবিত দোষের দূরীকরণ যে একেবারে তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইত, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইতেছি। গিরিশবাবুর পক্ষে একটা মাত্র প্রবল যুক্তি আছে;—সুসঙ্গত অভিনয় শিক্ষা দিতে যেরূপ দীর্ঘ-সময় আবশ্যক, সধবার একাদশী, লীলাবতী, নীলদর্পণাদির প্রথম-শিক্ষায় যে-পরিমাণ সময় দেওয়া হইয়াছিল, পরবর্তীকালে কি প্রতাপ জহুরী, কি স্টার থিয়েটারের অধিকারিগণ ব্যবসায়ের দিক হইতে ততটা সময় দিতে হয়তো প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই গিরিশবাবু ইচ্ছা-সত্ত্বেও সময়ের অভাবে সুসঙ্গত শিক্ষা দিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ কথাটার জবাব আমাদের ন্যায় বাহিরের লোকের পক্ষে দেওয়া বড় কঠিন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, যদি এ বিষয়ে গিরিশবাবুর প্রকৃত যত্ন ও লক্ষ্য থাকিত, তাহা হইলে, অঙ্গুলী বক্র করিয়া ঘৃত-বহিষ্করণের উপায়ের ন্যায় কোন একটা কিছুর ব্যবস্থা করা তাঁহার মত সর্বেসর্বা ব্যক্তির পক্ষে কোন ক্রমে অসম্ভব ছিল না।...

"বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনেতৃবর্গ বড় অনুকরণ প্রিয়।... ৺মহেন্দ্রলাল বসু, বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির অভিনয়ে নায়কাংশ অভিনয় করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বভাবতঃ ঠায়ে কথা কহিতেন। তাঁহার দ্রুত-আবৃত্তির মধ্যেও একটা মৃদুতার উপলব্ধি বেশ সুস্পষ্ট হইত। তাঁহার সমকালীন দু-একজন অভিনেতা এখন তাঁহার অনুকরণে তাঁহার সেইরূপ আবৃত্তিকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা মহেন্দ্রবাবুর স্বাভাবিক ছিল, তাহা এখানকার অভিনেতার অনুকরণমূলক হওয়াতে, অধিকতর কৃত্রিমতা-ব্যঞ্জক হইয়া ভাব-বিকাশের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে। মহেন্দ্রবাবু কোন ভাবের তীব্রতা অভিনয় করিতে গেলে, তাঁহার চোখ কুঁকড়াইয়া যাইত। ইহা তাঁহার স্বভাবজাত দোষ ছিল; কিন্তু আমরা এখন এমন অভিনেতাও দেখিতে পাই, যাঁহারা তাঁহার এই চোখ-কোঁকড়ানিটুকুও অনুকরণ করিয়া থাকেন। এখনকার দিনে অনেক অভিনেতাই 'স্টার-থিয়েটার'-এর অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের স্বরানুকরণ, ভাবানুকরণ, ভঙ্গীর অনুকরণ এবং আবৃত্তির অনুকরণ করিয়া থাকেন। এই অনুকরণে তাঁহার দোষগুলি পর্যন্ত অনুকৃত হয়। তাহাতে ফল এই হয় যে, পরবর্তী অভিনেতার নিজের স্বরে, ভাবে ভঙ্গীতে যে ভাব বিকাশের স্ফূর্তি হইতে পারিত, তাহাত নষ্টই হয়, অধিকন্তু অমৃতবাবুর অনুকরণ করাতে একটা বিসদৃশতা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। গিরিশবাবুর গ্রন্থাবলীর নায়কচরিত্রগুলির অভিনয়ে আমরা এইরূপ অনুকরণপ্রিয়তা অনেক অভিনেতায় লক্ষ্য করিয়া, অনেক স্থলে বিষম বিরক্তি অনুভব করিয়াছি। এখনকারকালে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (গিরিশবাবুর পুত্র

'দানী'বাবু ) ও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিনয়ও অনেকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন দেখিয়া, আমাদের বিরক্তি ও ক্ষোভ উৎপন্ন হয় এবং অনুকারীদের বিফল চেষ্টা দেখিয়া হাসিও আসে। সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রবীর, সিরাজ, মীরকাসিম ও দুলালচাঁদ অভিনয়ে সুরেন্দ্রনাথ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার যে সকল দোষ আছে, সমালোচনার সম্মার্জনীতে সেগুলি পরিষ্কৃত হইবার অবসর কোন দিন ঘটে নাই, সুতরাং তাঁহার অনুকারী অভিনেতারা, তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া দুধের সহিত বিষটুকু পর্যন্ত গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন। এরূপ অনুকরণ করা অতিমাত্র ভুল।···

"আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, বঙ্গীয় নাট্যশালায় অভিনেতৃবৃন্দই বেশী অণুকরণপ্রিয়, অভিনেত্রীবৃন্দ ততটা নহে। এজন্য আমরা স্ত্রীচরিত্রগুলির অভিনয়ে সুকুমারী-দত্ত, ছোটরানী, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিণী, প্রভৃতি প্রাচীন অভিনেত্রী-গণের অণুকারিণী অভিনেত্রী দেখিতে পাই না। ৺প্রমদা, ৺কিরণ, ৺ভবতারিণী, ৺এলোকেশী, ৺গঙ্গামণি প্রভৃতি মধ্যযুগের অভিনেত্রীগণের অনুকারিণীও দেখিতে পাই না, অথবা বর্ত্তমান অভিনেত্রীগণের মধ্যে তারা, তিনকড়ি, সুশীলা বা সুরীর অনুকরণ করিতেও কেহ সাহস করে না, চেষ্টাও করে না। এজন্য আমরা অভিনেতা অপেক্ষা অভিনেত্রীগণের মধ্যেই অভিনয়পটুতা অধিক দেখিতে পাই। আমাদের মনে হয়, বর্তমান যুগে বঙ্গীয় নাট্যশালায় তারাসুন্দরী ও সুশীলার ন্যায় শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী যেমন নাই, তেমনই তাহাদের সমকক্ষ হইয়া অভিনয় করিতে পারে, নবীন অভিনেতাদের মধ্যে এমন অভিনেতাও নাই।···

"যাঁহারা সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু-কর্তৃক কাঙ্গালীচরণের অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে নৃপেন্দ্রবাবু এই ভূমিকার পূর্ব অভিনেতা ৺শ্যামাচরণ কুণ্ডুর স্বর ও ভাবাবলাসের অনুকরণ করিতে গিয়া কিরূপ বিচিকিৎস্য ভাবের আবির্ভাব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু গুলিখোরের উপযুক্ত বাজখাঁই ধরাগলার অনুকরণ অতি সুন্দর করিতেন। সেই স্বরের সরু মোটা আবশ্যক স্থলে তিনি এত সুন্দর খেলাইতে পারিতেন যে শুনিলে, স্বরটি যে তাঁহার স্বাভাবিক নহে, ধার করা, বিকৃত স্বর, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। নৃপেন্দ্র-বাবুর এই বিকৃত স্বরটিতে গলা-সাধা ছিল না, উহার সরুমোটা খেলাইবার কৌশল তিনি জানেন না, শেখেন নাই বলিয়া পারেনও না—কাজেই তিনি এক-ঘেয়ে ভোঁতা বাজখাঁই স্বরের একই পরদায় সর্বদা কথা কহায় তাহা মোটেই সুখশ্রাব্য বা সুখগ্রাহ্য হয় নাই।···

"অভিনেতৃবর্গের আর একটি দোষের কথা উল্লেখ করিব। অধিকাংশ··

অভিনেতা মনে করেন, আমরা যখন অভিনয় করিতে দাঁড়াইয়াছি, তখন আমাদের স্বরে একটা বিশেষত্ব থাকা চাই, নতুবা লোকে শুনিয়া মুগ্ধ হইবে কেন?—এই ভাবের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা অনেকেই নিজের সহজ কণ্ঠস্বর ত্যাগ করিয়া একটা বিকৃত ধার-করা সুরে অভিনয় করিতে থাকেন। ইহাতে ভাববিকাশের বিশেষ অন্তরায় ঘটে, কারণ এই ধার-করা সুরে হাসি, কান্না, ক্রোধ, ভালবাসা, ভক্তি প্রভৃতি ভাবের আনুষঙ্গিক আরোহ-অবরোহ কিরূপ হইবে, তাহা অভ্যাস না থাকায় অভিনয়কালে স্বরটি অতি কুৎসিত হইয়া পড়ে। এরূপ স্বরবিকার কোন সূত্রেই অবলম্বনীয় নহে। আজকালকার কোন কোন যুবক সাধারণতঃ অভিনয়-কালে নিজের সহজ, সরল স্বর চাপিয়া একটু গভীর স্বর অবলম্বন করিয়া থাকেন, কিন্তু এই স্বরে যখন বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠের অভিনয় করিতে হয়, তখন আর সে ধার-করা স্বরের গভীরতার বৃদ্ধি করা দূরে থাক, সহজটুকু বজায় রাখিতে পারেন না। …এইরূপ ধার-করা গলায় করুণার সুর, শান্ত ভাবের সুর যে কেবল ক্রন্দনের সুর হইয়া পড়ে, তাহা আমরা 'জনার' অভিনয়ে দানীবাবুর অভিনয়কালে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। অতএব কখন কোন কারণে, কোন অভিনেতা অভিনয় করিতে উঠিয়া, নিজের সহজ স্বর পরিত্যাগ করিয়া কোন বিকৃত স্বরের সাহায্য লইতে চেষ্টা করিবেন না। অর্দ্ধেন্দুবাবুর বরুণচাঁদের সুর কিংবা শ্যামকুণ্ডুর কাঙ্গালীচরণের সুর অথবা কিশোরীলাল করের কাফ্রি খোজার সুর বিকৃত সুর বটে, কিন্তু সে সকল সুর লইয়া যাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বর-বিকারের উপর বিশেষ আধিপত্য আছে, তাঁহারা সেই বিকৃত স্বরেই ভাবভেদে স্বরভেদ দেখাইতে পটু। তাঁহাদের মত এ বিষয়ে কৃতকর্মা ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা তাঁহাদের ন্যায় স্বরভঙ্গী লইয়া ইচ্ছামত খেলাইতে পারেন, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করুন না, তাঁহাদিগকে বলিবার কিছুই নাই। যাঁহারা তাহা পারেন না, তাঁহাদেরই আমরা বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি যে, অভিনয় করিতে হইবে বলিয়া একটা অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর অবলম্বন করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।…

"সহচর-অভিনেতার দিকে চাহিয়া কথাবার্তা না কহিলে যে, কতটা দোষ ঘটে, তাহা স্টার থিয়েটারের শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্রের এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (দানীবাবুর) অভিনয় যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। এই দুই প্রসিদ্ধ অভিনেতার অপরিহার্য দোষ ঐটিই। ইহাদিগকে কখনও সহচর অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রতি চাহিয়া অভিনয় করিতে কোন দৃশ্যেই দেখা যায় না। যাঁহারা ইহাদের অনুকরণ করেন, তাঁহারাও অবাধে এই দোষটিরও অনুকরণ করিয়া থাকেন।…

"অভিনেতৃবৃন্দের আর এক প্রকারের একটি দোষ আমরা সর্বদা লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই, অভিনেতৃবৃন্দ, অধিকাংশস্থলে কথোপকথনের মধ্যে বক্তব্য বিষয়ের ভাবোচিত হাত-মুখ নাড়া, অঙ্গভঙ্গী করা, স্বরভঙ্গীদ্বারা অর্থবিকাশের চেষ্টা প্রভৃতি বিলাসলীলাগুলি প্রদর্শন করেন না, কেবল তোতাপাখীর মুখস্থ বুলির মতো কথাগুলি আবৃত্তি মাত্র করিয়া যান। ইহাতে অনেককেই 'আড়ষ্ট-ভৈরব' বলিয়া মনে হয়। "*

এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের বক্তব্য এই রকম—

"একটি কথা চলিয়া আসিতেছে যে অর্দ্ধেন্দু ও আমার শিক্ষাপ্রণালী পৃথক।...আমার শিক্ষায় সুর অস্বাভাবিক। অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সুরবর্জিত—স্বাভাবিক। সমালোচক মহাশয় যদি বুঝিতেন যে স্বভাব আমাদের কথা কহিবার জন্য ছন্দ দিয়াছেন ও ভাবপ্রকাশের জন্য সুর দিয়াছেন,—সমস্ত কথাই ছন্দে, সমস্ত ভাবই সুরে গ্রথিত হয় এবং ছন্দ ও সুর কলাবিদ্যাবলে সুন্দররূপে পর পর সজ্জিত হইয়া কবিতার ছটা হয় ও গানের সুর হয়,আর নট ভাবপ্রকাশক সুরেই অভিনয় করেন তাহা লইলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ের আলোচনায় বৃথা কাগজ কালি ব্যয় করিতেন না এবং কণ্ঠস্বরও নষ্ট করিয়া বেড়াইতেন না। বোধ হয় সমালোচক মহাশয়ের ধারণা,—গদ্যে যাহা রচিত হয় তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে—গদ্য স্বাভাবিক নয়। ছন্দোবন্ধেই আমরা কথা কহি, সুতরাং ছন্দোবন্ধই স্বাভাবিক। সুরে আমরা ভাব প্রকাশ করি, অতএব সুরই স্বাভাবিক। তবে সুর বেশি মাত্রা করিলে তাহা ঢং হয়—আর অর্দ্ধেন্দুর অশিক্ষিত অনুকরণকে ভাঁড়াম বলে। নাটক শিক্ষার প্রণালী দুই রকম হয় না। কোন এক নাটক দুইজন নট দুইভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, দুই ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ দুই নট সেই নাটক একভাবে গ্রহণ করেন তবে ব্যাখ্যা একরূপই হইবে, তাহাতে দুই প্রণালী হইতে পারে না। ব্যাখ্যার ভুল হইতে পারে—কল্পনা অনুসারে অর্থাৎ তিনি যেরূপ নাটকের ভাব কল্পনা করিয়াছেন তদনুসারে। কিন্তু ব্যাখ্যার বৈচিত্র্যকে শিক্ষার প্রণালী বলে না। আমরা যে ছন্দে কথা কহি ও সুরে ভাব প্রকাশ করি ইহা ভাবিয়া বুঝিতে হয়।

* অর্দ্ধেন্দুশেখরের পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী 'ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়' ছদ্মনামে 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' নামক একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। উদ্ধৃতাংশটি উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় ও সপ্তম পরিচ্ছেদ থেকে সংকলিত। পুস্তকের প্রকাশক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৪৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের স্ট্রীট, কলিকাতা; প্রকাশকাল ১লা শ্রাবণ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ; মোট পৃ ২।০+১১৯। পুস্তকের কয়েকটি প্রস্তাব ১৩১০ সালে 'রঙ্গভূমি' সাপ্তাহিক পত্রে এবং কয়েকটি 'বাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

যদি কেহ তাহা না বুঝিতে পারেন তবে তাঁহার নিমিত্ত আমাকে কি দায়ী হইতে হইবে? কলাবিদ্যা ভাবুকের, সকলের নয়।···নট মুখে রঙ মাখেন, কিন্তু দৃশ্যপটের ন্যায় নিকটে তাহা কদর্য দেখায়। যখন মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম ম্যাকবেথ অভিনীত হয়, তখন সুযোগ্য বেশকারী পিম্ সাহেব আসিয়া রং মাখান, নিকটে তাহা অতি কদর্য্যবোধ হইত। কিন্তু দূর হইতে অনুরূপ দেখাইত—কৃষ্ণবর্ণ নটকেও গৌরবর্ণ মনে হইত—অস্বাভাবিক বোধ হইত না। বর্ণসমাবেশের ন্যায় অভিনয় সম্বন্ধেও দূরে উক্তি ও নিকটে উক্তিতে প্রভেদ আছে। কথা দূরে শুনাইবার জন্য কৌশলের প্রয়োজন আছে। সে কৌশল মহালা দিবার সময় কঠোর হয়। যিনি এই কৌশল জানেন না তিনি শিখাইবার সময় অভিনয় স্বাভাবিক করিবার জন্য যাহা শিখাইতে চেষ্টা করেন তাহাতে অভিনয় হয় না। যেমন সরুকাজ রঙ্গালয়ের দৃশ্যে চলে না, সেইরূপ রঙ্গমঞ্চের মন্ত্রণাদৃশ্যে, মন্ত্রণা পরামর্শাদি স্বভাবতঃ চুপি চুপি করা হইলেও নটের পরামর্শ চুপি চুপি করিলে চলিবে না। যাহাতে দূরস্থ দর্শক শুনিতে পায় এরূপ কণ্ঠস্বর ব্যবহার করিতে হইবে—Rehearsalএ তাহা শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হইবে। প্রেমিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সখীকে মনোবেদনা জানাইতেছে—অভিনেত্রী তাহা দর্শককে শুনাইবে, দীর্ঘশ্বাস যে পড়িয়াছে তাহা অন্ততঃ নিকটস্থ দর্শক শুনিবে, আর দীর্ঘশ্বাসজনিত মাংসপেশীসঞ্চালনও প্রত্যেক দর্শক দেখিবেই। নটনটীর এইরূপ অভ্যাসের সময় নিকটে থাকিলে তাহাদের কার্য অস্বাভাবিক বোধ হইবে, কিন্তু দর্শকশ্রেণীর মধ্যে বসিয়া দেখিলে ওরূপ বোধ হয় না। যিনি অভিনয় শিক্ষা দিবেন শিক্ষার্থীকে তাঁহার উহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। শিক্ষার সময় অনেক কৌশলই নিকট হইতে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু ঐ সকল কৌশলই রঙ্গালয়ের উপযোগী। বৈঠকখানার অভিনয় ও রঙ্গালয়ের অভিনয়ে অনেক পার্থক্য। স্বভাব-স্বভাব বলিয়া যে সমালোচক চীৎকার করেন তিনি Shakespeare-এর স্বগত উক্তিগুলিকে (soliloquies) কিরূপ স্বাভাবিক মনে করেন? কেহ ত কাহাকে শুনাইয়া মনের কথা বলে না; আবার শুনাইয়া না বলিলেও 'To be or not to be—that is the question' ইত্যাদির ন্যায় উচ্চ অংশ সকল Shakespeare-এর অভিনয় হইতে বাদ পড়িত। রঙ্গালয়ের অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক যিনি বিচার করিতে চান তাঁহার শিক্ষিতদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত, নচেৎ কাগজ কলম লইয়াই অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক বলা বিড়ম্বনামাত্র।···" ('অভিনয় ও অভিনেতা' : 'নাট্য-মন্দির', ১৩১৭-১৮)

অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র তাঁর 'স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নটজীবন' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন, "সংস্কৃতের ন্যায়, বাঙ্গালা পদ্য ভিন্ন, বাঙ্গালা গদ্যেও যে হ্রস্ব দীর্ঘের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উচ্চারণের সার্থকতা আছে, তাহা তাঁহার নিকট শুনিয়া বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের লালিত্য অনুভব করি।"

কিন্তু গিরিশচন্দ্র এ-কথার যাথার্থ্য অস্বীকার ক'রে লিখেছিলেন, "অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সমালোচকের মুখে আর একটি নূতন কথা শুনিলাম—তাহা এত বৎসর অর্দ্ধেন্দুর সহিত বেড়াইয়া জানিতে পারি নাই। তিনি কাহাকে নাকি বুঝাইয়াছিলেন যে, অভিনয়কালে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে বাঙ্গালায় কবিতা পাঠ তো সুন্দর হয়ই, গদ্য পাঠও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে সুন্দর হইয়া থাকে। কখনও গুরু-গম্ভীর ভূমিকায় 'দীন' অর্থে দরিদ্র, দিবা নয়,ইহা বুঝাইবার জন্য দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকেও ঐ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কথা কহিতে প্রায় দেখা যায় না। বরঞ্চ কোন আঘাত লাগিলে বৈপরীত্যই দেখা যায়। 'দীন-হীন' শব্দটি তখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না—'দিন-হিন' এইরূপ হ্রস্বই উচ্চারিত হইয়া থাকে। অভিনয় স্বভাবের ছবি—এইরূপ দীর্ঘ উচ্চারণে অভিনয় বিসদৃশ হইবে। বলেন্দ্রসিংহ ভীমসিংহের ভাই হইলেও তাঁহার মুখে 'এইবার দূত মহাশয়' এরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বজায় রাখা চলিবে না। রানীর কথাতেও চলিবে না, কৃষ্ণকুমারীর কথাতেও চলিবে না। কৃষ্ণকুমারী নাটক সাধুভাষায় লিখিত, তাহাতেও ওরূপ উচ্চারণ চলে না, চলিত ভাষায় যাহা লিখিত তাহাতে ত চলিবেই না—আর কবিতায়—

'নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ।'

* * * * *

"এই সুললিত ছন্দ, নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী ইত্যাদিরূপ হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণে কেমন সুন্দর হইবে তাহা পাঠক একবার পড়িয়া দেখুন।

"সংস্কৃত রচনায়—হ্রস্ব দীর্ঘ যাহার জীবন—তাহাতেও পাঠ সুললিত করিবার জন্য কখন কখন হ্রস্ব দীর্ঘ বর্জন করিতে হয়, যথা ছন্দোগ্রন্থ 'পিঙ্গলসূত্রে' উদাহৃত 'তং প্রণমামি চ বালগোপালম্' এই স্থলে 'গোপালের' 'গো' দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। উক্ত গ্রন্থে ইহার বিশেষ সূত্র আছে। সংস্কৃত নাটকের যে সকল ভূমিকা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত তাহার অভিনয়কালে কখন কখন হ্রস্ব দীর্ঘ বর্জন করিয়া অভিনয় করিতে হয়। বাঙ্গলা নাটকে অবশ্য কচিৎ কোন ভূমিকায় স্থল বিশেষে স্বরের হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। যথা ভীমসিংহের ক্ষিপ্তাবস্থায়

আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া—'রজনীদেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন। আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ ক'রে চামুণ্ডারূপ গর্জন কচ্চেন! ইত্যাদি স্থলের অভিনয়কালে। কিন্তু তাই বলিয়া যত্রতত্র বর্ণে বর্ণে হ্রস্বদীর্ঘ লক্ষ্য করিলে চলে না।" ('অভিনয় ও অভিনেতা' : 'নাট্যমন্দির', ১৩১৭-১৮)

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 'নাচঘর' পত্রিকায় হেমেন্দ্রকুমার রায় 'অভিনয়ে সুর' শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টি আলোচনা ক'রে লিখেছিলেন :

"অভিনয়ের সময়ে কথাবার্তার সঙ্গে সুর ব্যবহার করার পক্ষে বা বিপক্ষে যে আন্দোলন, তা নূতন নয়।

"এদেশেই আগে দু-দলেই লোকের অভাব ছিল না। একদিকের দলপতি ছিলেন গিরিশচন্দ্র, তিনি সুর পছন্দ করতেন। অ-সুরের দলপতি ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর।

"এখনকার গিরিশ-ভক্ত পুরাতন দলের অভিনেতারাও কথাবার্তায় বিশেষরূপে সুর ব্যবহার করেন। তাঁদের সুরের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে গেলেই তাঁরা ফোঁস করে বলে ওঠেন যে, 'আমরা গিরিশচন্দ্রের শিষ্য, তার খবর রাখো? তোমাদের কথায় আমরা কি গুরুর শিক্ষা অবহেলা করবো?'

"কথাটা হামেশাই শোনা যায়, সুতরাং আলোচনার দরকার।

"প্রথমেই বিচার্য, গিরিশচন্দ্র যে ভাবে কথায় সুর ব্যবহার করতেন, একালের প্রাচীন-পন্থীরাও ঠিক তাই করেন কিনা?

"সৌভাগ্যক্রমে আমরা অনেকবার গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছি এবং যা দেখেছি তাতে করে অনায়াসে বলতে পারি যে, তাঁর আধুনিক শিষ্যরা গুরুর পদ্ধতি মোটেই আয়ত্ত করতে পারেন নি।

"দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্তার সময়ে আমরা প্রত্যেকেই একটা স্বাভাবিক সুরের ধারা অবলম্বন করে চলি। সেই সুরের তারতম্য অনুসারে একটি মাত্র কথাই ভিন্ন ভিন্ন ভাব ব্যক্ত করে এবং ভাবাভিব্যক্তিতেই বিশেষ সুরের সার্থকতা।

"গিরিশচন্দ্র অভিনয়-কালে ঐ স্বাভাবিক সুরের উপরেই রং চড়াতেন মাত্র, কারণ একেবারে স্বাভাবিক সুর আমরা যা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি, রঙ্গমঞ্চে তেমন খুৎসই হয় না। অভিনয় হচ্ছে আর্ট এবং আর্টের ও বাস্তবিক জীবনের স্বাভাবিকতার মধ্যে তফাৎ আছে যথেষ্ট।

"কথার অর্থ অনুসারেই গিরিশচন্দ্র নিজের সুরকে আবশ্যকমত পরিবর্তন

করতেন এবং এক বাঁধা স্বরের গতের ভিতরেই তিনি কখনো ভাষাকে আটক করে রাখতেন না।

"গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আধুনিক শিষ্যগণের এইখানেই তফাৎ। এঁরা সর্বত্রই এক বাঁধা-গৎ অবলম্বন করে চলেন এবং সেই স্বরের প্রবাহে কথার মানে ও ভাষার ভাব ফুটল কি না, সে বিচার করেন না আদৌ।

* * *

"তানসেনের দেওয়া কোন বিশেষ গানের স্বর যেমন একালকার যে কোন গানের পক্ষেই উপযোগী নয়, গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ের স্বরও তেমনি অবিকলভাবে একালের অভিনয়ে বাঁধা-গতের মতন ব্যবহৃত হতে পারে না। নাটকের ভাষার ভাব ও অর্থ হিসাবে গিরিশচন্দ্র যেমন স্বরের ভঙ্গি বদলাতেন, তাঁব শিষ্যগণও যদি তা করতে পারতেন তাহলে কোনই আপত্তি ছিল না।

* * *

"...যাঁরা রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, তাঁর কথাবার্তার ভাষা স্বরের খেলায় একেবারে পরিপূব। গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মতন এতটা স্বরের ভক্ত ছিলেন না। তবু যে রবীন্দ্রনাথেব অভিনয় জনপ্রিয়, তার আসল কারণ হচ্ছে, এক বাঁধা গৎই তাঁর আলম্বন নয়, কথার ভাব ও অর্থ হিসাবে তাঁর স্বরও স্বাভাবিক রূপে বদলে যায়।

"নবযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয়ও সর্বত্র স্বর-বর্জিত নয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি স্বরকে গ্রহণ বা বর্জন করেন এবং ফলে তাঁর অভিনয়ের বৈচিত্র্য যার-পর-নাই উপভোগ্য হয়ে ওঠে।...( 'নাচঘর', ৯ই শ্রাবণ, ১৩৩১ )

অর্দ্ধেন্দু-গিরিশযুগের অভিনেতৃবৃন্দের আবৃত্তি-ভংগির স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে নাট্য-সমালোচক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী লিখছেন :

"তৎকালে আবৃত্তি উদাত্তগম্ভীর হইত বটে, কিন্তু একটা মাত্রাহীন স্বরের মিশ্রণে উহা অনেকখানি অস্বাভাবিকও হইত। কেমন একরকম যাত্রাসুলভ টানা টানা স্বর, অস্থানে অনাবশ্যক গমক এবং সাধারণ কথাতেও আবেগপ্রধান স্বরকম্পন প্রভৃতির সমন্বয়ে সাধনার নানারূপ কসরৎ ছিল বটে, কিন্তু সেই সাধনা কখনও বাস্তবের সঙ্গে যোগসাধনে প্রয়াসী হয় নাই।...

"এস্থলে 'স্বাভাবিক' এবং 'বাস্তব' কথা দুইটির সম্পর্কে তর্ক উঠিবার আশঙ্কা আছে।...এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, সাধারণ জীবনে আমরা যে স্বরে যে ভংগিতে কথা বলি, অভিনয়কালে উহার অবিকল অনুকরণ করিতে গেলে উহা দর্শকদের

শ্রুতিগ্রাহ্য হইতে পারে না। এই কারণেই অভিনয়ের আবৃত্তিতে কিছু পরিমাণ কৃত্রিমতা মিশাইতেই হয়। এক্ষণে সেই কৃত্রিমতার সীমারেখাই বিবেচ্য। সৃষ্টি কখনও বাস্তবের অনুকরণ হয় না বটে, কিন্তু অপরপক্ষে উহা বাস্তবসত্যের বিরোধীও হয় না। আর্ট অনুকরণ নয়—অনুসরণ। এই অনুসরণই ভোক্তার চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া থাকে। সৃষ্টি তখন বাস্তব না হইয়াও বাস্তব, এমনকি বাস্তবের অধিক বলিয়াই মনে হয়। নাটকীয় আবৃত্তিতে এইরূপ বিভ্রম সৃষ্টির জন্য নট-নটীর সাধনার প্রয়োজন হয়। সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে স্বর-নিক্ষেপের প্রণালী অভিনেতৃর নিকট এমনই আয়ত্ত হইয়া থাকে যে, তখন আর সংলাপ আবৃত্তির কালে তাঁহার পক্ষে অযথা চীৎকার করিবার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া বাস্তব স্বরভংগির সঙ্গে তিনি এমনভাবে অবাস্তব সুর মিশ্রিত করিতে পারেন যাহা পরিমিত মাত্রার জন্যই শ্রোতার নিকট স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।" ('অভিনেতৃ আর অভিনয়': 'ভগ্নদূত', ১৬ই ও ২৩এ চৈত্র, ১৩৫৭)

অর্দ্ধেন্দুশেখর-গিরিশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-অমৃতমিত্র-অমরদত্ত-দানীবাবু থেকে শিশির-কুমার পর্যন্ত আমাদের রঙ্গালয়ের যুগন্ধর শিল্পীদের অভিনয় ধারার নিপুণ বিশ্লেষণ ক'রে মনীষী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর বৈচারিক অভিমত জানাচ্ছেন:

"অতএব রঙ্গালয়ে মোটামুটি অভিনয়ের দুটি ধারাই চলে আসছে বলতে হয়। এতদিন, অন্ততঃ, কারণ, শিশিরবাবুর পর অনেক কিছুই বদলেছে।

"অভিনয়ের দুটি ধারার প্রথমটি আবৃত্তিমূলক, দ্বিতীয়টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা-প্রধান। আবৃত্তির প্রাণ সুর, যার সাঙ্গীতিক অংশ কণ্ঠস্বরের এবং নাটকীয় অংশ ছন্দ, গতি ও বিরামের সাহায্যে ফোটে। একে একপ্রকার সাহিত্যিক অভিনয় বলা চলে। উপাদানের তারতম্য অবশ্য থাকে, যেমন অমৃত মিত্রের কণ্ঠস্বরে বেগ ছিল বেশি, অমর দত্তের ছিল জোয়ারি। অমৃত মিত্রের আবৃত্তি যেন অবিরাম শ্রাবণ-ধারা, অমর দত্তের যেন শরতের প্লাবন। অর্থাৎ অমরবাবু আবৃত্তির বাহ্যিকতা ভাঙতেন গমক ও বিরামের সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথের স্বর বাঁশির মতন, তাঁর অভিনয় আবৃত্তিপ্রধান, এবং সে-আবৃত্তি নানা কারণে লিরিকধর্মী, অর্থাৎ সুর-ঘেঁষা বেশি। বাঁশির আওয়াজের ডিমেন্‌সন্ যেন দুটি, তারের যেন তিনটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরের রেঞ্জ অত্যন্ত বেশি হওয়ার দরুণ ক্ষতিপূরণ হত সহজে। অন্যদিকে গিরিশবাবু, দানীবাবুর অভিনয় দেহ ও মুখভঙ্গীর ওপর বেশী নির্ভর করত। গিরিশবাবুর স্বর বজ্রগম্ভীর, এবং উচ্চারণ পদ্ধতি যেন

গৈরিশী ছন্দেই ঢালা। ( সেটা কতটা হাঁপানির জন্য বলা যায় না )। দানীবাবুর আওয়াজ গম্ভীর, কিন্তু উচ্চারণ নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল। সেইজন্য অভিনয়টাই তাঁর মূলধন হয়ে উঠত, এবং সেটা তিনি খুব উঁচু হারেই খাটাতেন। আবৃত্তিতে অমরবাবুর বিশ্বাস ছিল অসীম, তাই স্থির শান্ত ভঙ্গিমা ও ধীর সঞ্চারণই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হত।

**"অর্দ্ধেন্দুবাবুর অভিনয় যা দেখেছি তাতে আবৃত্তি বেশি ছিল না, তাই বোধ হয়, আমার মনে গোটা কয়েক মূর্তিই সাজান আছে। সেটা কি তাঁর প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক ভঙ্গী সূক্ষ্মতম ভাব পরিবর্তনের আদেশবাহী ছিল বলেই? যদি তাই হয়, তবে তিনিই আমাদের শুদ্ধ অভিনেতা, এবং তাঁর অভিনয় নৃত্যাঙ্গের।**

"সে যাই হোক, শিশিরবাবুর অভিনয় বিচার করলে মনে হয় যেন তাতে পূর্বোক্ত ধারা কয়টি মিশেছে, তাই তাঁর আবেদন সমৃদ্ধতর। মেশবার ফলে ধারাগুলিও বদলেছে। আবৃত্তি তাঁর সংযত, অথচ এমন সংযত নয় যে সেটি গদ্য-ছন্দ হয়ে ওঠে। অনেকটা যেন পূরবী ও পুনশ্চ-এর পার্থক্য।

"তাঁর কাটা কাটা আবৃত্তিতে দুটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। ঘনতা অর্থাৎ অবান্তর ও নিরর্থককে পরিত্যাগ, যেমন সুরের সাহায্য তিনি নেন না; এবং স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জনবর্ণের সুষ্ঠু ব্যবহার, যার ফলে অর্থই যে কেবল স্পষ্টতর ও গভীরতর হয় তা নয়, সুর অন্তর্মুখী ও ব্যাপক হয়, বাক্যের টেকশ্চার খাঁটি হয়। আমি যা বলছি তার উপমা বীণায় ( দক্ষিণী ঢঙে ) ও বিদেশী সঙ্গীত এবং সাহিত্যে sprung rythm-এ পাওয়া যাবে। আবৃত্তির অভিনবত্বের সঙ্গে মিশে থাকে শিশিরবাবুর অভিনয়-দক্ষতা। শিশিরবাবুর চেহারা ও মুখের মাংসপেশী তাঁকে গিরিশবাবুর অভিনয়ের দিকে টেনে আনে। **কিন্তু নানা কারণে, প্রধানত একপ্রকার বিদগ্ধজনসুলভ পরিচ্ছন্নতার ও শুদ্ধতার জন্য তাঁর মানসিক আত্মীয়তা অর্দ্ধেন্দুবাবুর সঙ্গে।** সবার ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। আমি পুনশ্চের ছন্দের উল্লেখ করেছি, তাছাড়া শিশিরবাবুর হাতের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের দান। হাত নিয়ে আমরা কেন বড় অভিনেতারাও মুস্কিলে পড়েন। এই ধরনের দোটানার নিষ্পত্তি করেন শিশিরবাবু দুটি উপায়ে। প্রথম, চোখ ও ঠোঁটের দ্বারা। তাঁর চোখ ও ঠোঁটের গড়ন এমন যে তাতে একত্রে বিপরীত ভাব এবং সূক্ষ্ম অস্পষ্ট fugitive ভাব সহজে খোলে, সেজন্য শ্লেষ বিদ্রূপ প্রভৃতিতে তাঁর সমকক্ষ আমাদের রঙ্গমঞ্চে কেউ নেই। আমি ছিবলে ঠাট্টা বলছি না, satire বলছি। দ্বিতীয় উপায়, movement; তাঁর প্রবেশ,

সঞ্চারণ ও প্রস্থান নাটুকে নয়, কেবল উপযোগী। আবৃত্তির সময় তাঁর অবয়ব সঞ্চালন লক্ষ্য করা দর্শকের চরম আনন্দ, বিশেষত হাত ও চিবুক।" ('পরিচয়', বৈশাখ, ১৩৪১)

অর্দ্ধেন্দুশেখরের পরলোক গমনের তিনদিন পরে (১৩১৫ সাল, ৩রা আশ্বিন, শনিবার) মিনার্ভা থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সোরাব রুস্তম' গীতিনাট্যের উদ্বোধনী-অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বে দর্শক সম্মুখে গিরিশচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ ক'রে স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এই প্রবন্ধে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাসের পটভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনসাধনার ধারা ও নটপ্রতিভা সম্পর্কে বিশ্লেষণ-ধর্মী আলোচনা করেছেন। অর্দ্ধেন্দু-প্রতিভার মর্মরূপটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন:

"যাঁহারা natural কথাটি কুড়াইয়া লইয়া অভিনয় সমালোচনা করেন, তাঁহারা, আমি অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি, তাহা বুঝিবেন কিনা জানি না। যিনি পাশ্চাত্য প্রদেশের অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি বুঝিবেন যে, অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, এক্ষণে সভ্যপ্রদেশে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই;—অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা (part) লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দু তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিত অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। যতবার প্রবেশ করিতেন, ততবারই দর্শক আগ্রহের সহিত বলাবলি করিতেন—অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা, তাহা নয়। ...Album of Amusement-এ ইংলণ্ডের এক কলাবিদ্যানিপুণ ব্যক্তির উল্লেখ আছে। তিনি Lecture on heads বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেন। ঐ সুযোগ্য অভিনেতা কতকগুলি পিস্‌বোর্ডে নরমুণ্ড প্রস্তুত করিয়া একা রঙ্গমঞ্চে দেখাইতেন। সেই পিস্‌বোর্ডে নির্মিত মুণ্ডগুলির নানারূপ মুখভঙ্গী ছিল। তিনি এক একটি মুণ্ড লইয়া নিজে মুখভঙ্গী পূর্বক সেই মুণ্ডের অনুকরণ করিতেন এবং বলিতেন এই মুণ্ড যাহার ছিল, সে এইরূপ প্রকৃতির লোক,—নিজে তিনি সেই কল্পিত প্রকৃতির অভিনয় করিতেন। দর্শকের উচ্চহাস্যে রঙ্গমঞ্চ যেন ফাটিয়া যাইত। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাঁহার প্রশংসা ধরে না। এ ব্যক্তিরও শক্তি অর্দ্ধেন্দুর শক্তির নিকট নিয়তমের। ইংলণ্ডের John Lawrence Toole এই শক্তির পূর্ণ বিকাশ। পূর্বে বলিয়াছি, অর্দ্ধেন্দুকে দর্শক অর্দ্ধেন্দু দেখিতেন। অর্দ্ধেন্দু এই অংশে বা ঐ অংশে এ লইয়া বিচার নয়, অর্দ্ধেন্দুবাবু চমৎকার—এই কথা।

"...অর্দ্ধেন্দুর এই স্বরূপ বর্ণনায়, কাহারও বা মনে হইতে পারে, যে এরূপ অভিনয়ে নাটক বর্ণিত চরিত্রের সম্পূর্ণ অভিনয় হয় না। ঐরূপ মনে করা ভ্রম। কলাবিদ্যা—কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। চিত্রকর যখন কোন স্বভাবদৃশ্য অঙ্কিত করিতে চান, সেই দৃশ্যের অনেক বাদ দিয়া, অনেক যোগ করিয়া, তাঁহাকে চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যে দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছেন, স্বভাবে সেই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকরের যেরূপ মনের ভাব হইয়াছিল, সেই ভাবটি যতদূর পারেন, তুলিতে তোলেন। কল্পনা-প্রসূত দৃশ্যেও অনেক যোগ করিতে হয়। Art galleryতে Approaching storm অর্থাৎ ঝড় আসিতেছে, এই নামে একখানি ছবি আছে। ঘোর মেঘ উঠিয়াছে, বৃক্ষ সকল স্পন্দনহীন, পশুপক্ষী ভয়াকুল, ঝড়ের পূর্বে এই দৃশ্য স্বভাবে দেখা যায়। চিত্রকর সেই দৃশ্য আঁকিয়া তাহাতে কতকগুলি চাষা, পথিক, গাভী প্রভৃতি দিয়াছেন। ঝড় আসিবার পূর্বে যেখানে সেখানে চাষা, গাভী প্রভৃতি দেখা যায় না। কিন্তু চিত্রকর তাঁহার চিত্রপটে উহা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত মেঘ স্পন্দনহীন বৃক্ষ অপেক্ষা অঙ্কিত মানবের মুখভাবে ঝড়ের আশঙ্কা বেশি প্রতীয়মান হইতেছে। অর্দ্ধেন্দু উচ্চকলাবিদ্যাবলে তাঁহার অভিনীত অংশে চিত্রকরের ন্যায় কতকগুলি কল্পিত হাবভাব দ্বারা নাটককারের চরিত্র পরিপুষ্ট করিতেন। বর্ণিত চিত্রকরের Approaching storm ছবিতে আমরা ছবি দেখি, কিন্তু ঝড় আসিবার ভাব মনে উদয় হয়; অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে সেইরূপ আমরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখি, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটক বর্ণিত চরিত্রের ঠিক ভাব উপলব্ধি হয়।..."

গিরিশচন্দ্র আরও লিখেছেন:

"উপস্থিত হাবভাবের পরিবর্তন করিতে অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় সুনিপুণ কলাবিদ্যা-বিশারদ পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, অর্দ্ধেন্দু সকল স্থানেই অর্দ্ধেন্দু। নীলদর্পণে 'গোলক বসু'র অভিনয় হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও 'অর্দ্ধেন্দুরী' একটু টিপনি আছে। চাষা হাঁ করিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে একটি মশা মারিল, এটি 'অর্দ্ধেন্দুরী'। 'রডা' ও 'উড' সাহেব সাজিয়া নৃত্য, ইহাতে অর্দ্ধেন্দু প্রকট। 'আবুহোসেনে' সখীদের সহিত পিটবস্ত্র, ঘাগরার ঢংয়ে ছড়াইয়া সখীভাবে নৃত্য, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে গদা খানসামাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দেওয়া, স্টেজে কাহারও সাজিয়া বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছে,—নাটকের কথাবার্তা বন্ধ রহিয়াছে, হঠাৎ নেপথ্য হইতে একজনকে টানিয়া আনিয়া তাহার সহিত কথা কওয়া, 'লীলাবতীতে' হরবিলাস বসিয়া আছে, (কাহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে, আমার স্মরণ হয় না) অর্দ্ধেন্দু

বলিলেন, 'জমাদার সাহেব, তোমার আসামী সট্‌কেছে, এখন তুমিই আসামী আর জমাদার দুই হয়ে দাঁড়াও, আমাদের কাজ চলুক। (দর্শকগণকে দেখাইয়া) বাবুরা সব বসে আছেন।' এ সমস্ত কাহারও বিসদৃশ লাগিত, অপর কেহ করিলে যে বিসদৃশ হইত না, তাহা নহে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর অতুল প্রতিভায় সমস্ত ঢাকিয়া যাইত। ইতিপূর্বে বলিয়াছি—রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমঞ্চই, ইহা কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। ইহা বুঝাইবার এস্থলে পুনর্বার চেষ্টা পাইব,—আমরা দেখিয়াছি,—'শ্রীমন্তের মশান' যাত্রা হইতেছে, যাহারা দারোয়ান সাজিয়াছে, তাহারা 'ডেঁাক ব্যাটা—ডেঁাক' বলিয়া হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথাটা এই, শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিতে চাহিয়াছে, কোতোয়ালেরা বলিতেছে 'ডাক বেটা চণ্ডীকে ডাক।' শ্রোতারা হাসিতেছে, শ্রীমন্তের হাতে লাল রুমাল জড়ান, পীড়নের কোন চিহ্নই নাই। শ্রীমন্ত গান ধরিল—'মা, কোথায় আছ গো শঙ্করী। প'ড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়, বন্ধন জ্বালায় জ্বলিয়া মরি।' ইহাতে শ্রোতারা অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। লাল রুমাল হাতে জড়ানোতে বন্ধন-জ্বালা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না, তথাপি শত শত ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত, সঙ্গীতে শ্রীমন্তের মশান উদ্দীপন করিয়াছে, বলিতেছে 'আহা 'লোকা' কি গায়।' কিন্তু শ্রীমন্তের ভাবে বিমোহিত। অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ও সেইরূপ। 'মুকুল মুঞ্জরা'য় বরুণচাঁদের অভিনয় বিশেষ মনে আছে, তাহারই দৃষ্টান্ত দিই,—বনের ভিতর বরুণচাঁদ বসিয়াছিল, মন্ত্রী আসিয়া চিনিয়াছে, বরুণচাঁদ আত্মগোপনের চেষ্টায় 'আমি কেলোর মা'র কেলো' প্রভৃতি যাহা মুখে আসিল—তাহা বলিল। সকলেই দেখিতে লাগিল যে অর্দ্ধেন্দু, কিন্তু আকিংখোর বরুণচাঁদ সকলেরই মনে অঙ্কিত হইল। অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দু যেন সকলকে বলিতেন—আমি অর্দ্ধেন্দু;—যে অংশ দেখিতে চাও তাহা এইরূপ; যেন দর্শকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য হইতেছে। কিন্তু দর্শক যাহা দেখিতে চান, তাহাও ঠিক দেখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুকেও দেখিতেন।"

কিন্তু অপরেশচন্দ্রের মনে হলো, গিরিশচন্দ্রের এই স্তুতি ব্যাজস্তুতি। কোহিনুর থিয়েটার কর্তৃক আহূত অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় অপরেশচন্দ্র তাঁর লিখিত ভাষণে বললেন :—

"আমাদের মনে হয় 'অর্দ্ধেন্দুবাবু যে ভূমিকা লইয়াই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, সেই ভূমিকাতেই দর্শক দেখিতেন—অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা তাহা নহে,'—তাহা অর্দ্ধেন্দুবাবুর প্রকৃত অভিধান নহে। ইহা প্রশংসার ঐন্দ্রজালিক আবরণে তাঁহার নিন্দা—সত্যের অপলাপ। বরং এ কথা বলা যাইতে পারে, যে ভূমিকা

লইয়াই অর্দ্ধেন্দুবাবু রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন তাহাতেই দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু নহে, অর্দ্ধেন্দুর বিশেষত্ব, অর্দ্ধেন্দুর কৃতিত্ব, অর্দ্ধেন্দুর মৌলিকত্ব। আত্মগোপন অভিনেতার একটি প্রধান ক্ষমতা। যে অভিনেতা অভিনয় করিতে আসিয়া আত্মগোপন করিতে শিখে নাই, তাহার ভাঁড় বলিয়া অপ্রতিহত যশোলাভ হইলেও হইতে পারে কিন্তু সুদক্ষ অভিনেতা বলিয়া পরিচিত হইবার আশা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখরের নটজীবন')

গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের এক স্থলে লিখেছিলেন :

"অন্যের অভিনয়ের সহিত অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ের পার্থক্য কি? তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইব। লোকে 'গ্যারিকের' অভিনয় দেখিয়া আসিয়া বলিত, হ্যামলেট চমৎকার হইয়াছে। এ অভিনয় একরূপ। উল্লিখিত John Lawrence Toole নামক অভিনেতার দর্শক-মনোমোহন অভিনয় অন্যরূপ। এই কলাবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতকে দেখিয়া, দর্শক সেই পণ্ডিতেরই নাম করিত; অভিনীত অংশের নাম করিত না।"

অপরেশচন্দ্র প্রতিবাদ ক'রে বললেন :

"যদি 'হ্যামলেট' দেখিতে গিয়া 'হ্যামলেটের' পরিবর্তে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে দেখিয়া আসিলাম মনে হয়, তাহা হইলে আটগণ্ডা পয়সা দিয়া থিয়েটারের টিকিট কেনা অপেক্ষা সুইচব্যাক রেলওয়ে চড়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। অর্দ্ধেন্দুবাবুর অভিনয় দেখিয়া আমাদের মনে হয়, অর্দ্ধেন্দুবাবু যে চরিত্র সাজিয়াছেন, হুবহু তাহা যেন সেই চরিত্রের অনুযায়ীই হইয়াছে। নীলদর্পণে চারিটি বিভিন্ন ভূমিকা লইয়া তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চে কখন দেখি নাই, সে কথা বলিতে পারি না, কিন্তু নীলদর্পণে তোরাপ ও উড্সাহেব এই দুই চরিত্র তাঁহাকে অভিনয় করিতে দেখিয়াছি এবং এই দুই বিভিন্ন চরিত্রে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্তিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া সত্য সাক্ষ্য দেওয়া যায়। 'ম্যাকবেথে' তাঁহাকে উইচ, পোর্টার, বৃদ্ধ ও ডাক্তার এই কয়টি ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইতে দেখি, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, একা অর্দ্ধেন্দুবাবু যে এই চারিটি চরিত্র অভিনয় করিতেছেন, তাহা আমরা তখন বুঝিতে পারি নাই। আমরা এই চারিটি পাত্রে অর্দ্ধেন্দুকে দেখি নাই—অর্দ্ধেন্দুর বিশেষত্ব, অর্দ্ধেন্দুর মৌলিকত্ব দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। বাঙ্গালায় আর কোন অভিনেতা যে এরূপভাবে আত্মগোপন করিয়া চারিটি বিভিন্ন চরিত্রে, বিভিন্ন মূর্তির বিকাশ করিতে পারেন,—অর্দ্ধেন্দুবাবুর অভিনয়চাতুর্যে যদি আমরা প্রত্যক্ষ না দেখিতাম তাহা হইলে তাহা বিশ্বাস করিতাম না। কেবল 'ম্যাকবেথে' নহে, 'সীতারামে' সামান্য একটা দরোয়ানে ও কাজীতে, 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে

'বিক্রমাদিত্য ও রম্ভায়' এবং অন্য অসংখ্য বাঙ্গালা নাটকে অর্দ্ধেন্দুবাবুর এই আত্মগোপন শক্তির বহুল পরিমাণে পরিচয় পাইয়াছি।"

অপরেশচন্দ্র তাঁর ভাষণের উপসংহারে বলেন :

"অর্দ্ধেন্দুবাবু সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলিতে গেলে সেই সকল জীবিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিতে হয়, তাহাতে অনেক অপ্রিয় সত্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, অনেকের বিকট চরিত্র প্রকট হইয়া উঠে, কাজেই সংক্ষেপে বলা ভিন্ন উপায় নাই। কাল সকল সত্যের চিররক্ষক। উপস্থিত যিনি যে ভাবেই সত্যের অপলাপ করিতে চেষ্টা করুন না কেন, কাল আত্মধর্ম মাহাত্ম্যে তাহা একদিন প্রকাশ করিবেই। অর্দ্ধেন্দুশেখর পরলোকে—তাঁহার জীবদ্দশায় দেখিয়াছি,তাঁহাকে লইয়া তাঁহার সমব্যবসায়ী অনেক সুহৃদ—অবশ্য তাঁহারা কপটাচারী নহেন—বড়ই ব্যতিব্যস্ত—আর আজ অর্দ্ধেন্দু বাবুর মৃত্যুর পরেই দেখিতেছি—তাঁহার জীবনী লইয়া তাঁহার সেই সকল সমব্যবসায়ীর মধ্যে কোন কোন সুহৃদ—অবশ্য তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত, এবং কপটাচারী নহেন, বড়ই গোলযোগে পড়িয়াছেন—অর্দ্ধেন্দুশেখরের নটজীবনে ইহাই একটা বিচিত্র বিশেষত্ব।"

সেকালের নাট্যরথীদের রচিত নাট্যশালার ইতিবৃত্ত ও স্মৃতিকথা জাতীয় রচনাগুলো পড়লে মনে হয়, গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর মধ্যে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কৃতিত্বের দাবী নিয়ে সূক্ষ্ম একটি ব্যক্তিত্ব-বিরোধ ছিল এবং সেই বিরোধের চাপা আগুনে উভয় পক্ষেই ফুঁ দেবার মতো লোকেরও অভাব ছিল না। শক্তিশালী গিরিশ-পক্ষ থেকে অর্দ্ধেন্দুকে চেপে দেবার একটা চেষ্টা চলছিল, বোধ করি সেই কারণেই ব্যোমকেশ তাঁর পিতার সপক্ষে লেখনী-ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে এতকাল পরে খানিকটা প্রমাণ আর অনেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে এ ব্যাপারে বাগ্‌বিস্তার না করাই ভালো।

যা হোক্, গিরিশচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখলেন :

"অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় বুঝিয়াছিলাম যে মৎকর্তৃক অর্দ্ধেন্দুর প্রশংসা কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন নিন্দাজ্ঞান করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা আমি যেরূপ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় বর্ণন করিয়াছি তাহা প্রকৃত নয়। তাঁহাদের এরূপ ধারণা বোধ হয় আমার দোষেই হইয়া থাকিবে, বুঝিবা তাঁহাদের মস্তিষ্ক উপযোগী ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হয় নাই। তাঁহারা বলিতে চান যে যখন অর্দ্ধেন্দু তাঁহার ভূমিকা লইয়া তন্ময় হইতেন, তিনি তখন আদৌ অর্দ্ধেন্দু থাকিতেন না ; যদি তাঁহাদের বোধ থাকিত

যে ঠিক তন্ময় হইলে অভিনয় হয় না তাহা হইলে তাঁহারা এরূপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। মদ খাইয়া মাতাল মাতলামোতে তন্ময় হয় কিন্তু সে-মাতাল মাতালেরও অভিনয় করিতে পারে না—নট মনকে যেন দুইখণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—এক খণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ড সাক্ষী-স্বরূপ দেখে যে তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কিনা—নাটকের কথা ভুল হইতেছে কিনা—প্রতিযোগী অভিনেতা (co-actor) ঠিক বলিতেছে কিনা—যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া থাকে তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কিনা—রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছে কিনা? এই সকল বিষয়ের প্রতি কলা-বিত্থাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও একসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশে অভিনয় চলে সে অংশের তন্ময়ত্ব প্রয়োজন, মনের যে অংশ সাক্ষীস্বরূপ তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ, তন্ময় অংশই অধিক। কিন্তু হাস্যরসের অভিনয়ে কখন কখন সাক্ষী অংশ বেশি হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে এই অংশ বেশি থাকিত। একটা প্রকৃত ঘটনার দৃষ্টান্ত দিতেছি। অর্দ্ধেন্দুর পক্ষপাতী জনৈক অভিনেতার মুখে শুনিয়াছি—কোন এক ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু 'হরে চাকর'কে ডাকিলে জনৈক দর্শক উত্তর দিলেন 'আজ্ঞে যাই'; অর্দ্ধেন্দু তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—'ও গুওটা, তুমি ওখানে বসে আছ?'—এ উত্তর অর্দ্ধেন্দুর মনের সাক্ষী অংশ দিয়াছিল, তন্ময় অংশ নয়। এরূপ দৃষ্টান্ত অর্দ্ধেন্দুর প্রত্যেক অভিনয় হইতেই দেওয়া যায়। অন্য অভিনেতার পক্ষে এরূপ রহস্যকরণ দোষের হইত, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর এরূপ অসাধারণ অর্দ্ধেন্দুত্ব অনেক সময়েই দোষের না হইয়া গুণের হইত—কারণ অর্দ্ধেন্দুকে লোক অর্দ্ধেন্দু দেখিতে ভালবাসিত। অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি এখানে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম তাহা যদি অপর পক্ষ না বুঝেন তবে তাঁহারা অভিনয় বিষয়ে কিছু পাঠ করিবেন—অন্ততঃ 'Recent Actors' নামক পুস্তকে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা প্রশংসা—প্রচ্ছন্ন নিন্দা নয়।

"...সিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার প্রশংসা করিয়া তাঁহার শোক সভায় যশস্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় 'বিল্বমঙ্গল' নাটক হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেন। নাটকের এক স্থলে চিন্তামণিকে লক্ষ্য করিয়া বিল্বমঙ্গল পুনঃ পুনঃ বলিতেছে—'তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর।' পূর্বে একজন অভিনেতা এই 'অতি সুন্দর' ছত্রটি উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে বলিতেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কর্তৃক শিক্ষিত নট এই স্থলে উচ্চকণ্ঠে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিম্নকণ্ঠ করিয়া আনিত। রায় মহাশয় বলেন, অর্দ্ধেন্দু কর্তৃক এই পরিবর্তন বড়ই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু

তাঁহার এই মতের সহিত আমার অনৈক্য আছে। আমার মতে এ স্থলে কামভাব প্রকাশই নটের উচিত। বিল্বমঙ্গল 'অতি সুন্দর' বলিয়া চিন্তামণির রূপের প্রশংসা করিতেছে না—বলিতেছে—এ রাক্ষসীর মায়াজাল, দৃশ্যে সুন্দর, কিন্তু ঘৃণিত। এখানে বিল্বমঙ্গলের রূপপূজা করিবার অবস্থা নয়। এতদিন সে পূজা করিয়াছে—এখন সে ঘৃণা করিতে চায়। বিল্বমঙ্গলের তখন উৎকট অবস্থা, উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে 'অতি সুন্দর—অতি সুন্দর' আবৃত্তি করিলে সে অবস্থা প্রকাশ পায়। বিল্বমঙ্গলের উক্ত অংশে অভিনয়ে হয়তো কথিতপ্রকার উত্তরোত্তর নিম্ন-সুরে 'অতি সুন্দর—অতি সুন্দর' আবৃত্তি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি হইতে অপেক্ষাকৃত মধুর হয়, কিন্তু তাহাতে বিল্বমঙ্গলের চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে না।...( 'অভিনয় ও অভিনেতা': 'নাট্যমন্দির' ১৩১৭-১৮ )

কলারসিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের চোখে অর্দ্ধেন্দুশেখর :—

"...সে আজ প্রায় তেত্রিশ কি চৌত্রিশ বৎসর আগেকার কথা এবং আমার বয়স তখন চার কি পাঁচ বৎসরের বেশি নয়। কি নাটক তা মনে নেই, কিন্তু এটুকু বেশ স্মরণ আছে, তিনি এক বেত-হাতে গুরুমশাইয়ের ভূমিকা নিয়েছিলেন। আরো মনে আছে, বেত্র আস্ফালন করতে করতে তিনি ছাত্রদের দাবড়ি দিতে দিতে বলেছিলেন—'পড়্, পড়্, ল্যাখে ল্যাখে পড়্। তখন তাঁর নাম জানতুম না। কিন্তু পরে, আরো কিছু বেশি-বয়সে আবার যেদিন তাঁকে রঙ্গমঞ্চে দেখি, সেদিন তখনি তাঁকে চিনে ফেলেছিলুম এবং এও জেনেছিলুম যে, তাঁর নাম অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

* * *

"প্রাপ্ত বয়সে সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম, প্রতাপাদিত্য, জেনানার যুদ্ধ, নবীন তপস্বিনী, সংসার, আবুহোসেন, বলিদান, দুর্গেশনন্দিনী, প্রফুল্ল ( যোগেশ ও রমেশের ভূমিকায় ) ও তুফানী প্রভৃতি আরো অনেক নাটকে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে অনেক ভূমিকায় অনেকবার দেখবার সৌভাগ্য পেয়েছি এবং তাঁর অভিনয় দেখেছি সচেতন দৃষ্টি ও চিত্ত নিয়েই ;—সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবার অধিকার বোধ হয় আমার আছে।

"অর্দ্ধেন্দুশেখর যে শ্রেণীর অভিনেতা, সে শ্রেণীতে তাঁর অভাব পূর্ণ করতে পারে, এমন কোনো বাঙালী নট আজ পর্যন্ত আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি।

"নট আছেন দু-রকম—সচেতন ও অচেতন। প্রথম দলের নট অভিনয় করেন জাগ্রৎ মন নিয়ে ; নিপুণভাবে অভিনয় করলেও, ভূমিকা থেকে নিজেকে

সাবধানে বিচ্ছিন্ন রাখেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরকে এবং বর্তমান যুগের শিশিরকুমারকে আমি এই দলের অভিনেতা বলে মনে করি। দ্বিতীয় দলের অভিনেতারা ভূমিকার মধ্যে তন্ময় হয়ে ডুবে যান। এ দলেও অনেক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা আছেন।…*

* * *

"অনেকে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুশেখরের তুলনা ক'রে বিচার করতে বসেন, এঁদের মধ্যে কে বড়? আমার মতে এমন তুলনা হাস্যকর—কেন না

*"নটের ব্যক্তি-স্বরূপই নাটককে সঞ্চরণশীল ক'রে তোলে, কারণ সে ব্যক্তিস্বরূপের সারতত্ত্ব হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য এবং প্রয়োজনমতো বিস্তারণ সঙ্কোচনের অনন্ত ক্ষমতা। সাধারণ নাট্যামোদী যে নায়ক নায়িকার গুণমুগ্ধ হয়, যে নটনটীর সাধুবাদ করে, তারা তাদের অন্তরের সমবেদনাকে অঙ্গলীলায় প্রতিমূর্ত্ত ক'রে দর্শককে বিচলিত ও বিগলিত করতে পারে। এই যে আবেগপ্রবাহ নটের হৃদয়ে উদিত হয়ে দর্শকের কল্পনায় গিয়ে ঠেকে, এটাই একমাত্র নিকষ যার সাহায্যে অভিনেতাদের মূল্য নির্ধারণ সম্ভব। এই আবেগের অভিব্যক্তির প্রণালী কী?

"স্বভাবের বশে এবং সময়ে সময়ে নাটকের গুণে নটমাত্রেরই সৃজনীশক্তি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু তাহলেও সুসম্পাদিত অভিব্যক্তির মূলেই একটা অভিব্যাপ্ত ঐক্য থাকে,—এটা হলো শিল্পী-চিত্তের রাগাতিশয্য। সাহিত্য ও চিত্রবিদ্যার মতো অভিনয়কলাকেও দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—একটি বিচারপন্থী, অপরটি উপজ্ঞাপ্রধান। নাট্যশালায় আধুনিক অনুসন্ধিৎসার যুগ আরম্ভ হবার পূর্বে প্রথমটির খুব আদর ছিলো এবং দিনকতক বিরাগভাজন হবার পরে আবার তাকে স্বাধিকারে ফিরে আসতে দেখা যাচ্ছে। নাট্যবিবেচকেরাও তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান ভাবে বিতরণ করে এসেছেন—কাউকে হয়ত একদল মুগ্ধ করেছে, পরে আকৃষ্ট হয়েছেন অন্য দলের প্রতি। সে যাই হোক, অতিভক্তির অবশ্যম্ভাবী পক্ষপাত বাদ দিলে, একথা মানতেই হবে যে প্রকৃত গুণে কোনো পক্ষই বঞ্চিত নয়, প্রত্যেকের উপকারিতার অনেকখানিই নির্ভর করে নাট্যবস্তুর উপরে।…

"অভিনয়রীতির উৎকর্ষ, স্বর সাধনায় সিদ্ধি, ভাব ও ভাবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি, এই গুলোই হচ্ছে নাট্যামোদের মুখ্য সহায়। আমরা যারা পাদপ্রদীপের প্রভা-মণ্ডলের বাইরে থাকতে বাধ্য, তাদের কাছে নটের সংবেদন ও অভিপ্রায় এসে পৌঁছয় উক্ত রীতির মারফতে। সারা বের্ণাড, মুনে সুলি, ফর্বস্-রবার্টসন্, হেনরি আর্ভিং, আলবার্ট ব্যাসারম্যান, ভাসিলি কাচালফ, কজিয়েরো, কুজিয়েরি ইত্যাদির মতো বিচারপন্থী অভিনেতারা এই কৌশলে দুজের সম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে গেছেন, কারণ দুজের দল আত্মার প্রদোষান্ধকারে যে আবেগের উদয় হয়, তাকেই অধিক মূল্যবান মনে করেন। কিন্তু পদ্ধতি ব্যতিরেকে ব্যঞ্জনা যেহেতু অসম্ভব, তাই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাছাই করা দরকার হলে, বুদ্ধিমান প্রযোজক মাত্রেই প্রথম শ্রেণীকে বরণ করবে।··" ('নাট্যশালা প্রসঙ্গে': শাহেদ সুরহর্দি। 'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৩৯। মূল ইংরেজি প্রবন্ধ থেকে সম্ভবত স্বর্গত কবি সুধীন্দ্র-নাথ দত্ত কর্তৃক অনূদিত। শাহেদ সুরহর্দি 'ভারতীয়দের মধ্যে অভিনয়কলায় প্রায় একমেবাদ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ সমালোচক' ছিলেন।)—গ্রন্থকার কর্তৃক উদ্ধৃত।

এঁরা একই বিভাগের অভিনেতা নন। বিলাতে Irving ও Toole ছিলেন একই যুগের দুই প্রতিভাবান অভিনেতা এবং আপন আপন বিভাগে তাঁরা কেউ কারুর চেয়ে খাটো ছিলেন না। কিন্তু Toole-এর সঙ্গে সেখানে কেউ Irving-এর তুলনা করবার কথা কেউ মনেও আনে না—কারণ তেমন তুলনা কেউ করলে তাকে আর রসিকসমাজে দ্বিতীয়বার মুখ দেখাতে হবে না।

"অর্দ্ধেন্দুশেখরের এমন একটি আশ্চর্য শক্তি ছিল, যা আমি আর কোন নটের মধ্যে দেখিনি। অভিনেতার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে—কণ্ঠস্বর। এই কণ্ঠস্বরের উপরে অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রভুত্ব ছিল অসাধারণের চেয়েও অসাধারণ। ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার উপযোগী ক'রে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রকম স্বর ব্যবহার করতেন এবং সেই বিশেষ স্বর একটানা আগাগোড়া বজায় রাখতে পারতেন। পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার কথাই আমি শুনেছি বা পড়েছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত শক্তি আর কারুর ছিল বা আছে বলে আমার জানা নেই।*

"অর্দ্ধেন্দুশেখরের আর এক শক্তি দেখি, তাঁর গুরু-গিরিতে। গত যুগে তাঁর মতন শিক্ষক আর কেউ ছিলেন না—অনেক গাধাও তাঁর হাতে প'ড়ে ঘোড়ায় পরিণত হয়েছে।

"গিরিশচন্দ্রেরও শিক্ষকরূপে সুনাম ছিল, কিন্তু গত-যুগের রঙ্গালয়ের ভিতরের খবর যাঁরা রাখেন এমন সব বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি, শিক্ষক হবার উপযোগী গুণ, গিরিশচন্দ্রের চেয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখরেরই বেশি ছিল। যার ভিতরে সত্যই কিছু পদার্থ থাকতো, গিরিশচন্দ্র কেবল তাদেরই গড়ে তুলতে পারতেন, দীর্ঘকাল একজনকে নিয়ে পড়ে থাকা তাঁর ধৈর্যে পোষাত না। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। কিছুমাত্র পদার্থ থাক আর না থাক, যে কোন লোককেই তিনি ঘসে-মেজে অন্ততঃ চলনসৈ ক'রে রঙ্গমঞ্চের উপরে দাঁড় করিয়ে দিতে পারতেন এবং যতক্ষণ না সে তৈরি হ'য়ে উঠতো, ততক্ষণ তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাকে নিয়ে মেতে থাকতেন।...

"...টুল ও হেনরি আর্ভিং দুজনেই সুযোগ পেলেই নর-চরিত্রের বিশেষত্ব অধ্যয়ন করবার জন্যে এমনি যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতেন এবং তাঁদের সেই ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা বিশেষ বিশেষ ভূমিকার ধারণায় যার-পর-নাই কাজে লেগে যেত। অর্দ্ধেন্দুশেখরেরও এ-স্বভাব ছিল ব'লেই মনে হয়। কারণ বিভিন্ন শ্রেণীর নর-চরিত্র ও বাংলার নানা জেলার চলতি ভাষা সম্বন্ধে তাঁর আশ্চর্য

*"কণ্ঠস্বরের উপর তাঁহার অদ্ভুত অধিকার ছিল। তিনি মুহূর্তমধ্যে আত্মস্বর গোপন করিয়া বিভিন্ন স্বরে কথা কহিতে পারিতেন।" (দ্র. অপরেশচন্দ্রের 'স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাট্যজীবন')

অভিজ্ঞতার কথা আজও রঙ্গালয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এ-সব খুঁটি-নাটির দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল কিরকম তীক্ষ্ণ, 'গ্রামোফোন কোম্পানি'র খানকয়েক রেকর্ডের সাহায্যে তার কিছু কিছু পরিচয় এখনো আপনারা পেতে পারেন। এই অভিজ্ঞতার দিক দিয়েও বাংলা রঙ্গালয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না এবং এখনো নেই।

"আর্ভিং ও টুল—বিলাতি রঙ্গালয়ে এই দুই শ্রেণীর দুই অমর অভিনেতা যেমন একই যুগে বিদ্যমান ছিলেন, এ দেশে তেমনি দেখি গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু-শেখরকে। আর্ভিং ও টুল ছিলেন পরস্পরের বিশেষ বন্ধু, এঁরাও তাই। তবে টুলের চেয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে আমি বেশি বড় বলে মনে করি, কারণ জীবনী পড়ে যতদূর জেনেছি তাতে বলা যায় যে, অর্দ্ধেন্দুশেখরের মতন টুলও হাস্য ও করুণ এবং আরো নানা রসের অভিনয়ের দ্বারা এতটা প্রতিভাবৈচিত্র্য দেখাতে পারেননি।···

"···বৃদ্ধের ভূমিকায় তাঁর উপর টেক্কা দিতে পারে, এমন আর কোন নটকে আমি চিনি না।

"বাঙলাদেশে অর্দ্ধেন্দুশেখরের মতন হাস্যরসের অভিনেতা আমার জীবনে আর দ্বিতীয় দেখতে পাব ব'লে তো আশা হচ্ছে না। এখানে নানা রসের অনেক অভিনেতা একে একে আত্মপ্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু হাস্যরসের দিকে তাঁদের কারুরই যেন প্রাণের টান নেই। গরীব বাঙালীর দুঃখের জীবনে হাসির দরকার যেমন বেশি, রঙ্গালয়ে তেমনি তার অভাবও হয়েছে অত্যন্ত। এই দুর্লভ রসের উচিতমত পরিবেশন করেছেন ব'লে অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতি এদেশে অমর হয়ে থাকবে।" ('অর্দ্ধেন্দুশেখর' : 'নাচঘর', ৩রা আশ্বিন, ১৩৩১)

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

### জীবননাট্যের যবনিকাপাত

সেদিন বুধবার, ৩১এ ভাদ্র, ১৩১৫ সাল; ইংরেজি ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ।

অর্দ্ধেন্দুশেখরকে কিছুটা ভালো ব'লে মনে হচ্ছে। আশা হয়—সেরে উঠবেন। তিনি ঝোঁক ধরেছেন হাওয়া বদল করবার জন্যে বেনারস যাবেন। পুত্র ব্যোমকেশ এই খবর দিতেই মিনার্ভা থিয়েটারে এসেছেন। গিরিশচন্দ্র ব্যোমকেশকে একরকম ভর্ৎসনা করেই বললেন—'কিছুতেই অর্দ্ধেন্দুকে নিয়ে অন্য কোথাও যেও না। রুগী বহুদিন ভুগলে নিজের ঝোঁকে চলতে চায়। তুমি সঙ্গে থাকলেও অত্যাচার করা সম্ভব।' ব্যোমকেশ উত্তরে বলেন—'তিনি যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন। তাঁকে ফেরান আর সহজ নয়।'

সত্যিই আর ফেরান সহজ নয়। সেইদিন রাত ১টার সময়, যখন মিনার্ভা থিয়েটারে এই কথা হচ্ছে, তখন ওদিকে ভক্তপ্রবর থাকোবাবুর বাড়িতে বাংলা ১৩১৫ সালের ৩১এ ভাদ্র, ইংরেজি ১৯০৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১টায় অর্দ্ধেন্দুশেখর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবননাট্যের যবনিকাপাত হলো।

অর্দ্ধেন্দু-বিয়োগে 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্র (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮) গভীর শোকপ্রকাশ ক'রে লেখেন:

We deeply regret to announce the untimely and mournful death of Babu Ardhendu Sekhar Mustafi, the father and founder of the native stage in Bengal as well as the first, foremost and unparalleled master of the histrionic art, who passed away on Wednesday midnight at the age of 59···His loss to the native stage is irreparable and with him Bengal has lost one of her gifted and talented sons.

মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন:

···রঙ্গালয় গঠন করিতে তাঁহাকে বিস্তর আয়াস পাইতে হইয়াছে; রঙ্গালয় লইয়াই তাঁহার জীবন।··· চিরদিন আনন্দ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন যম তাঁহাকে

তাড়না করিতে পারে নাই। মৃত্যুকালে যজ্ঞোপবীত হস্তে গঙ্গাজল চাহিয়া লইয়া শাস্ত্রমতে গঙ্গালাভ করিয়াছেন।…কেহ কেহ বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত হয়তো বলিতে পারেন যে, অর্দ্ধেন্দুবাবুর সম্বন্ধে যদি এত কথা, থিয়েটার বন্ধ দিতে পারিলেন না? যদি এরূপ কেহ থাকেন, তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার নিবেদন যে, যাঁহাদের নিকট অর্দ্ধেন্দুর নাট্যানুরাগ পরিচিত, তিনি বুঝিবেন—যদি ইহা উইল করিবার হইত, তাহা হইলে অর্দ্ধেন্দু উইল করিয়া যাইতেন যে, যেন আমার মৃত্যুর দিন অভিনয়রজনী না হইলেও অভিনয় করা হয়। রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়, এই তাঁহার চিরকামনা ছিল।

…যাঁহারা কায়মনোবাক্যে রঙ্গালয়প্রিয় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেন্দু সর্বাগ্রগণ্য। রঙ্গালয় তাঁহার জীবন ছিল, রঙ্গালয়ের কথা তাঁহার কথা ছিল, রঙ্গালয়ে দীক্ষাদান তাঁহার কার্য ছিল, রঙ্গালয় তাঁহার আবাস ছিল, নাট্যামোদী ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার অন্য আত্মীয় ছিল না। সমাজ অভিনয় দেখিতে ভালবাসে, রঙ্গালয়ে অভিনেতার প্রশংসা করে, আদর করে, কিন্তু বাহিরে কেহ কেহ বা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দেওয়া একরূপ কঠিন হয়। কিন্তু রঙ্গালয়বৎসল অর্দ্ধেন্দু রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া অবধি দম্ভভরে পরিচয় দিতেন, আমি অভিনেতা। সে কলাবিদ্যাগর্বিত—কলাবিদ্যাবিশারদ অর্দ্ধেন্দু আজ নাই!…যতদিন বাঙ্গালায় রঙ্গালয় থাকিবে, কেহ তাঁহাকে ভুলিবে না। বঙ্গরঙ্গভূমি চিরদিন তাঁহার উজ্জ্বল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিবে। রঙ্গালয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর অমর।

# পরিশিষ্ট

# অর্দ্ধেন্দু-অভিনয়প্রবাহ

## শৌখিন পর্ব

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় জামাতা
হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের
জোড়াসাঁকো কয়লাহাটার বাড়িতে

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৬৭, ২ নভেম্বর | কিছু কিছু বুঝি | দন্তবক্র, মুরাদ আলি ও চন্দনবিলাস |

'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'-এর উদ্যোগে

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৬৮, দুর্গাসপ্তমী | সধবার একাদশী | কেনারাম | বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুয্যের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ি |
| ঐ, কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা | ঐ | ঐ | শ্যামপুকুরে গিরিশ-চন্দ্রের শ্বশুর মহাশয় নবীনচন্দ্র সরকারের বাড়ি |
| ? | ঐ | ঐ | গড়পারে এটর্নি দীননাথ বসুর বাড়ি |
| ১৮৭০, শ্রীপঞ্চমী | ঐ | জীবনচন্দ্র | শ্যামবাজারে তোষাখানার দেওয়ান রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়ি |
| ১৮৭০, ? | ঐ | ঐ | বাগবাজারে বসুপাড়ায় লোকনাথ বসুর বাড়ি |
| ১৮৭০, দুর্গাপূজার সময় | ঐ | ঐ | খিদিরপুরে নন্দলাল ঘোষের বাড়ি |
| ১৮৭০, জগদ্ধাত্রী পূজার রাত্রি | ঐ | ঐ | চোরবাগানে স্বনামধন্য অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়ি |
| ঐ ঐ | বিয়ে পাগলা বুড়ো | রাজীব মুকুয্যে | ঐ |

## 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'-এর উত্তোগে

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮৭২, ১১ই মে | লীলাবতী | হরবিলাস ও ঝি | শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ি |

## পেশাদার পর্ব

### ন্যাশনাল থিয়েটার

[ ৩৬৫ নং আপার চিৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের বাড়ির ( পরবর্তীকালে মল্লিকদের 'ঘড়িওয়ালা' বাড়ি' ) প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত ]

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর | নীলদর্পণ | উডসাহেব, সাবিত্রী, গোলোক বসু ও একজন চাষা রায়ৎ |
| ঐ ১৪ ,, | জামাইবারিক | পদ্মলোচন |
| ঐ ২১ ,, | নীলদর্পণ | ভূমিকা পূর্ববৎ |
| ঐ ২৮ ,, | সধবার একাদশী | জীবনচন্দ্র |
| ১৮৭৩, ৪ জানুয়ারি | নবীনতপস্বিনী | জলধর |
| ঐ ১১ ,, | লীলাবতী | হরবিলাস ও ঝি |
| ঐ ১৫ ,, | বিয়ে পাগলা বুড়ো<br>মুস্তফী সাহেব-কা পাক্কা তামাশা<br>কুজার কুঘটন<br>নব বিদ্যালয়<br>পরীস্থান | রাজীব |
| ঐ ১৮ ,, | নবীনতপস্বিনী | জলধর |
| ঐ ২৫ ,, | নবনাটক | গবেশবাবু |
| ঐ ৮ ফেব্রুয়ারি | নয়শো রূপেয়া | ছাতুলাল |
| ঐ ১৫ ,, | জামাই বারিক | পদ্মলোচন |
| ঐ ২২ ,, | কৃষ্ণকুমারী | ধনদাস |
| ঐ ২৫ ,, | নীলদর্পণ | ভূমিকা পূর্ববৎ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৭৩, ৮ মার্চ (শেষ রজনী) | বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ | ? |
| | যেমন কর্ম তেমনি ফল | ? |
| | বিলাতী বাবু | |
| | সাব্‌স্ক্রিপ্‌শন্ বুক | |
| | প্রাইভেট থিয়েটারের গ্রীন রুম | |
| | মুস্তফী সাহেব-কা পাক্কা তামাশা | |
| | পরীস্থান | |
| | মুস্তফী সাহেবের বক্তৃতা | |

## হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার

(লিণ্ড্‌সে স্ট্রীট—অপেরা হাউসে)

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৭৩, ৫ এপ্রিল | শর্মিষ্ঠা নাটক | মাধব্য |
| | মডেল স্কুল | |
| | বিলাতী বাবু | |
| | উপাধি বিতরণ | |
| | মুস্তফী সাহেব-কা পাক্কা তামাশা | |
| ঐ ১২ ,, | বিধবা বিবাহ নাটক | কর্তা |

হাওড়া রেলওয়ে থিয়েটার

| | | |
|---|---|---|
| ঐ ২৬ ,, | নীলদর্পণ | ভূমিকা পূর্ববৎ |

[ মে-জুন মাসে ঢাকা, রাজসাহী,
রামপুর-বোয়ালিয়া, বহরমপুরে
নীলদর্পণ, নবনাটক, নবীন-তপস্বিনী,
কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি নাটকাভিনয় ]

## ন্যাশনাল ও হিন্দুন্যাশনাল একযোগে

অপেরা হাউসে

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৭৩, ১৬ জুলাই | | ধনদাস |

## গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

(বেলভিডিয়রে)

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৭৪, ১ জানুয়ারি | নীলদর্পণ | ভূমিকা পূর্ববৎ |

## গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

( ৬নং বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে )

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৭৪, ১০ জানুয়ারি | বিধবা বিবাহ নাটক | কর্তা |
| ঐ ১৭ „ | প্রণয়-পরীক্ষা | নটবর |
| ঐ ২৪ „ | কৃষ্ণকুমারী | ধনদাস |
| ঐ ২১ ফেব্রুয়ারী | মৃণালিনী | হৃষীকেশ |
| ঐ ? | মাউসি ( পঞ্চরং ) | ? |
| ১৮৭৪, ১৪ মার্চ | কমলে কামিনী | বকেশ্বর ( প্রথম অভিনয়রজনীতে অমৃতলাল বসু ; পরে অর্দ্ধেন্দু ) |
| ঐ ১৮ এপ্রিল, | হেমলতা | সত্যসখা ( প্রথম অভিনয়রজনীতে মহেন্দ্রলাল বসু ; পরে অর্দ্ধেন্দু ) |

( 'হেমলতা' অভিনয়ের পর 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে একটি ভ্রাম্যমান দল গঠনপূর্বক ঢাকা, বগুলা, কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটে অভিনয় )

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৭৪, ১৯ সেপ্টেম্বর | সতী কি কলঙ্কিনী ? | জটিলা |
| ঐ ৩ অক্টোবর | পুরুবিক্রম | ? |
| ঐ ১০ „ | ভারতে যবন | ? |
| ঐ ৩১ „ | রুদ্রপাল | ? |
| ঐ ১৪ নভেম্বর | আনন্দ-কানন | অবিবেক |
| ঐ ২১ ঐ | কিঞ্চিৎ জলযোগ | ? |
| ঐ ২ ডিসেম্বর | শত্রু-সংহার | ? |
| ঐ ২৬ „ | বঙ্গের সুখাবসান | রাজা লক্ষ্মণ সেন |
| ১৮৭৫, ১৩ মার্চ | আনন্দ-কানন | অবিবেক |

পশ্চিম ভ্রমণ ( মার্চ-মে )

| | | |
|---|---|---|
| মার্চ-এপ্রিল | নবীন তপস্বিনী | লাহোর |
| ঐ | সধবার একাদশী | ঐ |
| ঐ | বিয়ে পাগলা বুড়ো | ঐ |

| | | |
|---|---|---|
| মার্চ-এপ্রিল | সতী কি কলঙ্কিনী ? | লাহোর |
| মে | লীলাবতী | লক্ষ্ণৌ |
| ঐ | নীলদর্পণ | ঐ |
| ১৮৭৫, ২৫ ডিসেম্বর | হীরকচূর্ণ নাটক | রাজা মলহর রাও |

ন্যাশনাল থিয়েটার
৬ নং বিডন স্ট্রীট
স্বত্বাধিকারী—প্রতাপচাঁদ জহুরী

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৮৩, ৭ মে | আনন্দমঠ | মহাপুরুষ |
| ১৮৮৬, ৩ জুলাই | রাজা বসন্তরায় | রমাই ভাঁড় |

( 'বৌঠাকুরানীর হাট'-এর নাট্যরূপ )

এমারেল্ড থিয়েটার
( ৬৮ নং বিডন স্ট্রীট )

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৮৭, ৮ অক্টোবর | পাণ্ডব নির্বাসন | ধৃতরাষ্ট্র |
| ঐ ১৩ নভেম্বর | আনন্দ কানন | অবিবেক |

আর্য-নাট্য-সমাজ
( বীণা থিয়েটার, ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোড )

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৮৮, নভেম্বর | নীলদর্পণ | পূর্ববৎ |

এমারেল্ড থিয়েটার
( ৬৮ নং বিডন স্ট্রীট )

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৮৯, ১৩ জুলাই | বক্কেশ্বর | বক্কেশ্বর |

মিনার্ভা থিয়েটার
( ৬নং বিডন স্ট্রীট )

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৯৩, ২৮ জানুয়ারি | ম্যাকবেথ | দ্বারপাল, বৃদ্ধ, ডাক্তার, ১ম ডাকিনী, ১ম হত্যাকারী |
| ঐ ৫ ফেব্রুয়ারি | মুকুলমুঞ্জরা | বরুণচাঁদ |
| ২৫ মার্চ | [illegible]বুহোসেন | [illegible]সেন |

| | | |
|---|---|---|
| ঐ ১১ অক্টোবর | সপ্তমীতে বিসর্জন | মামা |
| ঐ ২৩ ডিসেম্বর | জনা | বিদূষক |
| ঐ ২৫ ডিসেম্বর | বড়দিনের বখ্‌সিস্‌ | থিয়েটারের ম্যানেজার |
| ১৮৯৪, ৬ জানুয়ারি | জনা | বিদূষক |
| ঐ ৭ „ | মুকুলমুঞ্জরা | বরুণচাঁদ |
| ঐ ঐ | বড়দিনের বখ্‌সিস্‌ | থিয়েটারের ম্যানেজার |
| ঐ ১০ জানুয়ারি | সপ্তমীতে বিসর্জন | মামা |
| ঐ ১৩ „ | জনা | বিদূষক |
| ঐ ১৪ „ | বড়দিনের বখ্‌সিস্‌ | মামা |
| ঐ ২১ „ | বেজায় আওয়াজ | লবধন |

## এমারেল্ড থিয়েটার

( ৬৮ নং বিডন স্ট্রীট )

নিজ স্বত্বাধিকারিত্বে

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৯৪, ২২ সেপ্টেম্বর | মা | ? |
| ঐ ৪ ডিসেম্বর | মান | ? |
| ১৮৯৫, জানুয়ারি | রাজা বসন্তরায় | প্রতাপাদিত্য |
| | ( 'বৌঠাকুরানীর হাট'-এর নাট্যরূপ ) | |
| ঐ ? | আবুহোসেন | আবুহোসেন |

বেনারসী দাসের স্বত্বাধিকারিত্বে

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৯৫, ১৪ ডিসেম্বর | বঙ্গবিজেতা | মাসুমি কাবুলি |
| ১৮৯৫, ২৫ ডিসেম্বর | নীলদর্পণ | পূর্ববৎ |

## মিনার্ভা থিয়েটার

( ৬নং বিডন স্ট্রীট )

১৮৯৮ সালের জুলাই মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত।

১৮৯৯ „ ফেব্রুয়ারি মাসে কাসিমবাজার রাজবাড়িতে সধবার একাদশী, চৈতন্যলীলা ও প্রফুল্ল অভিনয়।

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০০, ৭ জানুয়ারি | পলাশীর যুদ্ধ | ক্লাইব |
| ঐ ২৪ „ | জেনানা যুদ্ধ | পদ্মলোচন |
| ঐ ৭ ডিসেম্বর | নাট্যশালার ২৮ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে বক্তৃতা | |

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০১, ১০ মার্চ | মহেন্দ্রলাল বসুর মৃত্যুতে বক্তৃতা | |
| ঐ ১৬ মার্চ | বঙ্গবিজেতা | মাসুমি কাবুলি |
| ঐ ৬ এপ্রিল | রাজা বসন্তরায় | রমাই ভাঁড় |

## অরোরা থিয়েটার

( ৯ নং বিডন স্ট্রীট )

( বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চে )

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০২, ১৭ মে | রিজিয়া | ঘাতক |
| ঐ ২৪ মে | ঐ | ঐ |
| ঐ ১ জুন | সধবার একাদশী | নিমচাঁদ |
| ঐ ১৬ জুলাই | আবু হোসেন | আবু হোসেন |
| ঐ ঐ | জেনানা যুদ্ধ | পদ্মলোচন |
| ঐ ২৬ জুলাই | কাল-পরিণয় | জগদীশ |
| ঐ ২২ নভেম্বর | রিজিয়া | ঘাতক |
| ঐ ২৩ নভেম্বর | প্রফুল্ল | যোগেশ |

## স্টার থিয়েটার

( হাতি বাগান )

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০৩, ১০ মে | নীলদর্পণ | পূর্ববৎ |
| ঐ ৫ জুলাই | প্রণয়-পরীক্ষা | নটবর |
| ঐ ১৫ অগাস্ট | প্রতাপাদিত্য | বিক্রমাদিত্য ও রডা |

## মিনার্ভা থিয়েটার

( ৬নং বিডন স্ট্রীট )

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০৪, ? | সংসার | নবখুড়ো |
| ঐ ? | নীলদর্পণ | উড ও তোরাপ |
| ঐ ১০ ডিসেম্বর | প্রতাপাদিত্য | বিক্রমাদিত্য ও রডা |
| ১৯০৫, ৪ মার্চ | হরগৌরী | নন্দী |
| ১৯০৫, ৮ এপ্রিল | বলিদান | রূপচাঁদ |
| ঐ ? | ঐ | করুণাময় |
| ঐ ২৯ জুলাই | রাণাপ্রতাপ | পৃথ্বীরাজ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০৫, ৯ সেপ্টেম্বর | সিরাজউদ্দৌলা | দানশা |
| ঐ ২৯ অক্টোবর | সংসার | নবখুড়ো |
| ঐ ৯ ডিসেম্বর | সিরাজউদ্দৌলা | শওকতজঙ্গ, মীরকাশিম, মিঃ ড্রেক, মিঃ সেরাফ্‌টন ও মুশালা |
| ঐ ১০ „ | সংসার | নবখুড়ো |
| ঐ ১৭ ডিসেম্বর | জাগরণ | নকলরাজা |
| ঐ ২৬ „ | বাসর | বিধাতা পুরুষ |
| ঐ ২৭ „ | প্রতাপাদিত্য | বিক্রমাদিত্য ও রডা |
| ঐ ২৭ „ | আবুহোসেন | আবুহোসেন |
| ১৯০৬, ৩ জানুয়ারি | সংসার | নবখুড়ো |
| ঐ ৭ „ | বাসর | বিধাতা পুরুষ |
| ঐ ৭ „ | জাগরণ | নকল রাজা |
| ঐ ১০ „ | রিজিয়া | ঘাতক |
| ঐ ১০ ফেব্রুয়ারি | সিরাজউদ্দৌলা | মিঃ ড্রেক |
| ঐ ১১ „ | দুর্গেশনন্দিনী | গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ |

—খুলনায় এগজিবিশনে—

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০৬, ২৮ ফেব্রুয়ারী | বিল্বমঙ্গল | সাধক |

—খুলনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর—

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০৬, ৩ মার্চ | সিরাজউদ্দৌলা | মীরজাফর |
| ঐ ৪ „ | দুর্গেশনন্দিনী | বিদ্যাদিগ্‌গজ |
| ঐ ৭ „ | সংসার | নবখুড়ো |
| ঐ ১০ „ | দুর্গেশনন্দিনী | বিদ্যাদিগ্‌গজ |
| ঐ ১৪ „ | আবুহোসেন | আবুহোসেন |
| ঐ ১৭ „ | দুর্গেশনন্দিনী | বিদ্যাদিগ্‌গজ |
| ঐ ২১ „ | রিজিয়া | ঘাতক |
| ঐ ২৪ „ | দুর্গেশনন্দিনী | বিদ্যাদিগ্‌গজ |
| ঐ ২৫ „ | বাসর | বিধাতা পুরুষ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০৬ ২৮ মার্চ | সংসার | নবখুড়ো |
| ঐ ১৩ এপ্রিল | প্রফুল্ল | রমেশ |
| ঐ ঐ | চৈতন্যলীলা | জগাই |
| ঐ ২২ „ | ঐ | ঐ |
| ঐ ১৬ জুন | মীরকাশিম | হলওয়েল, হে ও মেজর অ্যাডাম্স্ |
| ঐ ১২ সেপ্টেম্বর | কপালকুণ্ডলা | মুখুয্যে মশায় |
| ১৯০৭, ১ জানুয়ারি | য্যায়সা-কা-ত্যায়সা | হারাধন |
| ঐ ২ জুন | প্রফুল্ল | রমেশ |
| ঐ ২৭ অক্টোবর | ঐ | যোগেশ |
| ঐ ৩ নভেম্বর | দুর্গাদাস | রাজসিংহ |
| ঐ ১৭ „ | সিরাজউদ্দৌলা | মীরজাফর |
| ১৯০৮, ২২ জানুয়ারি | বলিদান | করুণাময় |
| ঐ ১৬ মে | তুফানী | জাফর |

## কোহিনুর থিয়েটার
( ৬৮নং বিডন স্ট্রীট )

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০৮, ১৫ জুলাই | সংসার | নবখুড়ো |
| ঐ ঐ | জেনানা যুদ্ধ | পদ্মলোচন |
| ঐ ২২ জুলাই | ঐ | „ |
| ঐ ২৬ „ | সংসার | নবখুড়ো |
| ঐ ২৯ „ | আবুহোসেন | আবুহোসেন |
| ঐ ১ অগাস্ট | দুর্গেশনন্দিনী | বিদ্যাদিগ্গজ |
| ঐ ২ „ | নীলদর্পণ | তোরাপ |
| ঐ ৫ „ | জেনানা যুদ্ধ | পদ্মলোচন |

**শেষ অভিনয়**

| | | |
|---|---|---|
| ১৯০৮, ৯ অগাস্ট | প্রফুল্ল ও নবীন তপস্বিনী | যোগেশ ও জলধর |

'অর্দ্ধ-ইন্দু' নওকো তুমি, পূর্ণ-ইন্দু নাট্য-নভে,
স্মরণ করি, বরণ করি, নিত্য যে তাই চিত্ত-ভবে।

হে প্রতিভার মানস-তনয়। বঙ্গ-নটের মন্ত্র-গুরু।
আনন্দ-দান ব্রত নিয়ে সাধন তোমার করলে সুরু—
মানুষ যেথায় মরচে কেঁদে, ডাকলে সেথায় হাসির রবে।

সমাজ-ঘৃণা মাথায় নিয়ে গড়লে জাতির রঙ্গশালা,
শিক্ষা দিলে, দীক্ষা দিলে, নিন্দা ক'রে কণ্ঠমালা।

কাঙাল হয়ে দিন কাটিয়ে যাওনি ভুলে সাধন-রীতি,
নটনাথের অমর-নকীব। অশোক-তিথির হে অতিথি।
অশ্রুতে নয়, অশ্রুতে নয়,—হাস্তে তোমায় পূজব সবে।

[ হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত এই গানটি ১৩৩১ সালের ৩১এ ভাদ্র অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতি-সভায় গীত এবং ১৩৩১ সালের ৩রা আশ্বিন সংখ্যার 'নাচঘর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ]

# শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | ছত্র | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৪ | ১৯ | ১৭৯৪ খ্রী: | ১৭৯৫ খ্রী: |
| ৪ | ২৪ | ১০ই জুলাই | ১৩ই জুলাই |
| ১৯০ | ২০ | defied | deified |
| ১৯৫ | ৩৪ | disappointed | disappointment |
| ২০৭ | ১৪ | ১৮ই মার্চ | ১৭ই মার্চ |
| ২১৫ | ১২ | অর্দ্ধেন্দুশেখরের | অর্দ্ধেন্দুশেখর |